পেরেলমান
জ্যোতির্বিদ্যার
খোশখবর

ইয়া. পেরেলমান

জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: শুভময় ঘোষ

Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

П $\frac{20202-121}{014(01)-80}$ 753—79

1705000000

সূচি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদ আর তার গতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহেরা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারারা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাধ্যাকর্ষণ

ভূমিকা

জ্যোতির্বিদ্যার ভাগ্যটা ভাল; তার কোন প্রসাধনের প্রয়োজন হয় না, একথা বলেছেন ফরাসী পণ্ডিত আরাগো। তার কীর্তি এতই মনোমুগ্ধকর যে মন আকর্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু আকাশের বিজ্ঞান শুধু কতগুলো বিস্ময়কর আবিষ্কার আর দুঃসাহসী তথ্যের সমষ্টিই নয়। তার মূল ব্যাপারগুলো সবই সাধারণ ঘটনা, যা প্রতিদিনই ঘটে। এবিষয়ে যারা অনভিজ্ঞ তাদের অধিকাংশেরই সাধারণভাবে বলতে গেলে জ্যোতির্বিদ্যার এই নীরস দিকটা সম্বন্ধে ধারণা খুবই ঝাপসা। এতে তারা খুব কম কৌতূহলই অনুভব করে কারণ যা সারাক্ষণই চোখের সামনে রয়েছে তার উপর মনোনিবেশ করা সহজ নয়।

'জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর' বইটির বিষয় প্রধানত (কিন্তু সম্পূর্ণত নয়) আকাশ বিজ্ঞানের এই দৈনন্দিন দিকটি, তার সূচনা — পরবর্তী আবিষ্কার নয়। বইটির উদ্দেশ্য হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল তথ্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু এটিকে পাঠ্যবই বলে মনে করবেন না, কারণ আমাদের উপস্থাপনে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যে সব সাধারণ তথ্যের সঙ্গে আপনারা পরিচিত তাদের আকস্মিকভাবে উল্টিয়ে, বা কোন অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে দেখান হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল কল্পনাশক্তির উদ্বোধন আর কৌতূহলের উদ্রেক। পেশাদারী 'পরিভাষা' এবং সেই সঙ্গে টেকনিকাল ঝামেলা, যার ফলে পাঠকরা প্রায়ই জ্যোতির্বিদ্যার বই পড়তে ভয় পান তার ভার থেকে বইটিকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেয়েছি।

লোকশিক্ষার বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রায়ই গুরুগম্ভীর হয় না বলে ভর্ৎসিত হয়। একদিক দিয়ে সে ভর্ৎসনা যুক্তিযুক্ত আর (গাণিতিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা মনে রাখলে) যে কোন রকমের আঁকজোক বাদ দেওয়ার যে প্রবণতা তাতেই এই ভর্ৎসনার সমর্থন পাওয়া যাবে। অথচ একমাত্র আঁকজোকের সাহায্যেই, তা সে যতই প্রাথমিক গোছের হোক না কেন, বিষয়টি আয়ত্ত করা সম্ভব। তাই 'জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর'এ লেখক অত্যন্ত সহজ

সরল অঙ্ক বাদ দেবার চেষ্টা করেননি। অবশ্যই তিনি তাদের সহজভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন, ইস্কুলের গণিতবিদ্যা দিয়েই তা বেশ বোঝা যাবে। লেখকের বিশ্বাস, এই সব অনুশীলনে যে শুধু অধীত জ্ঞান ঝালানো যাবে তাই নয়, আরো গভীর পড়াশুনোর সূচনাও তা ঘটাবে।

এই বইয়ে পৃথিবী, চাঁদ, গ্রহ, তারা আর মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নানা পরিচ্ছেদ আছে। এই জাতের বইয়ে সাধারণত যে সব বস্তু আলোচিত হয় না প্রধানত তাদের উপরই লেখক বেশি মনোনিবেশ করেছেন। এখানে বলা উচিত যে এ বইয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের বিস্তৃত বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করা হয়নি।

ইয়া. পে.
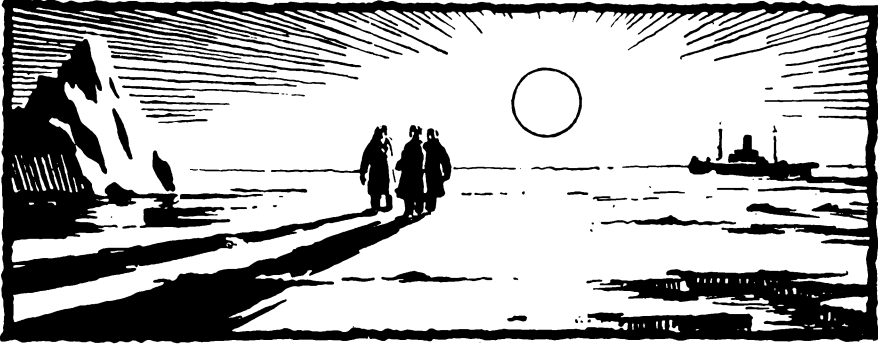
প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবী, তার আকার ও গতি

কোন পথ সবচেয়ে ছোট: মাটিতে আর মানচিত্রে

ব্ল্যাকবোর্ডে মাস্টারমশাই চক দিয়ে দুটো ফোঁটা বসিয়ে দিয়েছেন। এই দুই বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পথ কোনটা তা দেখাতে বলেছেন ছোট ছেলেটিকে।

এক মিনিট ইতস্তত করে ছেলেটি সযত্নে একটা ধনুকের মতো বাঁকা রেখা এ'কে দিল।

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই হল তোমার সবচেয়ে ছোট পথ! কে শেখাল তোমায় ওকথা?'

'বাবা। আমার বাবা ট্যাক্সি চালান।'

অবশ্যই এটা একটা চুটকি গল্প। কিন্তু ১ নং ছবিটা দেখিয়ে যদি বলি উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে যাবার সবচেয়ে ছোট পথ হল ঐ ফুটকি দেওয়া বাঁকা রেখাটা তাহলে আপনারা হয়ত অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। একথা শুনে আরো অবাক হবেন যে ২ নং ছবিতে জাপান থেকে পানামা খাল অবধি যে ঘুর পথটা দেখান হয়েছে সেটা একই মানচিত্রে ঐ জায়গা দুটোর মধ্যবর্তী সরল রেখার চেয়ে ছোট!

বলতে পারেন রসিকতা কিন্তু তবু ওটাই সত্যি কথা। সব কার্টোগ্রাফারই তার সাক্ষী দেবেন।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝানর জন্য সাধারণভাবে মানচিত্র আর বিশেষ করে নৌপথের চার্টের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠের কোন একটি অংশকে আঁকা সোজা

ব্যাপার নয়, কারণ পৃথিবীটা হল বলের মতো। একটা গোল জিনিসকে চ্যাপ্টা করে দিলে যে অনেক ভাঁজ খাঁজ পড়বে তা তো জানাই কথা। কার্টোগ্রাফির অনিবার্য বিকৃতি আমাদের মেনে নিতেই হবে, তা আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। মানচিত্র আঁকার অনেক উপায়ই বেরিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে।

নাবিকরা যে মানচিত্র ব্যবহার করেন তা আঁকা হয় ১৬শ শতাব্দীর ফ্লেমিশ কার্টোগ্রাফার আর গণিতবিদ মের্কাতর পদ্ধতিতে। তাকে বলা হয় 'মের্কাতরের অভিক্ষেপ'।
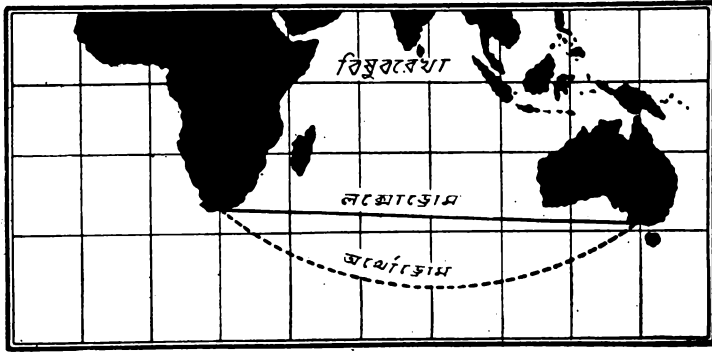
১ নং ছবি: নাবিকদের চার্টে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণতম অংশে যাবার সবচেয়ে কম দূরত্ব হল বাঁকা পথটা (অর্থোড্রোম), সরল রেখাটা (লক্সোড্রোম) নয়।

নাবিকদের চার্ট চেনা যায় তার কাটাকুটি খেলার ঘরের মতো রেখার জাল দেখে। মধ্যরেখা আর অক্ষাংশগুলি দেখান হয়েছে সমকোণে বসান সমান্তরাল সরল রেখা দিয়ে (৫ নং ছবি দ্রঃ)।

মনে করা যাক একই **সমান্তরালে** অবস্থিত দুটি বন্দরের মধ্যে সবচেয়ে ছোট পথটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সমুদ্রে তো যে দিকে খুসি জাহাজ চালান যায়। তাই উপায়টা জানা থাকলে সবচেয়ে ছোট পথটা সবসময় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আপনারা স্বভাবতই ভাববেন দুটো বন্দরের সমান্তরাল — আমাদের মানচিত্রের সরল রেখা — ধরে এগলেই সবচেয়ে সংক্ষেপ হবে। সরল রেখার চেয়ে সংক্ষিপ্ত আর কী হতে পারে! কিন্তু ভুল করবেন: সমান্তরালের পথটা সবচেয়ে ছোট নয়।

একটা বলের গায়ের দুটো বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পথ হল **মহা** বৃত্তের* যে চাপটি এদের যোগ ঘটায় সেটি। অক্ষাংশ হল **ক্ষুদ্র** বৃত্ত। দুটি বিন্দুর মধ্যে মহা বৃত্তের চাপটি ক্ষুদ্র বৃত্তের চাপের চেয়ে কম বাঁকা। ব্যাসার্ধ বড় হলে বক্রতাও কমে আসে। একটা সুতো নিয়ে ভূগোলকের উপর আমাদের নির্দিষ্ট দুটি বিন্দুর মধ্যে পেতে দেখুন (৩ নং ছবি দ্রঃ)। দেখবেন সুতোটা মোটেই সমাক্ষরেখা ধরে যাচ্ছে না। আমাদের সুতোটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ছোট পথটাই দেখাচ্ছে। ভূগোলকে যদি সুতোটা সমাক্ষরেখার সঙ্গে না মেলে তাহলে নৌযাত্রার চার্টেও — যেখানে সরলরেখা দিয়ে সমাক্ষরেখা দেখান হয়—
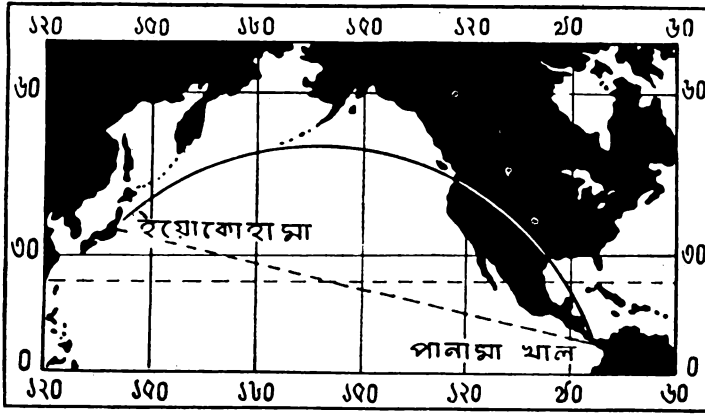
২ নং ছবি: অদ্ভুত মনে হয় যে-বাঁকা রেখাটা ইয়োকোহামা আর পানামা খালকে যুক্ত করেছে, তা নাবিকদের চার্টে ঐ দুটি জায়গার মধ্যে সরল রেখার চেয়ে ছোট।

সরলরেখাটা সবচেয়ে ছোট পথ হবে না। আর এই সরলরেখাগুলোর সঙ্গে যাদের মিল হবে না তারা **বাঁকা** রেখা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

এই কারণেই নাবিকদের চার্টে সবচেয়ে ছোট পথটা সোজা নয়, বাঁকা রেখা।

শোনা যায়, পিটার্সবুর্গ-মস্কো রেলপথের রাস্তা পাততে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ররা নাকি কিছুতেই আর একমত হতে পারছিলেন না। জার প্রথম নিকোলাস তখন একটা 'সরলরেখা' দিয়ে সমস্যা মিটিয়ে দেন — একটা রুলার চেয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো

---

* কোন গোলক পৃষ্ঠের **মহা বৃত্ত** হল সেই বৃত্ত যার কেন্দ্র ও গোলকটির কেন্দ্র এক। অন্য সব বৃত্তকে বলা হয় **ক্ষুদ্র** বৃত্ত।

৩ নং ছবি: দ্বটো জায়গার মধ্যে সবচেয়ে কম দ্বরত্ব মাপার সহজ উপায় হল ভূগোলক বা গ্লোবের যে কোন দ্বটি বিন্দ্বর মধ্যে একটা স্বতোকে মেলে ধরা।

পর্যন্ত একটা সরলরেখা টেনে দেন। মের্কাতরের চার্ট তখন হাতের কাছে থাকলে ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর হত — রেলপথ তখন সোজা না হয়ে হত বাঁকা।

অঙ্কের কচকচিতে না গিয়ে অত্যন্ত সহজ হিসেবের সাহায্যে যে কেউ স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন, চার্টের বাঁকা পথটা, যেটাকে আমরা সোজা পথ বলে মনে করি তার চেয়ে ছোট। ধরা যাক আমাদের কল্পিত বন্দর দ্বটি লেনিনগ্রাদের এক অক্ষাংশেই অবস্থিত, তার মানে ৬০ নং সমান্তরালে, আর তাদের মধ্যে ৬০°র ব্যবধান।

৪ নং ছবিতে O বিন্দ্বটি হল ভূগোলকের কেন্দ্র। AB হল অক্ষাংশিক বৃত্তের ৬০°র চাপ — তাতে A আর B বন্দর দ্বটি রয়েছে। C বিন্দ্বটি হল অক্ষাংশিক বৃত্তের কেন্দ্র। দ্বটি বন্দরের মধ্যে দিয়ে আঁকতে হবে একটা কাল্পনিক মহা বৃত্তের চাপ যার কেন্দ্র হল O বিন্দ্বটি — ভূগোলকের কেন্দ্র। স্বতরাং তার ব্যাসার্ধ হল OB=OA=R। আমরা দেখব এই চাপটি AB চাপটির কাছাকাছি আসছে তবে একেবারে মিলছে না।

এখন প্রতিটি চাপের দৈর্ঘ্য মাপা যাক। A আর B বিন্দ্বদ্বটি ৬০°র অক্ষাংশে

রয়েছে বলে OA আর OB ব্যাসার্ধ দুটি ভূগোলকের কল্পিত অক্ষ OCর সঙ্গে ৩০° কোণ করে রয়েছে। সমকোণ ত্রিভুজ ACOতে AC (=r) বাহুটি — যেটি সমকোণের কাছাকাছি, আর ৩০° কোণের বিপরীতে রয়েছে — হল AO অতিভুজের অর্ধেকের সমান, তাই $r = \frac{R}{২}$। এখন AB চাপের দৈর্ঘ্য হল অক্ষাংশিক বৃত্তের দৈর্ঘ্যের একভাগের ছভাগ। অক্ষাংশিক বৃত্তের দৈর্ঘ্য আবার মহা বৃত্তের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক (ব্যাসার্ধও অর্ধেক কম বলে)। তাই ক্ষুদ্র বৃত্ত চাপ ABর দৈর্ঘ্য হবে:

$$\overset{\frown}{AB} = \frac{১}{৬} \times \frac{৪০,০০০}{২} = ৩,৩৩৩ \text{ কিঃমিটার।}$$

৪ নং ছবি: একটি গোলকক্ষেত্রে সমান্তরালের চাপে আর একটি বৃহৎ বৃত্তের চাপে A আর B বিন্দুদুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপার উপায়।

এবার এ দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী মহা বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য জানতে হলে আমাদের AOB কোণের মূল্য বের করতে হবে। ৬০°র ক্ষুদ্র বৃত্ত চাপের দুটি প্রান্তকে যুক্ত করেছে AB জ্যা। এই জ্যাটি ঐ একই ক্ষুদ্র বৃত্তের অন্তর্লিখিত সমবাহু ষটকোণের একটি বাহু। তাই $AB = r = \frac{R}{২}$। যদি ভূগোলকের কেন্দ্র Oকে AB জ্যার মাঝামাঝি জায়গায় D বিন্দুর সঙ্গে OD সরলরেখা টেনে যুক্ত করি, তাহলে ODA এই সমকোণ ত্রিভুজ পাব, তার D কোণটি হবে সমকোণ, DA যদি হয় ½ AB আর OA হয় R, তাহলে $\text{sinus } AOD = AD:AO = \frac{R}{৪} : R = ০\cdot২৫$। সুতরাং লগ্-টেবলে চোখ বোলালেই দেখা যাবে যে

$$\angle AOD = ১৪°২৮'৩০'', \quad \text{সুতরাং} \quad \angle AOB = ২৮°৫৭'।$$

ভূগোলকের মহা বৃত্তের একটি মিনিটের দৈর্ঘ্যকে নৌপথের এক মাইল বা প্রায় ১·৮৫ কিঃমিটার ধরে হিসেব করলেই অতি সহজে সবচেয়ে ছোট পথ পাওয়া যাবে। তার মানে ২৮°৫৭′ = ১,৭৩৭′ ≈ ৩,২১৩ কিঃমিটার।

এই ভাবে দেখতে পাই অক্ষাংশিক বৃত্ত ধরে যে পথ -- নৌপথের চার্টে তাকে সরল রেখায় দেখান হয় — তার দৈর্ঘ্য হল ৩,৩৩৩ কিঃমিটার। অথচ মহা বৃত্ত অনুগ পথ — চার্টে তাকে বক্র রেখায় দেখান হয় — হল ৩,২১৩ কিঃমিটার, তার মানে ১২০ কিঃমিটার কম।

একটা সুতো আর ইস্কুলের ভূগোলক নিয়ে আপনারা অতি সহজেই দেখতে পারবেন

যে আমাদের ছবিটা ঠিকই আছে। দেখবেন মহা বৃত্ত চাপগুলি যেমন দেখান হয়েছে ঠিক তাই। ১ নং ছবিতে আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যে 'সরলরেখাটি' টানা হয়েছে সেটি হল ৬,০২০ মাইল, 'বাঁকা' পথটা যেখানে মাত্র ৫,৪৫০ মাইল। তার মানে ৫৭০ মাইল (১,০৫০ কিঃমিঃ) কম।

বিমানপথের চার্টে লণ্ডন থেকে সাংহাই যাবার 'সোজা' আকাশ পথ কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে দিয়ে যাবে। কিন্তু সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ গেছে লেনিনগ্রাদের উত্তর দিয়ে। সময় আর ইন্ধন বাঁচানর দিক দিয়ে ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়।

পালতোলা জাহাজের যুগে সময়টা সবসময় মূল্যবান বলে বিবেচিত হত না — 'সময়'কে লোকে তখনো 'টাকা' বলে মনে করতে সুরু করেনি। বাষ্পচালিত জাহাজ চালু হলে পর প্রতি টন কয়লার অর্থ টাকা খরচ। সেইজন্য বাষ্পচালিত জাহাজ চলে সবচেয়ে ছোট পথ ধরে। মের্কাতরের অভিক্ষেপের উপর নয়, যাকে 'কেন্দ্রীয়' অভিক্ষেপ বলা হয় তার উপরই তারা প্রধানত নির্ভর করে। 'কেন্দ্রীয়' অভিক্ষেপে চার্টের মহা বৃত্ত চাপগুলি সরলরেখার দ্বারা দেখান হয়।

পুরনো কালের সাগরযাত্রীরা তবে কেন এমন ভুল চার্ট ব্যবহার করত? কেন বেছে নিত অসুবিধের পথটা? নৌপথের চার্টের যে বৈশিষ্ট্যের কথা এখনি বলা হল প্রাচীন নাবিকরা তার কথা জানত না তা মনে করলে ভুল করা হবে। স্বভাবতই সেটা কারণ নয়। ব্যাপার হল, অসুবিধে সত্ত্বেও মের্কাতরের অভিক্ষেপের চার্টগুলিতে নাবিকদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু আছে। প্রথমত তাতে ভূগোলকের নানা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র অংশের প্রান্তগুলি নিখুঁৎভাবে দেখান হয়েছে, এ ঘটনা সত্ত্বেও যে বিষুবরেখা থেকে জায়গাটা যত দূরে, প্রান্তরেখাগুলিও ততই ছড়িয়ে যাবে। উচ্চ অক্ষাংশে এজাতের বিকৃতি এতই বেড়ে যায় যে নৌপথের চার্টে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা যার জানা নেই সে ভাববে গ্রীনল্যাণ্ড বুঝি আফ্রিকারই সমান কিম্বা আলাস্কা অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও বড়, আসলে গ্রীনল্যাণ্ড আফ্রিকার চেয়ে পনের গুণ ছোট, আলাস্কা তো গ্রীনল্যাণ্ডের সঙ্গে মিলেও অস্ট্রেলিয়ার অর্ধেকের বেশি হবে না। বিভিন্ন মহাদেশগুলোর আকার সম্বন্ধেও তার একেবারে ভুল ধারণা জন্মাবে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য যাদের জানা আছে তেমন নাবিক মোটেই অসুবিধেয় পড়বে না, কারণ নৌপথের চার্টের ছোট ছোট মানচিত্রাংশগুলোয় নিখুঁৎ ছবিই পাওয়া যায় (৫ নং ছবি)।

তাছাড়া নৌচালনার হাতেনাতে করণীয় কাজগুলোর সমস্যা সমাধানে নৌপথের চার্টগুলোর মূল্য অনেক। এক দিক দিয়ে একমাত্র এই চার্টে জাহাজের সত্যিকার সোজা পথ সরলরেখা দিয়ে দেখান হয়। 'সোজা পথে' জাহাজ চালান মানে হল একই দিকে মুখ করে এগন একই রাম্ব্ ধরে — সবকটা মধ্যরেখাকে সমকোণ করে কেটে যাওয়া। যে চার্টে মধ্যরেখাগুলো সমান্তরাল সরলরেখা দিয়ে চিহ্নিত একমাত্র তাতেই লক্সোড্রোম নামে

৫ নং ছবি: নাবিকদের বা মের্কাতরের চার্টে পৃথিবী। বিষুবরেখার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর ঘের এই চার্টে মোটা করে দেখান হয়। গ্রীনল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কে বড়? (উত্তর বইয়েই পাবেন।)

পরিচিত এই পথকে সরলরেখার দ্বারা দেখান যেতে পারে।* ভূগোলকের মধ্যরেখাগুলোকে অক্ষাংশগুলো সমকোণে কেটে গেছে, তাই এই চার্টে অক্ষাংশগুলোকে দেখাতে হবে সরলরেখায়, মধ্যরেখার উপর দাঁড় করান লম্ব হিসেবে। অর্থাৎ পাওয়া যায় সেই কাটাকুটির ছক, যা নৌপথের চার্টের বৈশিষ্ট্য।

এখন তবে বুঝতে পারবেন মের্কাতরের অভিক্ষেপ নাবিকরা এত পছন্দ করে কেন। যে বন্দর গন্তব্যস্থল তার পথ ঠিক করার জন্য নৌচালক ছাড়ার বন্দর আর পেঁছনর বন্দর দুটিকে রুলার দিয়ে যোগ করে দেয়। তারপর সে রেখাটি মধ্যরেখার উপর কত কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখে নেয়। সমুদ্রের বুকে এই কোণ ধরে জাহাজ চালিয়ে নৌচালক ঠিকমতোই তার লক্ষ্যে পেঁছয়। তাই 'লক্সোড্রোম' সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে কমখরচার না হলেও সাগরযাত্রীদের পক্ষে কিছু পরিমাণে সুবিধাজনক। যেমন উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত যেতে হলে (১ নং ছবি দ্রঃ) দঃ ৮৭°·৫০ পথটাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু যদি সবচেয়ে ছোট পথ নিতে চাই — যাকে বলা হয় অর্থোড্রোম — তবে আমাদের ক্রমাগতই দিক বদলাতে হবে, ছবিতে যেমন দেখছেন। দঃ ৪২°·৫০ থেকে সুরু করে শেষ করতে হবে উঃ ৫৩°·৫০এ (এ পথ অসম্ভব কারণ সবচেয়ে ছোট পথ নিতে গিয়ে আমরা দক্ষিণ মেরুর বরফ প্রাচীরে আটকা পড়ব)।

'লক্সোড্রোম' আর 'অর্থোড্রোম' এ দুটি পথ একমাত্র তখনই মেলে যখন পথটা মহা বৃত্তে বিষুবরেখা বা কোন একটা মধ্যরেখা ধরে চলে। নৌপথের চার্টে তাদের সরলরেখায় আঁকা হয়। অন্য সব ক্ষেত্রে তারা অন্য দিকে যায়।

দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশের ডিগ্রী

প্রশ্ন

পাঠকরা ভূগোলের দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশের সঙ্গে নিঃসন্দেহে পরিচিত আছেন বলেই ধরে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস নিচের এই প্রশ্নের ঠিক জবাব সবাই দিতে পারবেন না:

অক্ষাংশের ডিগ্রী কি সবসময়ই দ্রাঘিমার ডিগ্রীর চেয়ে দীর্ঘ হয়?

উত্তর

বেশির ভাগ লোকেরই বিশ্বাস যে প্রতিটি সমান্তরাল চক্র মধ্যরেখার চক্রের চেয়ে ছোট। দ্রাঘিমার ডিগ্রী মাপা হয় সমান্তরাল চক্র অনুযায়ী, অক্ষাংশের ডিগ্রী — মধ্যরেখা অনুযায়ী তাই অনেকেই মনে করে যে প্রথমটা কখনই দ্বিতীয়টার চেয়ে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু তারা একথা ভুলে যায় যে পৃথিবীটা নিখুঁৎ গোল নয়, এলিপসয়েড; বিষুবরেখার কাছে

---

* লক্সোড্রোম আসলে হল ভূগোলকের গায়ে বাঁকা সর্পিলরেখা।

তা খানিকটা স্ফীত। এই এলিপসয়েডে শুধু বিষুবরেখা নয়, তার একেবারে নিকটবর্তী সমান্তরাল চক্রগুলিও মধ্যরেখার চেয়ে লম্বা। হিসেব অনুযায়ী সমান্তরাল চক্র বা দ্রাঘিমার ডিগ্রী মধ্যরেখা বা অক্ষাংশের ডিগ্রীর চেয়ে প্রায় ৫°র অক্ষাংশ পর্যন্ত দীর্ঘতর।

আমুণ্ডসেন কোন দিকে উড়েছিলেন?

প্রশ্ন

আমুণ্ডসেন একবার উত্তর মেরু আরেকবার দক্ষিণ মেরু থেকে ফেরার সময় কোন কোন দিকে এগিয়েছিলেন?

বিখ্যাত পর্যবেক্ষকের ডায়েরীর পাতার দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিতে হবে।

উত্তর

উত্তর মেরু হল ভূগোলকের সবচেয়ে উত্তরের জায়গা। সেখান থেকে আমরা যে পথেই এগই না কেন সবসময় দক্ষিণেই যাব। উত্তর মেরু থেকে ফেরার সময় আমুণ্ডসেন একমাত্র দক্ষিণে ছাড়া আর কোন দিকেই যেতে পারতেন না। 'নর্গে'তে করে উত্তর মেরু যাবার সময় তিনি ডায়েরীতে যা লিখেছিলেন তা তুলে দিলাম:

'"নর্গে" উত্তর মেরুর কাছে পাক দেয়। তারপর আমরা আমাদের যাত্রা চালিয়ে যাই... আমাদের ডিরিজিব্ল্ রোম ছাড়ার পর এই প্রথম দক্ষিণমুখী পথ নিল।' এইভাবেই দক্ষিণ মেরু থেকে ফেরার সময়ও আমুণ্ডসেনের কেবল **উত্তর** মুখে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

এক তুর্কীর বিষয়ে একটা হাসির গল্প চালু আছে। সে একবার দেশের 'একেবারে পূর্ব' প্রান্তে এসে পড়েছিল। 'সামনেও পুব, বাঁয়েও পুব, ডাইনেও পুব। পশ্চিমের কী হল? ভাবছেন বুঝি বহুদূরে পশ্চিমকে অল্প স্বল্প দেখা যাবে?.. মোটেই না! ঐ পিছনেও পুব। সবখানে, চারপাশেই কেবল শেষহীন পুব।'

চারদিকেই পুব এমন দেশ আমাদের পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কিন্তু চারপাশেই দক্ষিণ এমন জায়গা আছে, যেমন আছে চারপাশ থেকেই 'শেষহীন' উত্তরে ঘেরা ভূভাগ। উত্তর মেরুতে এমন বাড়ি বানান সম্ভব যার চারটে দেয়ালেরই মুখ দক্ষিণে। সোভিয়েত উত্তর মেরু অভিযাত্রীরা একাজ সত্যিই করতে পারেন।

সময় মাপার পাঁচটি উপায়

হাতঘড়ি আর দেয়ালঘড়িতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে তাদের মর্ম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমার বিশ্বাস 'এখন সন্ধ্যা ৭টা' একথাটার মানে অনেক পাঠকই বুঝিয়ে বলতে পারবেন না।

ও কথাটায় শুধু কি এই বোঝায় যে ছোট কাঁটা এখন সাতের ঘরে? সাতের ঘরটার মানে কী? ঐ সংখ্যাটা বুঝিয়ে দেয় মধ্যাহ্নের পর দিনের এতটা পার হয়ে গেছে। কিন্তু **কোন** মধ্যাহ্নের পর, আর, প্রথম কথা, **কোন** দিনের এতটা? দিন জিনিসটাই বা কী? কথায় বলে 'দিন গেল, রাত গেল, তবে জেনো পুরো দিবস গেল।' এই দিবস বা দিন হল সূর্যের চোখে পৃথিবীর একটি সম্পূর্ণ আবর্তনের সময়। কাজের সুবিধার জন্য তাকে এই ভাবে মাপা হয়: মাথার ঠিক উপর, তার মানে 'সুবিন্দু'র (zenith) সঙ্গে দিগন্তের সর্বদক্ষিণ বিন্দুকে যোগ করে এমন একটা কাল্পনিক রেখা ধরা হয়। এই রেখা একবার পার হবার পর সূর্য বা সঠিকভাবে সূর্যের কেন্দ্র যখন তাকে আর একবার পেরয়, তখনই সম্পূর্ণ হয় পুরো এক দিন। আর এই রেখা সূর্য যখন পেরচ্ছে, তখনই হল মধ্যাহ্ন। সূর্য এই রেখা কখনো পার হয় একটু আগে, কখনো একটু পরে। এই 'সত্যিকার মধ্যাহ্ন' অনুযায়ী ঘড়ি চালান সম্ভব নয়। অত্যন্ত নিপুণ কারিগরও সূর্যের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এমন ঘড়ি বানাতে পারে না; সে কাজের পক্ষে সূর্য অত্যন্ত বেঠিক। এক শতাব্দী আগে প্যারিসের ঘড়ির কারিগররা একথাই জপত — 'সূর্য ঠিক সময় দেয় না।'

আমাদের ঘড়িগুলো সত্যিকার সূর্য অনুযায়ী চলে না, চলে এক কল্পিত সূর্য অনুযায়ী। সে সূর্যের না আছে দীপ্তি না আছে উত্তাপ। ঠিকভাবে সময় মাপার জন্যই তাকে বানান হয়েছে। এমন একটি নাক্ষত্র বস্তুর কথা কল্পনা করুন, যার গতি সারা বছরেই একরকম। সত্যিকার সূর্য আপাতভাবে যতটা সময় নেয়, প্রায় ঠিক ততটা সময়েই পৃথিবীকে সে পাক দেয়। জ্যোতির্বিদ্যায় এই বানান জিনিসটির নাম হল 'মধ্য সূর্য' (mean sun)। সুবিন্দু থেকে দক্ষিণের রেখাটি সে যে মুহূর্তে পার হয় সে মুহূর্তটিকে বলে 'মধ্য দ্বিপ্রহর'। দুটি মধ্য দ্বিপ্রহরের মাঝখানের বিরতিকে বলে 'মধ্য সৌরদিবস'। এই ভাবে মাপা সময়কে বলে 'মধ্য সৌরকাল'। আমাদের হাতঘড়ি আর দেয়ালঘড়িগুলো এই মধ্য সৌরকাল অনুযায়ী চালান হয়। সূর্যের ছায়া অনুসারী সূর্যঘড়ি কিন্তু সেই জায়গার আসল সৌরকাল দেখায়।

যা বলা হল তাতে পাঠকের মনে হতে পারে, ভূগোলক বুঝি তার অক্ষে সমানভাবে ঘোরে না আর সেই কারণেই বুঝি আসল সৌরদিবসের দৈর্ঘ্যের হেরফের হয়। কিন্তু সে কথা ভুল। কারণ এই হেরফেরের জন্য দায়ী সূর্য-প্রদক্ষিণ পথে পৃথিবীর গতির অসমানতা। একটুখানি ধৈর্য ধরুন, তবেই বুঝতে পারবেন দিনের দৈর্ঘ্যকে তা কী ভাবে প্রভাবিত করে। ৬ নং ছবিটা দেখুন। ছবিতে ভূগোলকের দুটি ধারাবাহিক অবস্থান দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে দেখুন বাঁদিকের অবস্থানটা। নিচের তীরটা পৃথিবীর অক্ষে আবর্তনের পথটা দেখাচ্ছে: উত্তর মেরু থেকে দেখলে ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখে। A বিন্দুতে এখন দুপুর। এই বিন্দুটি ঠিক সূর্যমুখী। এখন ধরা যাক পৃথিবী তার একটি সম্পূর্ণ আবর্তন শেষ করেছে। সে

সময়ের মধ্যে সে ডাইনে সরে গিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে এসেছে। A বিন্দু অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যাসার্ধ একদিন আগে যা ছিল তাই আছে। কিন্তু বিন্দুটা আর ঠিক সূর্যমুখী নয়। A বিন্দুতে তখনো কেউ দুপুরের মুখ দেখেনি। সূর্য রেখাটার বাঁয়ে পড়ে গেছে বলে পৃথিবী আরো কয়েক মিনিট আবর্তিত হলে পরেই A বিন্দুতে দুপুর দেখা দেবে।
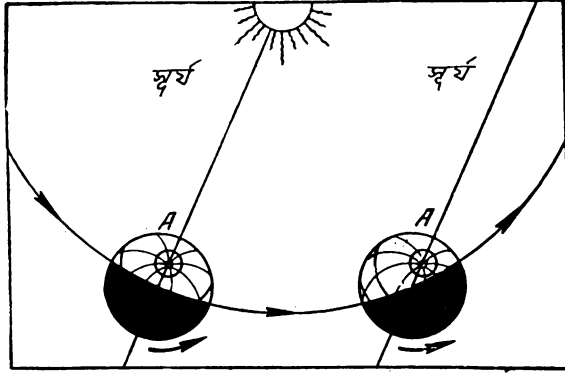
৬ নং ছবি: সৌর দিন কেন নাক্ষত্র দিনের চেয়ে বড়?
(বইয়ে বিস্তৃত তথ্য পাবেন।)

এর ফলে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় দুটি সঠিক সৌর দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়টা পৃথিবীর একবার পুরো অক্ষাবর্তনে যত সময় লাগে তার চেয়ে **দীর্ঘতর**। পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে সমানভাবে একটা **গোল** কক্ষপথে চলত — সূর্য থাকত তার কেন্দ্রে, তাহলে অক্ষাবর্তনের সত্যিকার সময় আর সূর্য অনুযায়ী যে সময়টা আমরা ধরে নিই তার পার্থক্য প্রতিদিন একই থাকত। একথা সহজেই প্রমাণ করা যায়, বিশেষ করে যদি একথা মনে রাখি যে পার্থক্যের এই ছোট ছোট ভগ্নাংশগুলি যোগ করেই সারা বছরে একটা গোটা দিন হয়ে যায় (পৃথিবী তার কক্ষপথে যেতে যেতে বছরে একটা বাড়তি অক্ষাবর্তন করে)। সুতরাং প্রতি অক্ষাবর্তনের প্রকৃত কাল হল

৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিন: ৩৬৬$\frac{1}{4}$ = ২৩ ঘঃ ৫৬ মিঃ ৪ সেঃ।

এখানে বলি দিনের 'প্রকৃত' দৈর্ঘ্য হল কোনো একটা নক্ষত্র অনুযায়ী পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের কাল; এর ফলেই 'নাক্ষত্র' দিন কথাটির উৎপত্তি।

একটি নাক্ষত্র দিন সৌর দিনের চেয়ে **গড়ে** ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ, মোটামুটি চার মিনিট ছোট। এই পার্থক্যের তারতম্য ঘটে। প্রথম কারণ, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বৃত্তে নয়,

অতিবৃত্তিক পথে, যার কোন অংশ সূর্যের কাছে, কোনটা দূরে থাকে বলে পৃথিবীর গতি কখনো দ্রুত হয়, কখনো মন্থর। দ্বিতীয় কারণ হল পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ পৃথিবীর কক্ষপথের অতিবৃত্তের দিকে ঝুঁকে থাকে। এই দুটি কারণেই বিভিন্ন দিনে প্রকৃত আর মধ্য সৌরকালে কয়েক মিনিটের পার্থক্য ঘটে, কোন কোন দিন তা ১৬ মিনিটেও পৌঁছয়। এই দুটি সময়ে মিল ঘটে বছরে কেবল চার বার — ১৫ই এপ্রিল, ১৪ই জুন, ১লা সেপ্টেম্বর আর ২৪শে ডিসেম্বর। অপরপক্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী আর ২রা নভেম্বরে সবচেয়ে বেশি ফারাক দেখা যায় — প্রায় একঘণ্টার সিকি ভাগ। ৭ নং ছবির বাঁকা রেখাটা বছরের নানা সময়ে এই দুই সময়ের পার্থক্য দেখাচ্ছে।

১৯১৯ সালের আগে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা তাদের ঘড়ি মেলাত স্থানীয় সৌরকাল অনুযায়ী। বিভিন্ন মধ্যরেখায় মধ্য দ্বিপ্রহর আসে বিভিন্ন সময়ে ('স্থানীয় দুপুর)। তার ফলে প্রতি সহরেরই নিজ স্থানীয় সময় ছিল। কেবল ট্রেনের সময়তালিকা রচিত হত পেত্রগ্রাদের সময়কে সারা দেশের সময় বলে ধরে নিয়ে। সহরবাসীরা মেনে চলত দুটি ভিন্ন সময় — 'সহরের' সময় আর 'ট্রেনের' সময়। এ দুইয়ের প্রথমটা হল স্থানীয় মধ্য সৌরকাল — সহরের ঘড়িতে যা দেখা যেত, দ্বিতীয়টা পেত্রগ্রাদের মধ্য সৌরকাল, রেলস্টেশনের ঘড়িতে তা নির্দিষ্ট হত। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রেনের সময়তালিকা রচিত হয় মস্কো সময় অনুযায়ী।

১৯১৯ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সময় মাপা হয় স্থানীয় নয়, 'আঞ্চলিক' সময় অনুযায়ী। ভূগোলককে মধ্যরেখাগুলি ২৪টি সমান 'অঞ্চলে' বিভক্ত করে। এক একটা অঞ্চলের সর্বত্র থাকে একই সময় — অর্থাৎ একই মধ্য সৌরকাল, যা হল ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটির মধ্য মধ্যরেখার সময়। কাজেই এখন ভূগোলকে একই সঙ্গে চব্বিশটি ভিন্ন ধরনের সময় রয়েছে। আঞ্চলিক সময় মাপ পরিবর্তিত হবার আগে যে নানারকমের অসংখ্য সময় ছিল তা আর এখন নেই।

প্রকৃত সৌরকাল, স্থানীয় মধ্য সৌরকাল আর আঞ্চলিক সময় — সময় মাপার এই তিনটি উপায়ের সঙ্গে আরেকটি যোগ করতে হবে। কেবল জ্যোতির্বিদরাই তাকে কাজে লাগান! নাম তার 'নাক্ষত্রকাল'। তাকে মাপা হয় আগে যে নাক্ষত্র দিনের কথা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী। নাক্ষত্র দিন, আমরা আগেই দেখেছি, সৌর দিনের চেয়ে চার মিনিট ছোট। ২২শে সেপ্টেম্বর নাক্ষত্র আর সৌরকালে মিল ঘটে। তারপর থেকে প্রথমটি প্রতিদিন চার মিনিট করে এগিয়ে যায়।

শেষে সময় মাপার পঞ্চম উপায়টির কথা। **গ্রীষ্মের** সময়। এই রীতিটা সোভিয়েত ইউনিয়নে সারা বছরেই মানা হয়, ইউরোপের অন্য অধিকাংশ দেশে কেবল গ্রীষ্মে।

গ্রীষ্মের সময় আঞ্চলিক সময়ের চেয়ে ঠিক এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে। বছরে বসন্ত

থেকে হেমন্তকাল পর্যন্ত যে উজ্জ্বল দিন পাওয়া যায় সে সময়ে কাজের দিন আগে সুরু আর শেষ করে কৃত্রিম আলোকব্যবস্থার ইন্ধন বাঁচানর জন্যই তা করা হয়। করা হয় সরকারীভাবে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়ে। পশ্চিমে প্রতি বসন্তে রাত একটায় ঘড়ির কাঁটাকে দুটোয় সরিয়ে দেওয়া হয়, হেমন্তে ঠিক তার উল্টোটা করা হয়।
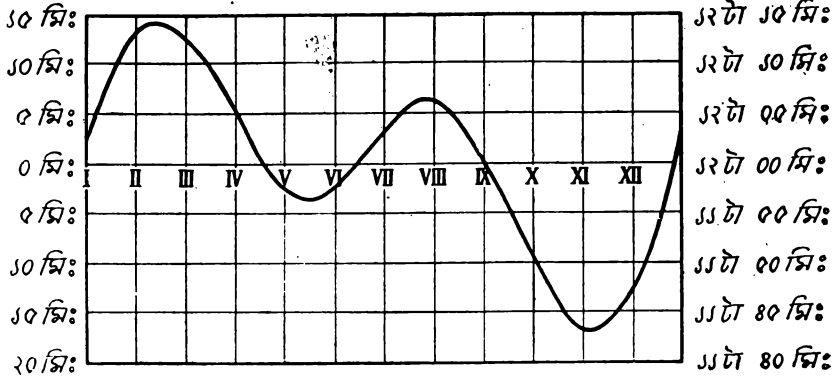
৭ নং ছবি: এ হল 'টাইম ইকুয়েশন চার্ট'। একটি দিনে প্রকৃত আর মধ্য সৌর দ্বিপ্রহরে কী বিরাট তফাৎ ঘটে তা দেখান হচ্ছে। যেমন, ১লা এপ্রিল প্রকৃত দ্বিপ্রহরে ঠিক ঘড়িতে বাজবে ১২টা ৫; তার মানে বাঁকা রেখাটা প্রকৃত দ্বিপ্রহরের মধ্য সময় দেখাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সারা বছরের জন্যই ঘড়ি এগন থাকে — গ্রীষ্ম শীত দুয়েতেই। এর ফলে অবশ্য বিদ্যুৎ শক্তি আর বেশি বাঁচে না কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কাজ আরো সমানভাবে চলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রীষ্মের সময় প্রথম চালু হয় ১৯১৭ সালে*; কিছুকাল পর্যন্ত ঘড়িকে দু তিন ঘণ্টা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া হত। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রীষ্মের সময় ফের চালু করা হয় ১৯৩০ সালের বসন্ত থেকে, আর আঞ্চলিক সময়ের চেয়ে তা ঠিক এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে।

দিনের আলো কতক্ষণ থাকে

পৃথিবীর কোন একটি অংশে বা বছরের কোন একটি দিনে দিনের আলো কতক্ষণ থাকে তা জানতে হলে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার যথোপযুক্ত তালিকা দেখতে হবে।

---

* গ্রন্থকারের উদ্যোগেই তা হয়। তিনিই তার প্রয়োজনীয় বিধির খসড়া রচেছিলেন — **সম্পাঃ**।

কিন্তু পাঠকের পক্ষে এত নিখুঁৎ হিসেবের কোন প্রয়োজন নেই। একটা মোটামুটি ঠিক হিসেব পেতে হলে ৮ নং ছবিটাই যথেষ্ট। ছবিটার বামপার্শ্বে রয়েছে ঘণ্টা হিসাবে **দিনের আলোর পরিমাণ।** নিচের সীমানায় পাওয়া যাবে খ-বিষুবরেখা (celestial equator) থেকে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব, যাকে সূর্যের 'অবনমন' বলা হয়। ডিগ্রী দিয়ে তা মাপা হয়েছে। বাঁকা রেখাগুলো হল বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ স্থলের নানা অক্ষাংশ।

ছবিটাকে কাজে লাগাতে হলে বছরের নানা দিনে বিষুবরেখা থেকে দুদিকেই সূর্যের কৌণিক দূরত্ব কত তা আমাদের জানতে হবে। নিচে তার হিসেব দেওয়া হল।

দিন	সূর্যের অবনমন	দিন	সূর্যের অবনমন
২১শে জানুঃ	— ২০°	২৪শে জুলাই	+ ২০°
৮ই ফেব্রুঃ	— ১৫	১২ই আগস্ট	+ ১৫
২৩শে "	— ১০	২৮শে "	+ ১০
৮ই মার্চ	— ৫	১০ই সেপ্টেঃ	+ ৫
২১শে "	০	২৩শে "	০
৪ঠা এপ্রিল	+ ৫	৬ই অক্টোঃ	— ৫
১৬ই "	+ ১০	২০শে "	— ১০
১লা মে	+ ১৫	৩রা নভেঃ	— ১৫
২১শে "	+ ২০	২২শে "	— ২০
২২শে জুন	+ ২৩ $\frac{১}{২}$	২২শে ডিসেঃ	— ২৩ $\frac{১}{২}$

কাজে লাগানর কয়েকটা উদাহরণ:

১) মাঝ এপ্রিলে লেনিনগ্রাদে (অক্ষাংশ ৬০°) দিনের আলো কতক্ষণ থাকে সেটা বের করুন।

তালিকায় দেখছি এপ্রিলের মাঝামাঝি সূর্যের অবনমন হল +১০°, ওটাই ঐ সময়ে খ-বিষুবরেখা থেকে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব। এখন আমাদের ছবির নিচের সীমানায় ১০°র জায়গাটা খুঁজে বের করে উপরের দিকে একটি লম্বরেখা টানতে হবে, এই লম্ব ৬০ নং সমান্তরালের বাঁকা রেখাটিকে ছেদ করে যাবে। এবার বাঁয়ে তাকালে দেখা যাবে যে এ ছেদ বিন্দুটা রয়েছে ১৪ই সংখ্যাটিতে। তার মানে আমরা যে দিনটির কথা জানতে চাই সে দিনটিতে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ৩০ মিঃ আলো থাকে। 'প্রায়' বললাম কারণ এই ছবিতে 'বায়ুমণ্ডলীয়

প্রতিসরণ' (atmospheric refraction) বলে যা পরিচিত তার প্রভাব হিসেব করা হয়নি (১৫ নং ছবি দ্রঃ)।

২) আস্ত্রাখানে (৪৬° উঃ অক্ষাংশ) ১০ই নভেম্বরে দিনের আলোর স্থায়িত্ব বের করুন।

১০ই নভেম্বরে সূর্যের অবনমন হল −১৭° (সূর্য এখন **দক্ষিণ** গোলার্ধে)। উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ১৪ই ঘণ্টার স্থায়িত্ব পাওয়া গেল। কিন্তু এখনকার অবনমন '−' বলে, যে সংখ্যা পাওয়া গেল সেটা দিনের আলোর নয় রাতের অন্ধকারের স্থায়িত্ব বোঝায়। তাই ২৪ থেকে ১৪ই বাদ দিতে হবে। রইল ৯ই ঘণ্টা, ওটাই হল ঐ নির্দিষ্ট দিনের আলোর স্থায়িত্বকাল।

সূর্যোদয়ের সময়টাও বের করা যায়। ৯ইকে অর্ধেক করে পাই ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ। ৭ নং ছবি অনুযায়ী আমরা জানি যে ১০ই নভেম্বরে প্রকৃত দুপুরে ঘড়িতে ১১টা ৪৩ বাজে। সূর্যোদয়ের সময় পেতে হলে ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ বাদ দিতে হবে। তবেই জানতে পাব যে সূর্য ৬টা ৫৮ মিনিটে উঠবে। সূর্যাস্ত তেমনি আবার ঘটবে ১১টা ৪৩ মিনিট + ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট = ১৬টা ২৮ মিনিটে, তার মানে বিকেল ৪টে ২৮ মিনিটে। ৭ নং আর ৮ নং ছবিদুটোকে ঠিকভাবে কাজে লাগালে তা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার তালিকার বদলী হিসেবে চলতে পারে।

৮ নং ছবি: দিনের আলোর স্থায়িত্বের চার্ট।
(বইয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন।)

যে পদ্ধতির কথা এতক্ষণ বলা হল তা কাজে লাগিয়ে একটা বিশেষ অক্ষাংশে সারা বছরে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের চার্ট তৈরী করতে পারা যায়। ৯ নং ছবিতে ৫০ নং সমান্তরালের তেমন একটি উদাহরণ দেওয়া হল, দিনের আলোর স্থায়িত্বও তাতে রয়েছে (ছবিটি অবশ্য গ্রীষ্মের সময় নয়, স্থানীয় সময়ের ভিত্তিতে রচিত)। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে আপনারাও নিজেদের জন্য এরকম চার্ট বানাতে পারেন। তা যদি করেন, তাহলে চার্টটা এক নজর দেখেই বলে দিতে পারবেন বিশেষ একটি দিনে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত মোটামুটি কখন হবে।
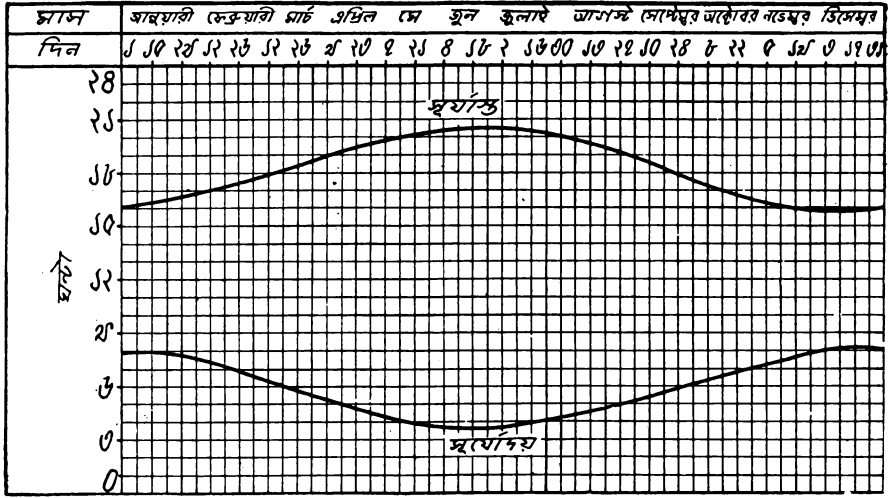
৯ নং ছবি: পঞ্চাশ সমান্তরালে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বার্ষিক চার্ট।

অসাধারণ ছায়া

১০ নং ছবি: প্রায় কোন ছায়া নেই। বিষুবরেখায় তোলা একটি ফোটোর প্রতিচিত্রণ।

১০ নং ছবিটা আপনাদের কাছে হয়ত খুব অদ্ভুত ঠেকবে। খালাসীটি কড়া রোদে দাঁড়িয়ে আছে, তবু বলতে গেলে কোন ছায়াই পড়েনি।

ছবিটা কিন্তু খাঁটি। অবশ্য সোভিয়েত দেশের অক্ষাংশে নয়, বিষুবরেখায়। সূর্য যখন প্রায় একেবারে মাথার উপরে, যাকে 'সুবিন্দু' বলে সেখানে।

সোভিয়েত দেশের অক্ষাংশসমূহে সূর্য কখনো সুবিন্দুতে থাকে না। তাই ও ছবি এ দেশে অসম্ভব। সোভিয়েত দেশের অক্ষাংশসমূহে ২২শে জুন দুপুরে সূর্য সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে। গ্রীষ্মমণ্ডলের (কর্কট ক্রান্তি, তার মানে সমান্তরাল ২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) উত্তর সীমানার সবখানেই সূর্য তখন সুবিন্দুতে। ছমাস পর ২২শে ডিসেম্বরে সমান্তরাল ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশের (মকর ক্রান্তি) সর্বত্র সূর্য সুবিন্দুতে থাকে। এই দুই সীমানার

মধ্যে অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলে মধ্যাহ্নের সূর্য বছরে দুবার সুবিন্দুতে থাকে। তখন তা এমনভাবে আলো দেয় যে কোন ছায়া পড়ে না, ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ছায়াটা তখন ঠিক পায়ের তলায়।

১১ নং ছবিটায় মেরুদেশের কথা বলা হয়েছে। ছবিটা আজগুবি হলেও শিক্ষাপ্রদ। বলাই বাহুল্য একজন লোকের একইসঙ্গে ছটা জায়গায় ছায়া পড়তে পারে না। শিল্পী কেবল চমকপ্রদভাবে মেরু সূর্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখাতে চেয়েছেন। বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে দিনের সব সময়েই সেখানে ছায়ার **দৈর্ঘ্য থাকে সমান**। তার কারণ হল মেরুতে সূর্য দিনের কখনোই দিগন্ত থেকে হেলে ওঠে না বা দিগন্তের দিকে হেলে নামে না — সোভিয়েত দেশের অক্ষাংশগুলিতে যা হয়। সেখানে সূর্য প্রায় দিগন্তের সমান্তরালে চলে। কিন্তু শিল্পী একটা ভুল করেছেন, মানুষের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছায়াটাকে খুবই ছোট করে এঁকেছেন। ছায়াটা অতো ছোট হতে হলে সূর্যকে ৪০° উঁচুতে উঠতে হত, মেরুতে তা অসম্ভব, কারণ সেখানে সূর্য ২৩½°র উপরে ওঠে না। একথা সহজেই দেখান যায় যে মেরুতে সবচেয়ে ছোট ছায়াও, যার ছায়া পড়ছে তার দৈর্ঘ্যের চেয়ে অন্তত ২·৩ গুণ বড় হয়। ত্রিকোণমিতির যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেই পাঠক তা হিসেব করে বের করতে পারেন।
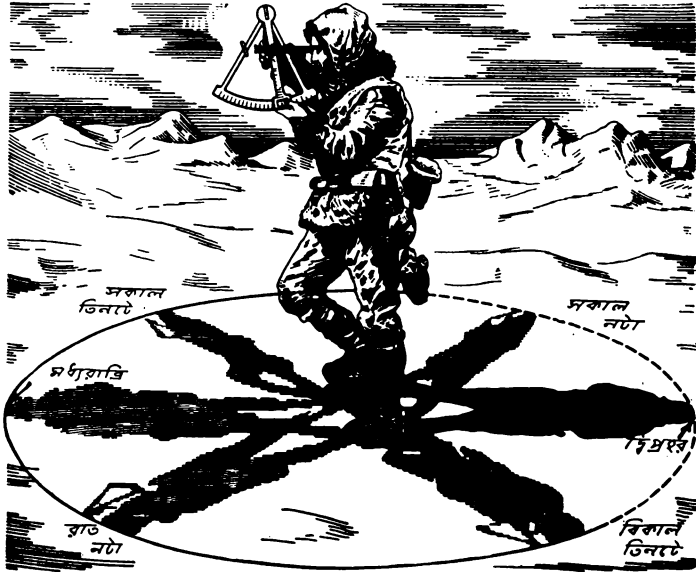
১১ নং ছবি: মেরুতে ছায়ার দৈর্ঘ্য সবসময়ই সমান।

দুই ট্রেনের সমস্যা

প্রশ্ন

দুটো একেবারে একরকমের ট্রেন একই গতিতে উল্টো মুখে ছুটে পরস্পরকে পার হয়ে গেল। একটা যাচ্ছে পশ্চিমে, আরেকটা পুবে। কোন ট্রেনটা বেশি ভারী?

উত্তর

বেশি ভারী মানে, রেলপথের উপর বেশি চাপ দিচ্ছে যে ট্রেনটা, সেটা পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের মুখের উল্টো দিকে ছুটছে। তার মানে পশ্চিম মুখে। পৃথিবীর অক্ষ আবর্তনে এ ট্রেনটার গতি অন্যটার চেয়ে কম। তাই কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের ফলে হারানো ওজনের পরিমাণ এই ট্রেনটার ক্ষেত্রে পুবমুখী এক্সপ্রেসটার চেয়ে কম।
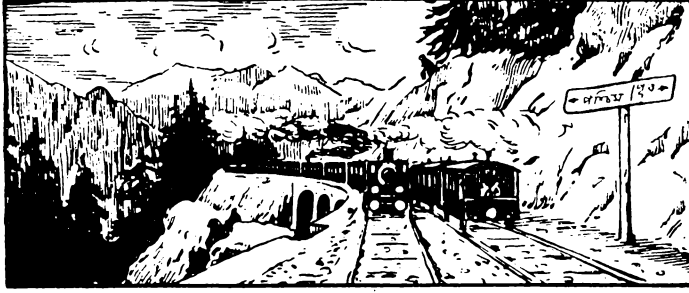
১২ নং ছবি: দুই ট্রেনের ধাঁধা।

পার্থক্য কতটা? ধরা যাক দুটো ট্রেন ৬০ নং সমান্তরাল ধরে ঘণ্টায় ৭২ কিঃমিটার বা সেকেণ্ডে ২০ মিটার বেগে ছুটছে। ঐ সমান্তরালে পৃথিবী তার অক্ষে সেকেণ্ডে ২৩০ মিটার বেগে ঘোরে। তাই পুবমুখী ট্রেনটার মোট পরিধীয় বেগ হল ২৩০ + ২০ তার মানে সেকেণ্ডে ২৫০ মিটার। পশ্চিমমুখী ট্রেনটার বেগ হল সেকেণ্ডে ২১০ মিটার।

প্রথম ট্রেনের কেন্দ্রাভিগ ত্বরণ হবে $\frac{V_১^২}{R} = \frac{২৫,০০০^২}{৩২,০০,০০,০০০}$ সেঃমিঃ/সেকেণ্ড^২,
কারণ ৬০ নং সমান্তরাল পরিধির ব্যাসার্ধ হল ৩,২০০ কিঃমিটার।

দ্বিতীয় ট্রেনটার কেন্দ্রাভিগ ত্বরণ হল $\frac{V_২^২}{R} = \frac{২১,০০০^২}{৩২,০০,০০,০০০}$ সেঃমিঃ/সেকেণ্ড^২।

দুটি ট্রেনের কেন্দ্রাভিগ ত্বরণের পার্থক্য

$$\frac{V_১^২ - V_২^২}{R} = \frac{২৫,০০০^২ - ২১,০০০^২}{৩২,০০,০০,০০০} \approx ০,৬ \text{ সেঃমিঃ/সেকেন্ড}^২ ।$$

এই সমান্তরালে কেন্দ্রাভিগ ত্বরণের মুখ মাধ্যাকর্ষণের মুখ থেকে ৬০°র কোণ করে আছে বলে আমাদের কেবল কেন্দ্রাভিগ ত্বরণের উপযুক্ত ভগ্নাংশই ধরতে হবে, তার মানে, ০·৬ সেঃমিঃ/সেকেন্ড২ × cos ৬০° = ০·৩ সেঃমিঃ/সেকেন্ড২।

এ থেকে মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণের সঙ্গে এই অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে $\frac{০\cdot৩}{৯৮০}$ বা মোটামুটি ০·০০০৩।

সুতরাং পুবমুখী ট্রেনটা পশ্চিমমুখী ট্রেনটার চেয়ে তার ওজনের ০·০০০৩ ভাগ কম। ধরা যাক ঐ ট্রেনটায় ইঞ্জিন ও ৪৫টা মালভরা ওয়াগন আছে — তার মানে ৩,৫০০ টন। ওজনে পার্থক্য তাহলে হবে ৩,৫০০ × ০·০০০৩ = ১,০৫০ কিলোগ্রাম।

২০,০০০ টনের একটা জাহাজে, বেগ তার ঘণ্টায় ৩৪ কিঃমিটার (২০ নট্), তিন টনের পার্থক্য দেখা দেবে। জাহাজের পুবমুখী যাত্রায় ওজনের কমতি ব্যারোমিটারেও প্রকাশ পাবে। পূর্বোক্ত বেগে পারার উচ্চতা হবে ০·০০০১৫ × ৭৬০! তার মানে পুবমুখী জাহাজটায় ব্যারোমিটারের পারা থাকবে পশ্চিমমুখীর তুলনায় ০·১ মিলিমিটার নিচে। এমনকি লেনিনগ্রাদের রাস্তায় যে লোক ঘণ্টায় ৫ কিঃমিটার বেগে পুবমুখে হাঁটছে তার ওজন সে পশ্চিমমুখে হাঁটলে পর যা থাকত তার চেয়ে প্রায় ১½ গ্রাম কমে যাবে।

পকেটঘড়ি দিয়ে দিকনির্ণয়

রোদে ভরা দিনে পকেটঘড়ির সাহায্যে দিকনির্ণয় করাটা অনেকেই জানে। ঘড়িটাকে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে ছোট কাঁটাটা সূর্যের দিকে মুখ করে। তারপর ছোট কাঁটা আর ৬ — ১২ এই রেখাটা মিলে যে কোণ সৃষ্টি হচ্ছে তাকে অর্ধেক করতে হবে। দ্বিখণ্ডক রেখাটি হবে দক্ষিণমুখী। কেন তা সহজেই বোঝা যায়। সূর্য আকাশে তার পথ পেরতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়। পকেটঘড়ির ছোট কাঁটা কিন্তু ঘড়ির বৃত্ত পুরো ঘুরে আসতে তার অর্ধেক সময় নেয়, ১২ ঘণ্টা। কিম্বা সূর্যের সমান সময়ে সে দুবার পুরো পাক দেয়। দুপুরে ছোট কাঁটাটা যদি সূর্যের দিকে থেকে থাকে তাহলে কিছু পরে সে সূর্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চাপটাকে দ্বিগুণ বাড়াবে। তাই এই চাপটাকে দ্বিখণ্ডিত করলেই জানতে পারব দুপুরে সূর্য কোথায় ছিল, তার মানে দক্ষিণ দিকটা দেখতে পাব (১৩ নং ছবি)।
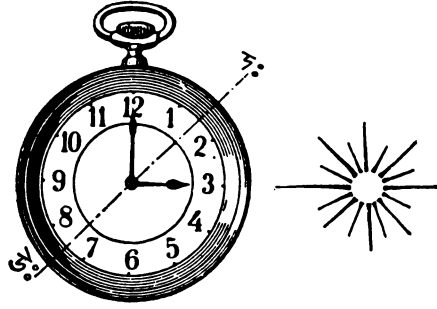
১৩ নং ছবি: পকেটঘড়ি দিয়ে কম্পাসের কাঁটার নির্দেশ জানার একটি সহজ কিন্তু ভুল উপায়।

যাচিয়ে দেখলে জানা যাবে পদ্ধতিটা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য। এককে সময় বহু ডিগ্রীর তফাৎ ঘটে যায়। কেন তা জানার জন্য উক্ত পদ্ধতিটি পরখ করে দেখা যাক। ভুলের প্রধান কারণ হল যে ঘড়ির মুখটা উপর দিকে তুলে ধরে ঘড়িকে অনুভূমিক সমতলের (horizontal plane) সমান্তরালে রাখা হয়। ওদিকে সূর্যের দৈনিক পথ অনুভূমিক সমতলে আসে কেবল মেরুদেশে। অন্য ক্ষেত্রে তার পথ সমতলের কোনাকুনি থাকে, বিষুবরেখায় ৯০° কোণ করেও থাকে। কাজেই ঘড়ি কেবল মেরুদেশের ক্ষেত্রে ঠিক দিকনির্ণয় করতে পারে। অন্য সব জায়গায় অল্পবিস্তর তারতম্য হতে বাধ্য।

১৪ নং ক ছবিটি দেখুন। ধরা যাক যিনি দেখছেন তিনি M বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন। N বিন্দুটি মেরুর নির্দেশ দিচ্ছে। HASNRBQ বৃত্তটি — খ-মধ্যরেখা — দর্শকের মাথার উপর বা সুবিন্দু দিয়ে মেরু হয়ে যাচ্ছে। দর্শকের অক্ষাংশটা সহজেই পাওয়া যেতে পারে। NR দিগন্তের উপরে মেরুর উচ্চতা কোণমাপক দিয়ে মাপলেই দেখা যাবে দর্শকের অক্ষাংশ জায়গাটার অক্ষাংশের সমান। M থেকে Hএর দিকে তাকালে দর্শক দক্ষিণমুখো দাঁড়াবে। সূর্যের দৈনিক পথটা ছবিতে সরলরেখায় দেখান হয়েছে — দিগন্তের উপরের অংশটা হল দিন, নিচেরটা রাত। AQ সরলরেখাটা সূর্যের বিষুবপথ দেখাচ্ছে — সে সময়ে দিন আর রাত্রির পথ সমান থাকে। SB, মানে সূর্যের গ্রীষ্মপথ, হল AQর সমান্তরাল। কিন্তু অধিকাংশই থাকে দিগন্তের ঊর্ধ্বে, নিচে থাকে অত্যন্ত নগণ্য অংশ (গ্রীষ্মের ছোট্ট রাত্রির কথা স্মরণ করুন)। সূর্য প্রতি ঘণ্টায় এই পরিধির ১/২৪ অংশ পার হয় বা $\frac{৩৬০^\circ}{২৪} = ১৫^\circ$। কিন্তু বিকেল তিনটেয় সূর্য ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকবে

না — আমাদের হিসেব অনুযায়ী (১৫° × ৩ = ৪৫°), কিন্তু তাই হওয়াই উচিত ছিল। এই তারতম্যের কারণ হল সূর্যের পথের সমান চাপগুলি অনুভূমিক সমতলের উপর অভিক্ষেপে সমান নয়।

বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ১৪ নং খ ছবিটা দেখুন। এখানে SWNE হল সুবিন্দু থেকে দেখা অনুভূমিক বৃত্ত। SN সরলরেখাটি হল খ-মধ্যরেখা (heavenly meridian)। M হল আমাদের দর্শকের দাঁড়ানর জায়গা। সূর্যের দৈনিক পথের দ্বারা রচিত বৃত্ত যাকে অনুভূমিক সমতলের উপর ফেলা হয়েছে, তার কেন্দ্র হল L′। সূর্যের পথের প্রকৃত বৃত্তটিকে উপবৃত্ত S′B′র আকারে ফেলা হয়েছে।

এখন সূর্যের পথ, SBর প্রতি ঘণ্টার বিভাগগুলি অনুভূমিক সমতলের উপর অভিক্ষেপ করুন। তা করতে হলে দিগন্তের সমান্তরালস্থ SB বৃত্তটিকে ফেরাতে হবে S″B″র অবস্থানে, ১৪ নং ক ছবিতে যেমন আছে। তারপর সেই বৃত্তকে ২৪টি সমান দূর অংশে ভাগ করে বিন্দুগুলোকে অনুভূমিক সমতলে ফেলতে হবে। এখন এই বিভাগের বিন্দুগুলো থেকে SNএর সমান্তরালে এমন কতগুলো রেখা টানতে হবে যা S′B′ উপবৃত্তকে কেটে যায়। মনে আছে বোধহয় এই উপবৃত্তটিই অনুভূমিক সমতলে অভিক্ষিপ্ত সূর্যের পথের বৃত্ত ছিল। পরিষ্কার দেখা যায় এইভাবে প্রাপ্ত চাপগুলি অসমান। আমাদের দর্শকের চোখে এই ফারাক আরো বড় হয়ে দেখা দেবে, কারণ সে তো আর উপবৃত্তের কেন্দ্র L′ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নেই, রয়েছে তা থেকে দূরে M বিন্দুতে।

এখন, আমাদের এই নির্দিষ্ট অক্ষাংশে (৫৩°) গ্রীষ্মকালে ঘড়ি দিয়ে কম্‌পাসের কাঁটার নির্দেশ ঠিক করায় কত ডিগ্রীর ভুল হয় তা দেখা যাক। বছরের ঐ সময়ে সূর্য
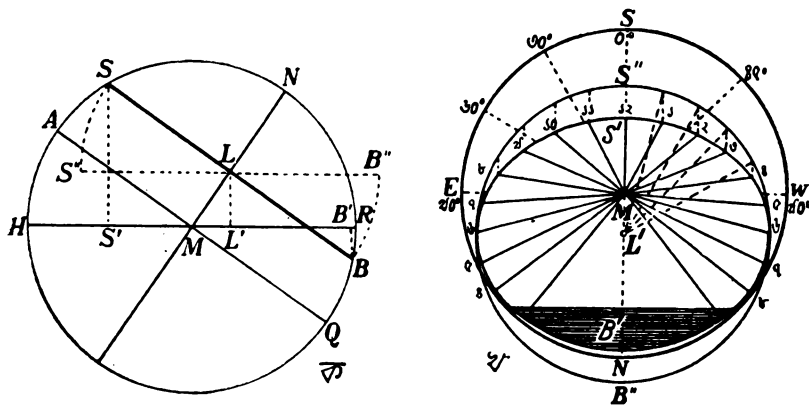
১৪ নং ছবি, ক, খ: পকেটঘড়ি কেন কম্‌পাসের কাজে ভুল করে।

ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে ওঠে (কালো রেখার অংশটায় রাত বোঝাচ্ছে)। পূবে বা E বিন্দুতে (৯০°) সূর্য, আমাদের ঘড়ির নির্দেশ মতো সকাল ৬টায় নয়, আসলে সকাল ৭৷৷৹টায় পৌঁছয়। আরো বলি, দক্ষিণের S বিন্দু থেকে ৬০°তে সূর্য আসবে সকাল ৯৷৷৹টায়, সকাল ৮টায় নয়। দক্ষিণ থেকে ৩০°তে আসবে সকাল ১১টায়, সকাল ১০টায় নয়। SW দক্ষিণ-পশ্চিমে (S বিন্দুর অন্যধারে ৪৫°) সূর্য আসবে বিকেল ৩টেয় নয়, বেলা ১টা ৪০ মিনিটে। পশ্চিমে বা Wতে আসবে বিকেল ৪৷৷৹টেয়, বিকেল ৬টায় নয়।

তাছাড়া আমাদের ঘড়িতে গ্রীষ্মের সময় দেখান হয় — স্থানীয় সৌরকালের সঙ্গে তার মিল নেই — ফলে ভুলটা আরো বড় হয়ে ওঠে।

তাই ঘড়িকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করা হলেও সেটা কিন্তু তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। এই কাজ চালানোয় কম্পাস হিসাবে ঘড়ি সবচেয়ে কম ভুল করবে বিষুবে (equinoxes) (কারণ তখন আমাদের দর্শকের অবস্থান উৎকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে না) আর শীতকালে।

'শ্বেত' রাত্রি আর 'অন্ধকার' দিন

মাঝ এপ্রিল থেকে লেনিনগ্রাদে দেখা দেয় 'শ্বেত' রাত্রি, 'স্বচ্ছ গোধূলি', 'নিশ্চন্দ্র জ্যোৎস্না'। সেই অলৌকিক আলো অনেক কাব্যকল্পনার জন্ম দিয়েছে। লেনিনগ্রাদের 'শ্বেত' রাত্রি সাহিত্যের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে অনেকেই এই বিশেষ ঋতুটি শুধু লেনিনগ্রাদের সম্পত্তি বলে মনে করে। আসলে কিন্তু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা হিসেবে 'শ্বেত' রাত্রি একটা নির্দিষ্ট অক্ষাংশের ঊর্ধ্বে সবখানেই দেখা দেয়।

কবিতা ছেড়ে জ্যোতির্বিদ্যার গদ্যে এসে পৌঁছলে দেখব 'শ্বেত' রাত্রি আসলে প্রদোষ আর উষার একটা মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুশকিন এই ঘটনাকে বলেছেন সকাল আর সন্ধ্যা দুটি গোধূলির মিলন, কথাটা ঠিকই।

রাত্রির অন্ধকারে
না দিবারে
পথ
স্বর্ণিল আকাশে,
একসন্ধ্যা যায় সরে
তারই পরে
দ্রুত
দ্বিতীয় সে আসে…

যে সব অক্ষাংশে সূর্য তার দৈনিক আকাশ পথে দিগন্তের কেবল ১৭½° নিচে নামে, সেখানে সূর্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভোর হয়। রাত্রি আধঘণ্টা বা তারও কম সময় পায়।

স্বভাবতই এ ঘটনায় লেনিনগ্রাদ বা আর কোন জায়গারই একচ্ছত্র অধিকার নেই। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জরীপের ফলে দেখা যাবে 'শ্বেত' রাত্রির অঞ্চলের সীমানা লেনিনগ্রাদের বহু দক্ষিণে।

মস্কোবাসীরাও তাদের 'শ্বেত' রাত্রি উপভোগ করতে পারে — প্রায় মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের শেষ ভাগ পর্যন্ত। লেনিনগ্রাদে মে মাসে যে 'শ্বেত' রাত্রি হয়, মস্কোতে তা সারাটা জুন মাস আর জুলাইয়ের প্রথম দিকে দেখা যায় — অবশ্য লেনিনগ্রাদের মতো অত স্বচ্ছ হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে 'শ্বেত' রাত্রি অঞ্চলের দক্ষিণের সীমা গেছে ৪৯° উঃ অক্ষাংশে (৬৬½ – ১৭½°) পল্‌তাভা দিয়ে। সেখানে বছরে একটি 'শ্বেত' রাত্রি হয় — ২২শে জুন। এই অক্ষাংশের উত্তরের 'শ্বেত' রাত্রিগুলি অনেক স্বচ্ছ আর তাদের সংখ্যাও বেশি। কুইবিশেভ, কাজান, প্‌স্‌কোভ, কিরোভ আর ইয়েনিসেইস্কেও 'শ্বেত' রাত্রি হয়। কিন্তু এই সহরগুলির সবকটাই লেনিনগ্রাদের দক্ষিণে। তাদের 'শ্বেত' রাত্রির সংখ্যা কম (২২শে জুনের আগে পরে) আর তারা অত স্বচ্ছও নয়। অপরপক্ষে পুদোজ'এ তারা লেনিনগ্রাদের চেয়ে স্বচ্ছ। যে দেশে সূর্যাস্ত হয় না তার নিকটবর্তী আর্খানগেলস্কে তারা আরো উজ্জ্বল। স্টকহোমের 'শ্বেত' রাত্রি লেনিনগ্রাদেরই মতো।

সূর্য যখন তার কুবিন্দুতে দিগন্তের নিচে ডুব না দিয়ে শুধু তাকে ছুঁয়ে যায় তখন যে শুধু সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মিলন ঘটে তা নয় — তখন একটানা দিনের আলো থাকে। এ ঘটনা দেখা যায় ৬৫°৪২′এর উত্তরে — যেখানে মধ্যরাতের সূর্যের এলাকা। আরো উত্তরে, ৬৭°২৪′ থেকে আমরা একটানা রাত দেখতে পাই। তখন ভোর আর গোধূলি দুপুরে মিলে যায়, মাঝরাতে নয়। এই হল 'কালো' দিন, 'শ্বেত' রাত্রির প্রতিপক্ষ, যদিও দুজনেই তারা সমান উজ্জ্বল। 'কালো' দিনের দেশ আবার মধ্যরাতের সূর্যের দেশও বটে, কেবল বছরের ভিন্ন সময়ে। জুন মাসে সূর্য যেমন কখনোই ডোবে না*, ডিসেম্বরে তেমনি সূর্য যখন একেবারেই ওঠে না তখন দিনের পর দিন অন্ধকার থাকে।

দিনের আলো আর অন্ধকার

ছেলেবেলা থেকে আমরা যে মনে করে আসছি আমাদের পৃথিবীতে দিন আর রাত বাঁধা ছন্দে বদলে চলে সেটা যে আসলে ব্যাপারটার অতিসরল বর্ণনা তার ভাল প্রমাণ হল 'শ্বেত' রাত্রি। আসলে দিনের আলো আর অন্ধকারের পালা বদল ব্যাপারটার চেহারা

---

* আম্বার্চিক উপসাগরের ঊর্ধ্বে ১৯শে মে থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত সূর্য ডোবে না। তিক্সি উপসাগর অঞ্চলে ১২ই মে থেকে ১লা আগস্ট পর্যন্ত।

নানা রকমের। আমাদের প্রচলিত দিন রাতের ধারণার সঙ্গে তা ঠিক মেলে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীটাকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা চলে। তার প্রতিটিতে আছে দিনের আলো আর অন্ধকারের পালা বদলের নিজস্ব পদ্ধতি।

প্রথম অঞ্চলটি বিষুবরেখা থেকে দুপাশে ৪৯° অক্ষাংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এখানেই, একমাত্র এইখানেই **প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একটি পুরো দিন আর একটি পুরো রাত্রি হয়।**

দ্বিতীয় অঞ্চলটি রয়েছে ৪৯° আর ৬৫½°র মাঝখানে। পল্তাভার উত্তর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবটাই এর মধ্যে পড়ে। এখানে উত্তরায়নান্তের সময়টায় একটানা গোধূলি চলে, এটাই হল **'শ্বেত' রাত্রি অঞ্চল।**

তৃতীয় সংকীর্ণ অঞ্চলটিতে — ৬৫½° থেকে ৬৭½° পর্যন্ত — ২২শে জুনকে মাঝখানে রেখে বহুদিন ধরেই সূর্য ডোবে না। এই হল **মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ।**

৬৭½° আর ৮৩½°র অন্তর্বর্তী চতুর্থ অঞ্চলে জুন মাসে একটানা দিন ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ডিসেম্বরের দীর্ঘ রাত। সে সময়ে দিনের পর দিন সূর্যোদয় ঘটে না। সকাল আর সন্ধ্যার গোধূলি সারা দিন ধরেই থাকে। এই হল **'কালো' দিনের অঞ্চল।**

পঞ্চম এবং শেষ অঞ্চলটি রয়েছে ৮৩½°র উত্তরে। সেখানে দিনের আলো আর অন্ধকারের পালাটা উল্লেখযোগ্য। লেনিনগ্রাদের 'শ্বেত' রাত্রিতে যার সূত্রপাত দিনরাত্রের সে পারম্পর্য এখানে একেবারে খাপছাড়া হয়ে পড়েছে। ২২শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর, উত্তরায়নান্ত আর দক্ষিণায়নান্তের মাঝখানে এই ছ'মাস কালকে সুবিধার জন্য পাঁচটি পর্বে বা ঋতুতে ভাগ করা যায়। প্রথম — একটানা দিন; দ্বিতীয় — দিনের জায়গায় মধ্যরাত্রির গোধূলি কিন্তু সত্যিকার রাত সেখানে নেই (লেনিনগ্রাদের গ্রীষ্মকালীন 'শ্বেত' রাত্রি এরই দুর্বল অনুকরণ); তৃতীয় — সত্যিকার রাত বা দিন ছাড়া একটানা গোধূলি; চতুর্থ — মধ্যরাত্রিকে মাঝখানে রেখে যে প্রকৃত রাত হয় তার সঙ্গে একটানা গোধূলির পালা বদল; পঞ্চম এবং শেষ সারাক্ষণই পুরো অন্ধকার। পরবর্তী ছ'মাসে, ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত, এই পর্বগুলির পারম্পর্য উল্টে যায়।

বিষুবরেখার অপর ধারে, দক্ষিণ গোলার্ধে, এই একই ঘটনা দেখা যায়, অবশ্যই দুই গোলার্ধে ভৌগোলিক অক্ষাংশের পারম্পর্য অনুযায়ী।

'দূর দক্ষিণের' 'শ্বেত' রাত্রির কথা আমরা যদি না শুনে থাকি তার একমাত্র কারণ হল সেখানে মহাসমুদ্রের জলরাশি।

দক্ষিণ গোলার্ধের যে অক্ষাংশের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশ মেলে সেটি মাটির উপর দিয়ে যায়নি। সেখানে জল, শুধু জল। তাই কেবল মেরুনাবিকদের ভাগ্যেই দক্ষিণের 'শ্বেত' রাত্রির সৌন্দর্যগ্রহণের সুযোগ ঘটে।

মেরু সূর্যের ধাঁধা

প্রশ্ন

মেরু আবিষ্কারকরা উচ্চ অক্ষাংশে গ্রীষ্মকালে সূর্যের রশ্মির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। সে রশ্মিতে পৃথিবীর বুক খুব কম তপ্ত হলেও যত খাড়া জিনিসের উপর তার প্রভাব খুবই বেশি।

খাড়া পাহাড় বা বাড়ির দেয়াল বেশ গরম হয়ে ওঠে। বরফের ঢিবি আর কাঠের জাহাজের আলকাতরা দ্রুত গলে যায়। মুখের চামড়া হয়ে ওঠে রোদে পোড়া, এবং আরো কত কী।

এর কারণটা কী?

উত্তর

পদার্থবিদ্যার একটি নিয়ম দিয়ে তার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। সেই নিয়ম অনুযায়ী রশ্মি যত কম বাঁকা হয়ে পড়বে, তার প্রভাবও তত বাড়বে। গ্রীষ্মেও মেরুর অক্ষাংশগুলিতে সূর্য দিগন্তের বেশি উঁচুতে ওঠে না। মেরু বৃত্ত পেরিয়ে তার উচ্চতা সমকোণের অর্ধেকের বেশি হতে পারে না — উচ্চ অক্ষাংশে আরো বেশ কিছুটা কম।

এইখান থেকে সুরু করলে সহজেই দেখান যাবে যে খাড়া জিনিসে সূর্য রশ্মি পড়ে এক সমকোণের অর্ধেকের চেয়ে বড় কোণ তৈরী করে। তার মানে তারা খাড়া জিনিসের উপর খাড়াভাবেই পড়ে।

এই কারণেই মেরু সূর্য ভূপৃষ্ঠকে কম তাপ দিলেও খাড়া জিনিসকে সর্বদা অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তোলে।

ঋতুরা কখন দেখা দেয়?

বরফ পড়ছে, পারা শূন্যের নিচে কিম্বা শীত কম — যাই হোক না কেন, উত্তর গোলার্ধের লোকেরা ২১শে মার্চকেই (কোনো কোনো বছরে — ২২শে) শীতের শেষ আর বসন্তের সুরু বলে ধরে নেয়, তার মানে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুযায়ী। অনেকেই বুঝতে পারে না — ভীষণ শীত বা আরামের উষ্ণতা নির্বিশেষে ঐ বিশেষ দিনটিকেই কেন শীত বসন্তের মধ্যবর্তী সীমানা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

আসল কথা হল জ্যোতির্বিদ্যাগত বসন্তের সুরুর সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়াল আর পরিবর্তনের কোন যোগ নেই। এই গোলার্ধের সর্বত্রই যে বসন্ত একই সময়ে সুরু হয় তাতেই বেশ বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে আবহাওয়ার বদলটা মোটেই প্রধান কথা নয়। পৃথিবীর অর্ধেক অংশের সব জায়গায় কখনো একরকমের আবহাওয়া থাকতে পারে না।

আসলে ঋতু কখন আসে সেটা ঠিক করার কাজে জ্যোতির্বিদরা অনুসরণ করেছেন আবহবিদ্যা নয় জ্যোতির্বিদ্যার চৌহদ্দির ঘটনা, তার মানে মধ্যাহ্ন সূর্যের উচ্চতা আর তার পর থেকে দিনের আলোর স্থায়িত্ব। আবহাওয়াটা আনুষঙ্গিক অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্য দিনের সঙ্গে ২১শে মার্চের তফাৎ এই যে ঐ দিনটিতে আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে যে সীমানাটা রয়েছে সেটা দুটি ভৌগোলিক মেরুকে ছেদ করে। একটা ভূগোলককে আলোর কাছে ধরলেই দেখা যাবে যে আলোকিত এলাকাগুলোর সীমানা মধ্যরেখা ধরে যায়, বিষুবরেখা আর সব সমান্তরাল চক্রকে সমকোণে ভেদ করে। ভূগোলকটাকে ঐভাবেই ধরে রেখে এবার তাকে অক্ষে ঘোরান: তার বুকের প্রতিটি বিন্দু থেকে একটি বৃত্ত দেখা দেবে যার ঠিক আধখানা থাকবে ছায়ায় ঢাকা, বাকি আধখানায় পড়বে আলো। তার মানে বছরের ঠিক ঐ সময়টায় দিন রাত্রি সমান। এই সাম্য উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। এই সময়ে দিন ১২ ঘণ্টা লম্বা বলে সবখানেই স্থানীয় সময় ভোর ছ'টায় সূর্য ওঠে, অস্ত যায় সন্ধ্যা ছ'টায়।

কাজেই ২১শে মার্চের বৈশিষ্ট্য হল — পৃথিবীর সর্বত্রই সেদিন দিন রাত্রি সমান দীর্ঘ। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটিকে বাসন্তী বিষুব বা 'মহাবিষুব' (vernal equinox) বলা হয়। বাসন্তী তার কারণ এটাই একমাত্র বিষুব নয়। ছ'মাস পরে ২৩শে সেপ্টেম্বর আবার সমান দীর্ঘ দিন আর রাত আসে, শারদ বিষুব বা 'জলবিষুব'। তখন গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শরৎ আসে। উত্তর গোলার্ধে যখন বাসন্তী বিষুব দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শারদ বিষুব. তেমনি আবার উল্টোটাও ঘটে। বিষুবরেখার এক ধারে শীত বসন্তকে জায়গা ছেড়ে দেয়, অন্য ধারে গ্রীষ্ম জায়গা দেয় শরৎকে। দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুর সঙ্গে উত্তর গোলার্ধের ঋতু মেলে না।

সারা বছরে দিন রাত্রির তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের কি রকম বদল ঘটে তা এবার দেখা যাক। শারদ বিষুব বা ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে সুরু করে উত্তর গোলার্ধের দিন রাতের চেয়ে ছোট হতে থাকে। পুরো ছ'মাস এরকম চলে — প্রথমে দিন ক্রমশ ছোট হতে থাকে, তারপর ২২শে ডিসেম্বর থেকে আবার বড় হতে থাকে। ২১শে মার্চ দিন রাত্রিকে ধরে ফেলে। তারপর থেকে বছরের বাকি অর্ধেকটা উত্তর গোলার্ধে দিন রাত্রির চেয়ে বড় হয়। ২২শে জুন পর্যন্ত বেড়ে চলে। তারপর ছোট হতে হতে — অবশ্য তখনো রাত্রির চেয়ে বড় থাকে — ২৩শে সেপ্টেম্বর শারদ বিষুবতে পেঁাছে রাত্রির সমান হয়।

এই চারটে তারিখই জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুযায়ী ঋতুর আরম্ভ ও শেষ জানায়। উত্তর গোলার্ধের এই তারিখগুলো নিচে দেওয়া হল:

২১শে মার্চ — দিন রাত্রির সমান হয় — বসন্তের সুরু,
২২শে জুন — সবচেয়ে বড় দিন — গ্রীষ্মের সুরু,
২৩শে সেপ্টেম্বর — দিন রাত্রির সমান হয় — শরতের সুরু,
২২শে ডিসেম্বর — সবচেয়ে ছোট দিন — শীতের সুরু।

বিষুবরেখার নিচে, দক্ষিণ গোলার্ধের বসন্ত আসে আমাদের শরতের সময়ে, শীত আমাদের গ্রীষ্মের, ইত্যাদি।

পাঠকদের উপকারের জন্য এইখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেব। সেগুলো নিয়ে ভাবলে, যা বলা হল তা ভাল করে জেনে মনে রাখার সুবিধা হবে।

(১) আমাদের এই গ্রহের কোনখানে সারা বছরই দিন রাত্রি সমান থাকে?

(২) ২১শে মার্চে স্থানীয় সময় অনুযায়ী ক'টার সময় তাশ্‌খন্দ, তোকিও আর বুয়েনাস আইরেসে সূর্য উঠবে?

(৩) ২৩শে সেপ্টেম্বরে স্থানীয় সময় অনুযায়ী ক'টার সময় নভোসিবির্স্ক, নিউ ইয়র্ক আর উত্তমাশা অন্তরীপে সূর্য ডুববে?

(৪) ২রা আগস্ট আর ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে বিষুবরেখার সব জায়গায় সূর্য ক'টার সময় উঠবে?

(৫) জুলাই মাসে বরফ পড়া বা জানুয়ারীতে গরমের তরঙ্গ কি সম্ভব?*

তিনটি 'যদি'

একেক সময় সাধারণ ব্যাপারটাই অসাধারণের চেয়ে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ইস্কুলে শেখা দশমিক হিসাবের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পারি কেবল তখনই, যখন অন্য কোন পদ্ধতি — ধরা যাক সাত বা বারর হিসাব — প্রয়োগের চেষ্টা করি। ইউক্লিড সহজ হয়ে ওঠে যখন অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে দন্তস্ফুট করি। আমাদের জীবনে মাধ্যাকর্ষণের ভূমিকাটা কী তা ঠিকভাবে বুঝতে হলে তার প্রকৃত স্বরূপকে কল্পনায়

---

* **উত্তর:** (১) বিষুবরেখায় দিন রাত্রি সবসময়ই সমান, কারণ আলো অন্ধকারের মধ্যবর্তী সীমানাটা বিষুবরেখাকেও দুটি সমান ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর অবস্থান নির্বিশেষেই। (২) আর (৩) বিষুবগুলিতে সূর্য পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে ওঠে আর ডোবে, স্থানীয় সময় ভোর ছ'টা আর সন্ধ্যা ছ'টা। (৪) বিষুবরেখায় সূর্য বছরের প্রতিদিনেই ভোর ছ'টায় ওঠে। (৫) দক্ষিণ গোলার্ধে জুলাই মাসে বরফ পড়া আর জানুয়ারীতে ভীষণ গরমের তরঙ্গ সাধারণ ঘটনা।

ভগ্নাংশে কিম্বা তার উল্টোর গুণিতকে পরিণত করতে হবে। সে কায়দা পরে করে দেখব। এখন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর গতির সর্তগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য 'যদি'র কথায় ফিরে যাব।

ইস্কুলে আমাদের মাথায় গজাল মেরে ঢোকান একটি স্বতঃসিদ্ধের কথা এখন নেওয়া যাক। সেটি হল পৃথিবীর অক্ষ পৃথিবীর কক্ষের সঙ্গে ৬৬½° কোণ করে থাকে, বা এক সমকোণের ¾ অংশ। কথাটা বলতে কী বোঝায় তা ভাল করে জানা যাবে কেবল কোণটাকে তিনচতুর্থাংশ নয়, ধরা যাক, একটা পুরো সমকোণ বলে মনে করলে। তার মানে, পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষটা পৃথিবীর কক্ষপথের উপর লম্ব বলে মনে করতে হবে, জুল ভার্নের বৈজ্ঞানিক কল্পোপন্যাস 'উপরটা নিচে' বইটিতে 'কামান ক্লাব'এর সভ্যরা যার স্বপ্ন দেখেছিল। প্রকৃতির চালচলনে এ ঘটনা কী বদল ঘটাবে?

পৃথিবীর অক্ষটা যদি পৃথিবীর কক্ষপথের উপর লম্ব হত

ধরা যাক জুল ভার্নের গোলন্দাজরা তাদের 'পৃথিবীর অক্ষটাকে সোজা' করার কাজে সফল হল। পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের কক্ষপথের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষ সমকোণ করে রইল। এর ফলে প্রকৃতিতে আমরা কী বদল ঘটতে দেখব?

প্রথমেই ধ্রুবতারা — α Ursae Minoris Polaris — আর মেরুর নির্দেশ দেবে না। কারণ পৃথিবীর অক্ষকে টেনে বাড়ালে তা আর ধ্রুবতারার কাছ দিয়ে যাবে না, যাবে আর কোন বিন্দুতে, যাকে কেন্দ্র করে তখন নভমণ্ডল ঘুরবে।

তারপর ঋতুর পরিবর্তন তখন একেবারেই বদলে যাবে, মানে, কোন পরিবর্তনই আর ঘটবে না। ঋতুরা কেন আসে? গ্রীষ্ম কেন শীতের চেয়ে গরম হয়? এই সাধারণ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চলবে না। ইস্কুলে এবিষয়ে একটা আবছা ধারণা আমরা পাই। ইস্কুল ছাড়ার পর আমাদের অধিকাংশই অন্য জিনিসে এত ব্যস্ত থাকি যে ও-ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।

উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্ম গরম। তার প্রথম কারণ হল পৃথিবীর অক্ষ একদিকে হেলান — গ্রীষ্মে অক্ষের উত্তরের প্রান্তটা সূর্যের দিকে বেশি ফেরান থাকে — দিনগুলো হয় বড়, রাত ছোট। রোদে মাটি অনেকক্ষণ ধরে তেতে ওঠে অথচ অন্ধকারের সময়টা কম বলে মাটি তেমন ঠাণ্ডা হবার ফুরসৎ পায় না — তাপের প্রবাহ বাড়ে কিন্তু ভাটায় কমতি পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হল, পৃথিবীর অক্ষ সূর্যের দিকে ঐভাবে হেলে থাকে বলেই সূর্যের দিনের বেলার উচ্চতা খুবই বেশি আর তার রশ্মি পৃথিবীতে পড়ে অনেক সোজাসুজি। তাই গ্রীষ্মে সূর্য **বেশি** আর **প্রবলতর** তাপ দেয় অথচ রাত্রে তা কমে আসার পরিমাণ খুবই

সামান্য। শীতকালে ঠিক উল্টোটা ঘটে। তখন তাপের স্থায়িত্ব যায় কমে, সেইসঙ্গে তার জোরও। রাত্রে ঠাণ্ডা হওয়ার কাজটা চলে খুবই বেশি পরিমাণে।

দক্ষিণ গোলার্ধে এই প্রক্রিয়া ঘটে ছ'মাস পরে, বা যদি বলতে চান তো আগেও বলতে পারেন। বসন্তে আর শরতে দুই মেরু সূর্যের রশ্মির অনুপাতে সমান দূরে থাকে। আলোর চক্র তো প্রায় মধ্যরেখাগুলির সঙ্গে মিলে যায়। দিন কার্যত রাত্রির সমান হয়। আর আবহাওয়াটা থাকে শীত গ্রীষ্মের মাঝামাঝি।

পৃথিবীর অক্ষ যদি তার কক্ষপথে লম্ব হত তাহলে কী ঘটত? এই পরিবর্তন আমরা পেতাম কি? না, কারণ ভূগোলক তখন সূর্যের রশ্মি পেত সারাক্ষণ একই কোণ থেকে। আর তাহলে সারা বছরে আমরা খালি একই বাঁধা ঋতু পেতাম। কোন ঋতু? নাতিশীতোষ্ণ, মেরু অঞ্চলে তাকে আমরা বসন্ত বলতে পারি যদিও শরৎ বললেও কোন দোষ হয় না। সব জায়গায় সবসময়েই তাহলে দিন আর রাত্রি সমান থাকত। এখন মার্চ আর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে যেমন হয়। (বৃহস্পতিতে প্রায় এরকমটাই ঘটে; তার আবর্তনের অক্ষ তার সূর্যপ্রদক্ষিণ কক্ষপথের উপর প্রায় লম্ব।)

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এরকমটা ঘটত। ভীষণ গরমের অঞ্চলে আবহাওয়ার বদলটা
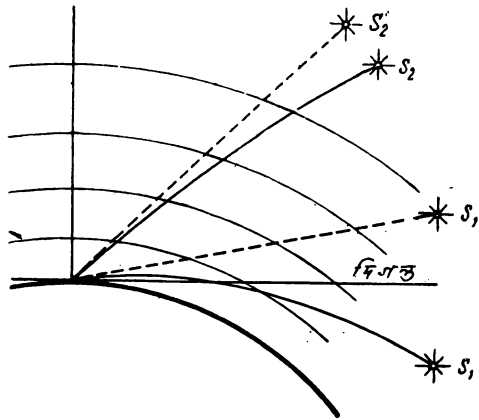
১৫ নং ছবি: বায়ুমণ্ডলীর প্রতিসরণ। S_2 জ্যোতিষ্কের কিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তর দিয়ে যাবার সময় তার প্রতিসরণ ঘটে। তার ফলে দর্শক ভাবে সেটি আসছে আরো উঁচু S_2' বিন্দু থেকে। জ্যোতিষ্ক S_1 দিগন্তের নিচে চলে যাওয়ার পরও প্রতিসরণের ফলে দর্শক তাকে দেখতে পায়।

বিশেষ ধরা পড়ত না। মেরু অঞ্চলে উল্টোটাই ঘটবে। আবহ প্রতিসরণের ফলে সূর্য দিগন্ত থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে আসে (১৫ নং ছবি), তাই এখানে সূর্য ডোবার বদলে দিগন্তে ভাসবে। দিন বা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে ভোর হবে চিরস্থায়ী। এই নিচু সূর্যের রোদের তাপ অবশ্যই কম হবে। কিন্তু বছরের সারাক্ষণ সূর্য থাকবে বলে শীতার্ত মেরুর আবহাওয়া বেশ সুসহ হয়ে উঠবে। কিন্তু ভূগোলকের অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চলের ক্ষতির পূরণ তাতে হবে না।

পৃথিবীর অক্ষ যদি তার কক্ষপথের উপর ৪৫° কোণ করে হেলে থাকত

এবার মনে করা যাক পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষপথের উপর ৪৫° কোণ করে ঝুঁকে আছে। বিষুবকালে (২১শে মার্চ আর ২৩শে সেপ্টেম্বর নাগাদ) দিন তাহলে রাতের সঙ্গে পালাবদল করত, এখন যেমন করে। জুন মাসে কিন্তু সূর্য ৪৫° অক্ষাংশে সুবিন্দুতে পৌঁছত, এখনকার মতো ২৩½°তে নয়। এই অক্ষাংশ তখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় হয়ে যেত। লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশে (৬০°) সূর্য সুবিন্দু থেকে মাত্র ১৫° দূরে থাকত। সেটা সূর্যের একেবারে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উচ্চতা! ভীষণ গরম অঞ্চল তখন শীতে জমাট অঞ্চলের গায়ে গায়ে লেগে থাকত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল তখন কোথাও থাকত না। মস্কো আর খার্কভে জুন মাসটা একটা দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন দিনে পরিণত হত। অপরপক্ষে শীতকালে মস্কো, কিয়েভ, খার্কভ আর পল্‌তাভায় কয়েক সপ্তাহ ধরে চলত একটানা মেরু-অন্ধকার। ভীষণ গরম অঞ্চল এই ঋতুতে হত নাতিশীতোষ্ণ, কারণ মধ্যাহ্ন সূর্য সেখানে ৪৫°র উপরে উঠত না।

স্বভাবতই, ভীষণ গরম আর নাতিশীতোষ্ণ এই দুই অঞ্চলই এরকম বদলের ফলে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হত। মেরু এলাকাগুলো কিন্তু কিছু লাভ পেত। সেখানে অত্যন্ত কঠোর, এখনকার চেয়েও ভীষণ শীতের পর দেখা দিত মাঝামাঝি রকমের গরম গ্রীষ্ম। তখন মেরুতেও মধ্যাহ্ন সূর্য আকাশে ৪৫°তে উঠত আর বছরে ছ'মাসেরও বেশি সময় আলো দিত। সূর্যরশ্মির উপকার পেয়ে উত্তর মেরুর চিরস্থায়ী তুষার অনেকটাই মিলিয়ে যেত।

পৃথিবীর অক্ষ যদি তার কক্ষপথের সমতলে থাকত

আমাদের তৃতীয় কাল্পনিক পরীক্ষা হল পৃথিবীর অক্ষকে তার কক্ষপথের সঙ্গে এক সমতলে বসান (১৬ নং ছবি)। পৃথিবী তাহলে 'যেন শায়িত অবস্থায়' সূর্যের চারদিকে ঘুরত। তার অক্ষাবর্তন হত অনেকটা আমাদের গ্রহ পরিবারের দূরের সদস্য ইউরেনাসের মতো। এ অবস্থায় কী ঘটত?

মেরু অঞ্চলে ছ'মাস ধরে দিন চলত। সে সময়ে সূর্য সর্পিল চক্রে দিগন্ত থেকে সূবিন্দুতে উঠত, তারপর সেই সর্পিল চক্রেই দিগন্তের দিকে নামত। তারপব দেখা দিত ছ'মাসের রাত। দুয়ের মাঝে চলত বহুদিন ধরে একটানা গোধূলি। দিগন্তের নিচে মিলিয়ে
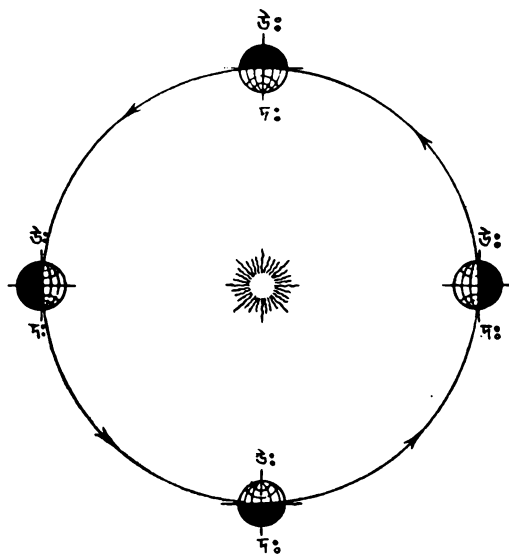
১৬ নং ছবি: পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ যদি তার কক্ষক্ষেত্রে থাকত তাহলে পৃথিবী সূর্যকে পাক দিত এই ভাবে।

যাওয়ার আগে সূর্য বেশ কয়েকদিন ধরে দিগন্তের বুকে ভাসতে ভাসতে আকাশ পাড়ি দিত। এরকমের গ্রীষ্ম শীতকালে সঞ্চিত যত বরফ গলিয়ে দিত।

মধ্যাঞ্চলের অক্ষাংশগুলিতে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে দিন দ্রুত বড় হত। তারপর কিছুকালের জন্য বহুদিন ধরে চলত দিনের আলো। মেরু থেকে যত ডিগ্রীর দূরত্ব মোটামুটিভাবে তত সংখ্যক দিন থেকে সুরু হত এই দীর্ঘ দিনের পালা আর তা চলত অক্ষাংশগুলির ডিগ্রীর দ্বিগুণ সংখ্যক দিন ধরে।

যেমন লেনিনগ্রাদে একটানা দিনের আলো সুরু হত ২১শে মার্চের ৩০ দিন পর আর তা চলত ১২০ দিন ধরে। রাত্রি আসত ২৩শে সেপ্টেম্বরের ৩০ দিন আগে। শীতে ঠিক উল্টোটা ঘটত। একটানা দিনের পর প্রায় সমান দীর্ঘ একটানা রাত আসত। একমাত্র বিষুবরেখায় দিন রাত সবসময় সমান থাকত।

ইউরেনাসের অক্ষ প্রায় উপরোক্ত ভাবেই তার কক্ষপথের দিকে ঝুঁকে থাকে। তার সূর্যপ্রদক্ষিণ কক্ষপথের দিকে সে হেলে আছে মাত্র ৮°। বলা যায় ইউরেনাস সূর্য প্রদক্ষিণ করে যেন **'কাত হয়ে শুয়ে'**।

আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষ হেলে থাকার সম্পর্কটা পাঠক সম্ভবত এই তিনটি 'যদি'র সাহায্যে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন। গ্রীক ভাষায় 'আবহাওয়া' কথাটায় যে **'অবনমন'** বোঝায় তা আকস্মিক নয়।

আরেকটি 'যদি'

এখন আমাদের গ্রহের গতির আরেকটি দিকের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। তার কক্ষপথের চেহারাটা। সব গ্রহের মতোই পৃথিবীও কেপলারের প্রথম বিধিটি মেনে চলে। সে বিধিতে বলে যে প্রতিটি গ্রহ একটা উপবৃত্তিক পথে চলে। সে পথের একটি নাভি বা ফোকাস হল সূর্য।

পৃথিবীর পথের উপবৃত্তটা কি রকমের দেখতে? বৃত্তের সঙ্গে তার কি আকাশ পাতাল ফারাক?

পাঠ্যবই আর প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের রচনায় পৃথিবীর কক্ষপথটাকে প্রায়ই অনেকটা বাড়ান উপবৃত্তের আকারে দেখান হয়। ভুল ভাবে বোঝা এই ছবিটি অনেকের
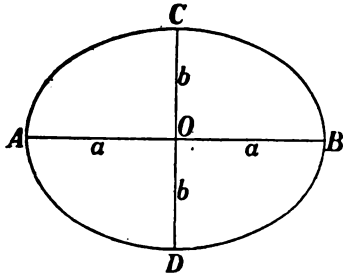
১৭ নং ছবি: একটি উপবৃত্ত আর তার অক্ষগুলি, বড় (AB) আর ছোটো (CD)। O বিন্দু হল তার কেন্দ্র।
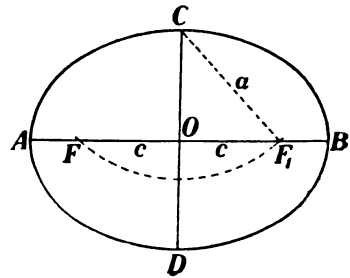
১৮ নং ছবি: উপবৃত্তের নাভি কী করে বের করা হয়।

মনেই চিরজীবনের মতো গাঁথা হয়ে থাকে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস হয় পৃথিবীর কক্ষপথটা হল অনেকটা উপবৃত্ত। আসলের সঙ্গে কিন্তু এ ধারণার কোন মিল নেই। পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য এতই সামান্য যে তাকে বৃত্তের মতো করে আঁকা ছাড়া

আর কোনই উপায় নেই। ধরা যাক এক মিটার ব্যাসের একটি কক্ষপথ আঁকা হয়েছে। তার সঙ্গে বৃত্তের যতটুকু পার্থক্য সেটা একটা রেখার প্রস্থের চেয়েও কম। এমনকি চিত্রকরের তীক্ষ্ম দৃষ্টিও এই উপবৃত্তের সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য ধরতে পারবে না।

উপবৃত্তিক জ্যামিতি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক। ১৭ নং ছবির উপবৃত্তের 'প্রধান অক্ষ' AB, CD হল 'গৌণ অক্ষ'। 'কেন্দ্র' O ছাড়াও প্রতিটি উপবৃত্তের আরো বিশিষ্ট বিন্দু আছে, 'নাভি'। তারা সুষমভাবে কেন্দ্রের দুপাশে প্রধান অক্ষের উপরে বসান। নাভিগুলি পাওয়া যায় এই ভাবে (১৮ নং ছবি): কম্পাসের দুটি পা'কে প্রধান OB অক্ষার্ধের সমান করে মেপে নেওয়া হল। একটা পা রইল C'তে, গৌণ অক্ষের শেষ প্রান্তে। অন্যটা দিয়ে প্রধান অক্ষকে কেটে যাওয়া একটি চাপ আঁকা হল। কাটার বিন্দুদুটি, F ও F_1 হল উপবৃত্তের নাভি। OF আর OF_1'এর সমান দূরত্বকে বলা যাক c, প্রধান ও গৌণ অক্ষদুটিকে ২a আর ২b। প্রধান সম-অক্ষের a দৈর্ঘ্য থেকে মাপা হয়েছে c দৈর্ঘ্যটিকে। c/a ভগ্নাংশটি হল উপবৃত্তের দীর্ঘায়নের মাপ। তাকে বলা হয় 'উৎকেন্দ্রিকতা'। উপবৃত্ত আর বৃত্তের পার্থক্য যত বেশি হবে উৎকেন্দ্রিকতাও ততই বাড়বে।

এই উৎকেন্দ্রিকতার গুণটা জানতে পারলেই পৃথিবীর কক্ষপথের আকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারব। কক্ষপথের গুণ নির্ধারণ না করেও তা পারা যায়। সূর্য কক্ষপথের একটি নাভিতে থাকার সময় পৃথিবীতে আমাদের মনে হয় তার আকার যেন বদলে গেছে। তার কারণ হল নাভিতে কক্ষপথের বিন্দুগুলোর বিভিন্ন দূরত্ব। একেক সময় সূর্যের দৃশ্য মাত্রা বেড়ে যায়, একেক সময় কমে যায়। হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাত পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্বের অনুপাতের সঙ্গে একেবারে এক। ধরা যাক সূর্য আমাদের উপবৃত্তের F_1 নাভিতে রয়েছে (১৮ নং ছবি)। ১লা জুলাই পৃথিবী থাকবে তার কক্ষপথের A বিন্দুতে। তখন আমরা সূর্যের সর্বক্ষুদ্র চক্র দেখতে পাব, তার কৌণিক গুণ হবে ৩১'২৮"। পৃথিবী ১লা জানুয়ারীর কাছাকাছি B বিন্দুতে পৌঁছবে। তখন সূর্যের চক্র আপাতভাবে তার সবচেয়ে বড় কোণে থাকবে — ৩২'৩২"। এখন এই অনুপাতটা নেওয়া যাক:

$$\frac{৩১'২৮''}{৩২'৩২''} = \frac{BF_1}{AF_1} = \frac{a-c}{a+c},$$

এর থেকে তথাকথিত উদ্ভূত অনুপাত পাওয়া যেতে পারে:

$$\frac{a-c-(a+c)}{a+c+(a-c)} = \frac{৩১'২৮''-৩২'৩২''}{৩২'৩২''+৩১'২৮''}$$

বা:

$$\frac{৬৪''}{৬৪'} = \frac{c}{a}।$$

তার মানে: $\frac{c}{a} = \frac{১}{৬০} = ০\cdot০১৭$, অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·০১৭। পৃথিবীর কক্ষপথের আকার নির্ধারণের জন্য তাই কেবল ভাল করে সূর্যের দৃশ্য চক্রটার মাপ নেওয়া প্রয়োজন।

এখন প্রমাণ করা যাক যে পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য খুবই সামান্য। একটা বিরাট ছবি কল্পনা করা যাক। তাতে কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধ হল এক মিটার। সেক্ষেত্রে অন্যটার, মানে উপবৃত্তের গৌণ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত হবে? OCF_1 এই সমকোণ ত্রিভুজ থেকে (১৮ নং ছবি) আমরা পাই

$$c^২ = a^২ - b^২, \qquad \text{বা} \qquad \frac{c^২}{a^২} = \frac{a^২ - b^২}{a^২}।$$

কিন্তু $\frac{c}{a}$ হল পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা, তার মানে, ১/৬০। বীজগণিতের $a^২ - b^২$ কথাটির বদলে নেব $(a-b)(a+b)$ আর $(a+b)$র বদলে ২a, কারণ bর সঙ্গে aর পার্থক্য খুবই সামান্য।

তার ফলে পাওয়া গেল

$$\frac{১}{৬০^২} = \frac{২a(a-b)}{a^২} = \frac{২(a-b)}{a}$$

সুতরাং $a - b = \frac{a}{২ \times ৬০^২} = \frac{১,০০০}{৭,২০০}$, অর্থাৎ, $\frac{১}{৭}$ মিলিমিটারের কম।

দেখা গেল এমন বিরাট আকারেও পৃথিবীর কক্ষপথের প্রধান ও গৌণ সম-অক্ষের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ১/৭ মিঃমিঃর চেয়ে বেশি না — তার মানে, সরু পেন্‌সিলে টানা রেখার চেয়েও তা কম। কাজেই পৃথিবীর কক্ষপথটা বৃত্তের আকারে আঁকলে বিশেষ কিছু ভুল হবে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় সূর্যের স্থান কোথায়? তাকে যদি কক্ষপথের নাভিতে বসাতে হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে সে কতটা দূরে থাকবে? তার মানে, আমাদের কল্পিত ছবিতে OF আর OF_1'এর দৈর্ঘ্য কত? হিসেবটা খুবই সহজ:

$$\frac{c}{a} = \frac{১}{৬০}, \qquad c = \frac{a}{৬০} = \frac{১০০}{৬০} = ১\cdot৭ \text{ সেঃমিঃ।}$$

আমাদের ছবিতে সূর্যের কেন্দ্র কক্ষপথের কেন্দ্র থেকে ১·৭ সেঃমিঃ তফাতে থাকবে। কিন্তু সূর্যকেই ১ সেঃমিঃ ব্যাসের বৃত্ত দিয়ে দেখান হবে বলে সূর্য যে বৃত্তের কেন্দ্রে নেই সেটা একমাত্র শিল্পীর বিচক্ষণ চোখ ছাড়া আর কারো চোখে এটা ধরা পড়বে না।

কার্যকরী সিদ্ধান্ত হল পৃথিবীর কক্ষপথকে আমরা বৃত্ত হিসেবেই দেখাতে পারি, সূর্যকে কেন্দ্রের একটু একপাশে বসাতে হবে।

সূর্যের এই নগণ্য অপ্রতিসম অবস্থান কি পৃথিবীর আবহাওয়ায় কোন প্রভাব ফেলতে পারে? তার সম্ভাব্য প্রভাব বের করার জন্য আরেকটা কাল্পনিক পরীক্ষা, আবার সেই 'যদি'র খেলা চালাতে চাই। ধরা যাক পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা হল আরো বেশি, যেমন ০·৫। এ অবস্থায় উপবৃত্তের নাভি সম-অক্ষটাকে অর্ধেক করে ভাগ করবে। এই উপবৃত্তটাকে দেখাবে প্রায় ডিমের মতো। সৌরমণ্ডলের আর কোন বড় গ্রহের এরকম উৎকেন্দ্রিকতা নেই। প্লুটোর কক্ষপথই হল সবচেয়ে লম্বাটে। তার উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·২৫। (গ্রহাণুপুঞ্জ আর ধূমকেতু অবশ্য আরো বড় উপবৃত্তে চলে।)

পৃথিবীর পথটা যদি আরো লম্বাটে হত

মনে করা যাক পৃথিবীর কক্ষপথটা বেশ লম্বাটে হল। তার প্রধান অক্ষার্ধকে নাভি দুই সমভাগে ভাগ করল। ১৯ নং ছবিতে কক্ষপথ দেওয়া হল। পৃথিবী তাতে A বিন্দুতে সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসবে ১লা জানুয়ারী। *B* বিন্দুতে সূর্যের সবচেয়ে দূরে যাবে ১লা জুলাইয়ে। এখন FB FAএর তিনগুণ বলে সূর্য জুলাইয়ের চেয়ে জানুয়ারীতেই আমাদের তিনগুণ কাছে আসছে। জানুয়ারীতে সূর্যের ব্যাস জুলাইয়ের ব্যাসের তিনগুণ।
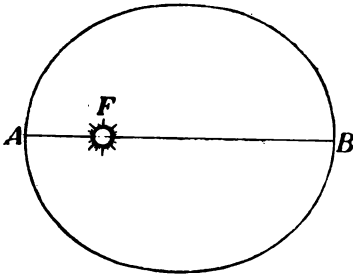
১৯ নং ছবি: পৃথিবীর উৎকেন্দ্রিকতা ০·৫ হলে পৃথিবীর কক্ষপথের আকার হত এরকমের। সূর্য রয়েছে F নাভিতে।
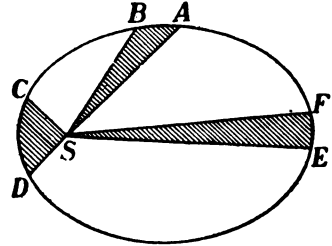
২০ নং ছবি: কেপলারের দ্বিতীয় বিধির নিদর্শন: গ্রহ যদি AB, CD, EE চাপগুলি ধরে সমান সময়ে যাত্রা করে তাহলে কালো জায়গাগুলোর আয়তন হবে সমান।

জানুয়ারীতে সে জুলাইয়ের চেয়ে ন'গুণ বেশি তাপ দেবে (বর্গ দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে)। আমাদের উত্তরের শীতের তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে? একমাত্র সূর্য তখন আকাশের গায়ে নিচে নেমে আসবে, দিন হবে ছোট, রাত বড়। কিন্তু শীতের আবহাওয়া কিছু থাকবে না — সূর্যের নৈকট্য দিনের আলোর কমতির ক্ষতি পূরণ করবে।

এর সঙ্গে আরেকটা ঘটনা যোগ করতে হবে। সেটার মূল হল কেপলারের দ্বিতীয় বিধি — সমান ক্ষেত্র পেরতে ব্যাসার্ধ-ভেক্টরের সমান সময় লাগে।

কক্ষপথের 'ব্যাসার্ধ-ভেক্টর' বলতে বোঝায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহের অর্থাৎ এক্ষেত্রে পৃথিবীর যোগ ঘটায় যে সরল রেখাটি সেটি। পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘোরে আর সেই সঙ্গে তার ব্যাসার্ধ-ভেক্টরটি এক একটা বিশেষ ক্ষেত্র পার হতে থাকে। কেপলারের বিধি অনুযায়ী জানি যে একটা উপবৃত্ত ক্ষেত্রের যে অংশগুলিকে সমান সময়ে পার হওয়া যায়, সে অংশগুলি নিজেরাও সমান। সূর্যের কাছাকাছি থাকার সময় পৃথিবী যে বেগে ঘোরে তা দূরের বিন্দুতে থাকার সময়কার বেগের চেয়ে দ্রুততর, তা না হলে হ্রস্বতর ব্যাসার্ধ-ভেক্টর যে ক্ষেত্র পার হচ্ছে তা, দীর্ঘতর ব্যাসার্ধ-ভেক্টর যে ক্ষেত্র পার হল, তার সমান হতে পারে না (২০ নং ছবি)।

এই ব্যাপারকে আমাদের কাল্পনিক কক্ষপথের বেলায় প্রয়োগ করে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ডিসেম্বর আর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পৃথিবী যখন সূর্যের অনেক কাছে থাকে তখন সে, তার কক্ষপথে জুন থেকে আগস্ট মাসে যে বেগে ঘোরে, তার চেয়ে অনেক দ্রুতবেগে ঘুরবে। তার মানে, উত্তরের শীত থাকবে অল্পকাল। অপরপক্ষে গ্রীষ্ম কিন্তু সূর্যের তাপ বিকিরণের কৃপণতার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই যেন হবে দীর্ঘ।

২১ নং ছবিটি আমাদের কাল্পনিক অবস্থায় ঋতুগুলির কালপরিমাণের আরো সঠিক চিত্র দেবে। এই উপবৃত্তটি হল পৃথিবীর নতুন কক্ষপথ যার উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·৫। ১—১২ এই সংখ্যাগুলো পৃথিবীর পথকে নানা ভাগে ভাগ করেছে। পৃথিবী তাদের সমান সময়ে পার হয়ে যায়। কেপলারের বিধি অনুযায়ী ব্যাসার্ধ-ভেক্টর উপবৃত্ত ক্ষেত্রকে এই যে সব অংশে ভাগ করেছে তাদের আয়তন সমান। পৃথিবী ১ বিন্দুতে পৌঁছবে ১লা জানুয়ারীতে। ২'এ ১লা ফেব্রুয়ারী, ৩'এ ১লা মার্চ ইত্যাদি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এই কক্ষপথে বাসন্তী বিষুব (A) সুরু হওয়া উচিত ফেব্রুয়ারীর গোড়ায়, শারদ বিষুব (B) নভেম্বরের শেষে। কাজেই উত্তর গোলার্ধে শীত দুমাসের একটু বেশি থাকবে, নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারীর গোড়া পর্যন্ত। অপরপক্ষে, বড় দিন আর উচ্চ মধ্যাহ্ন সূর্যের ঋতু থাকবে ৯½ মাসেরও বেশি — বাসন্তী থেকে শারদ বিষুব পর্যন্ত।
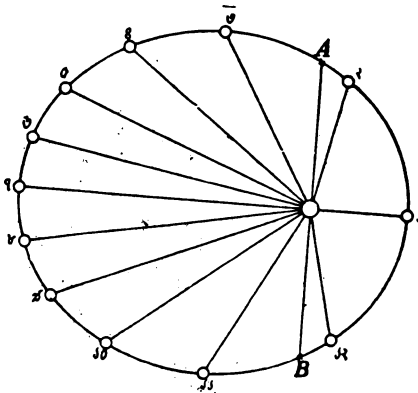
২১ নং ছবি: পৃথিবীর কক্ষপথ যদি খুবই বর্ধিত উপবৃত্ত হত তাহলে পৃথিবী এই ভাবে সূর্যকে পাক দিত। (প্রতিটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পৃথিবী পার হয় সমান সময়ে — এক মাসে।)

দক্ষিণ গোলার্ধে উল্টোটা ঘটবে। সূর্য আকাশের অনেক নিচে নেমে আসবে, দিন হবে ছোট — পৃথিবী তখন আহ্নিক সূর্যের দূরে থাকবে আর সূর্যের তাপ ৯ গুণ কমে যাবে। তেমনি আবার সূর্যের অনেক উচ্চতা আর বড় দিনের পালা সুরুর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপ ৯ গুণ বাড়বে। এখানকার শীত উত্তরের চেয়ে অনেক কঠোর আর দীর্ঘ হবে। অপরপক্ষে, গ্রীষ্ম ছোট হলেও গরম অসহ্য হবে।

আমাদের এই 'যদি'র আরেকটি ফল। জানুয়ারীতে পৃথিবীর জোরাল অক্ষগতি মধ্য আর প্রকৃত দুপুরের সময় অনেকটা বদলে দেবে — ঘটবে কয়েক ঘণ্টার পার্থক্য। এখন আমরা যে মধ্য সৌরকাল মেনে চলি তাকে তখনও অনুসরণ করলে খুবই অসুবিধা হবে।

এখন পৃথিবীর কক্ষপথে সূর্যের উৎকেন্দ্রিক অবস্থানের ফল সম্বন্ধে একটা ধারণা হল। প্রথম, উত্তর গোলার্ধের শীত হয় ছোট আর মৃদু আর গ্রীষ্ম দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে দীর্ঘ। সত্যিই কি তাই? নিঃসন্দেহে। জানুয়ারীতে পৃথিবী জুলাই মাসের তুলনায় সূর্যের $২ \times ১/৬০$, তার মানে $১/৩০$ ভাগ বেশি কাছে আসে। সুতরাং প্রাপ্ত তাপের পরিমাণ বাড়ে $\left(\frac{৬১}{৫৯}\right)^{২}$ গুণ, তার মানে ৬%। তার ফলে উত্তরের শীত কিছুটা কমে। তাছাড়া উত্তরের শরৎ আর শীত দুই মিলে দক্ষিণের ঋতুদুটির চেয়ে প্রায় আট দিন ছোট। তেমনি উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্ম আর বসন্ত দুই মিলে দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে আট দিন বড়। সেইজন্যই বোধহয় দক্ষিণ মেরুতে বেশি বরফ। নিচের তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুগুলির ঠিক দৈর্ঘ্যের তালিকা পাওয়া যাবে:

উত্তর গোলার্ধ	দৈর্ঘ্য	দক্ষিণ গোলার্ধ
বসন্ত	৯২ দিন ১৯ ঘণ্টা	শরৎ
গ্রীষ্ম	৯৩ " ১৫ "	শীত
শরৎ	৮৯ " ১৯ "	বসন্ত
শীত	৮৯ " ০ "	গ্রীষ্ম

দেখাই যাচ্ছে উত্তরের গ্রীষ্ম শীতের চেয়ে ৪·৬ দিন বড়, বসন্ত শরতের চেয়ে ৩·০ দিন বড়।

উত্তর গোলার্ধের এই সুবিধা চিরকাল বজায় থাকবে না। পৃথিবীর কক্ষপথের প্রধান অক্ষ শূন্যে ক্রমশই জায়গা বদল করছে। তার ফলে কক্ষপথে সূর্যের সবচেয়ে

কাছের আর দূরের বিন্দুগুলো অন্যত্র সরে যাচ্ছে। এই গতি ২১,০০০ বছরে একটি পুরো চক্র সম্পূর্ণ করে। হিসেব করে দেখা গেছে উপরে উত্তর গোলার্ধের যে সুবিধার কথা বলা হল দক্ষিণ গোলার্ধ সে সবই পাবে ১০৭০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি।

পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতাও স্থির নয়। যুগ যুগ ধরে তা ধীরে ধীরে বাড়ে কমে প্রায় শূন্য (০·০০৩) থেকে (এসময়ে কক্ষপথটা হয় বৃত্তাকার) ০·০৭৭ পর্যন্ত (এসময়ে কক্ষপথ সবচেয়ে দীর্ঘায়িত, মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের মতো দেখতে হয়)। এখন তার উৎকেন্দ্রিকতা কমতির দিকে। আরো ২৪ হাজার বছর ধরে তা ০·০০৩'এ কমে আসবে। তারপর উল্টোটা ঘটবে পরের ৪০ হাজার বছরে। এই পরিবর্তন এতই মন্থর যে তার গুরুত্ব নিছক তত্ত্বের ব্যাপার।

কখন আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি, দুপুরে না সন্ধ্যায়?

পৃথিবী যদি সূর্যকে কেন্দ্র করে পুরোপুরি বৃত্তাকার কক্ষে চলত তাহলে এ প্রশ্নের জবাবটা হত খুবই সোজা। তাহলে দুপুরেই আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসতাম। তখন পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠের সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলো সূর্যের দিকেই মুখ করে
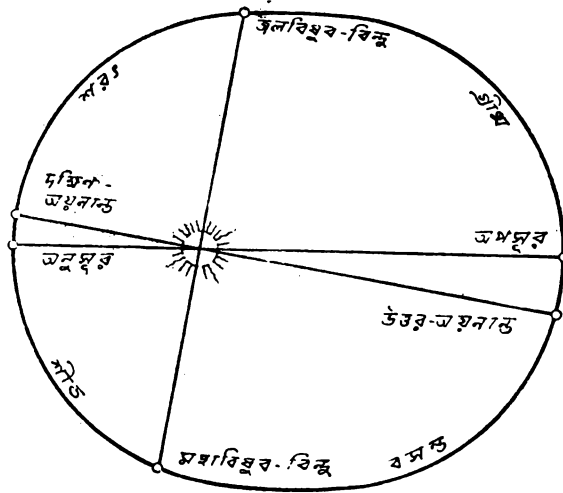
২২ নং ছবি: সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পথের ছবি।

থাকত। বিষুবরেখার বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে, সূর্যসন্নিধানের বৃহত্তম দৈর্ঘ্য হত ৬,৪০০ কিঃমিটার, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যও তাই।

কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথটা হল উপবৃত্ত, সূর্য তার নাভি (২২ নং ছবি)। তার ফলে পৃথিবী একসময় সূর্যের কাছে আসে, একসময় দূরে চলে যায়। ১লা জানুয়ারী থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। বাকি ছ'মাসে সূর্যের কাছে আসে। সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে ২×১/৬০×১৫,০০,০০,০০০, পার্থক্য তার মানে ৫০,০০,০০০ কিঃমিটারের।

সূর্য থেকে এই দূরত্ব বাড়ে কমে দিনে গড়ে ২৮,০০০ কিঃমিটারের মতো। তার ফলে দুপুর আর সূর্যাস্তের মধ্যে (দিনের একচতুর্থাংশ) আহ্নিক সূর্য থেকে দূরত্ব বদলায় গড়ে ৭,৫০০ কিঃমিটার। তার মানে, পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের চেয়ে বেশি।

সুতরাং, প্রশ্নের জবাবটা হল: আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি জানুয়ারী থেকে জুলাইয়ের মধ্যে — দুপুরে, জুলাই আর জানুয়ারীর মধ্যে — সন্ধ্যা বেলায়।

একটা মিটার যোগ করুন

প্রশ্ন

পৃথিবী সূর্যকে ১৫,০০,০০,০০০ কিঃমিটার দূর থেকে পাক দেয়। এর সঙ্গে যদি আরো এক মিটার যোগ করি তো কী হয়। তাহলে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের পথটা কত বড় হবে, বছরই বা হবে কত দীর্ঘ, — অবশ্য যদি পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের গতির জোর সমান থাকে (২৩ নং ছবি দ্রঃ)?

উত্তর

এক মিটার এমন একটা কিছু দূর নয়। কিন্তু পৃথিবীর বিরাট কক্ষপথের কথা ভেবে মনে হতে পারে যে এই তুচ্ছ দূরত্বটুকু যোগ করার ফলে বুঝি কক্ষপথের দৈর্ঘ্য আর তার ফলে বছরের কালপরিমাণ বেশ বেড়ে যাবে।

কিন্তু আঁকজোক কষে যে ফল পাওয়া যায় তা এতই সামান্য যে হিসেবটাকেই ভুল বলে ধরে নিতে ইচ্ছে হয়। তবে ব্যাপারটায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই: পার্থক্যটা সত্যিই অতি সামান্য। দুটি এককেন্দ্রীয় পরিধির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য তাদের ব্যাসার্ধদুটির উপর নির্ভর করে না, করে তাদের **ব্যবধানের** উপর। মেঝের উপর আঁকা দুটো পরিধির বেলাতে যে ফল পাওয়া যাবে মহাকাশের দুটি পরিধির ক্ষেত্রেও একেবারে সমান ফল পাওয়া যাবে — অবশ্য যদি দুক্ষেত্রেই ব্যাসার্ধগুলির দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয় এক মিটার। হিসেব করে দেখলেই তা বোঝা যাবে। পৃথিবীর কক্ষপথের (বৃত্ত বলেই ধরে নেওয়া

হচ্ছে) ব্যাসার্ধ যদি হয় R মিটার, তার দৈর্ঘ্য তাহলে হবে $২\pi R$ । ব্যাসার্ধটাকে যদি ১ মিটার বাড়াই, তাহলে নতুন কক্ষপথের দৈর্ঘ্য হবে

$$২\pi(R + ১) = ২\pi R + ২\pi ।$$

কাজেই কক্ষপথ বাড়ল কেবল ২π , তার মানে ৬·২৮ মিটার। আর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের উপর তা নির্ভরশীল নয়।
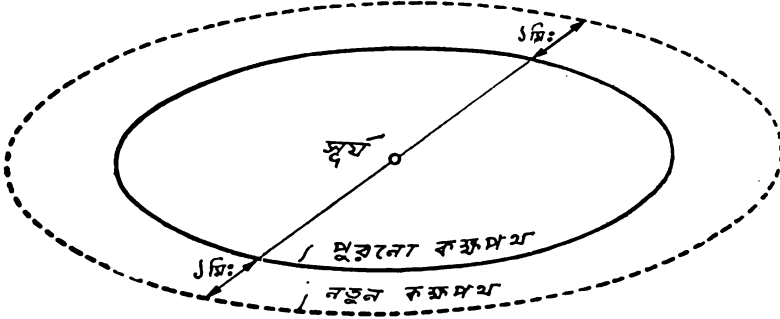
২৩ নং ছবি: সূর্য থেকে পৃথিবী আর এক মিটার দূরে থাকলে তার কক্ষপথ আরো কত দীর্ঘ হত? (বইয়ে উত্তর পাবেন)।

সুতরাং পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের পথটাকে আরো ১ মিটার সরিয়ে দিলে তার দৈর্ঘ্য কেবল ৬¼ মিটার বাড়বে। বছরের দৈর্ঘ্যের উপর তার প্রভাব কার্যত হবে শূন্য, কারণ পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের বেগ হল সেকেণ্ডে ৩০,০০০ মিটার। বছর তখন কেবল এক সেকেণ্ডের ৫,০০০ ভাগের ১ ভাগ বাড়বে। বলাই বাহুল্য সেটা আমরা খেয়াল করতেও পারব না।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

হাত থেকে যাই ফেলি না কেন দেখতে পাই জিনিসটা উল্লম্বভাবে পড়ে। কেউ যদি সেটাকে সরল রেখায় পড়তে না দেখে, তবে নিশ্চয় অন্যদের খুব অদ্ভুত লাগবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর গতিতে বাঁধা পড়েনি এমন কারো পক্ষে ঐটেই সত্য।

মনে করা যাক ঐরকম দর্শকের চোখ দিয়েই আমরা একটা কিছু পড়তে দেখছি। ২৪ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা ভারী বল ৫০০ মিটার উঁচু থেকে স্বাধীনভাবে নিচে পড়ছে। পড়তে পড়তে সে স্বভাবতই পৃথিবীর সবরকম গতির ভাগ নেয়। এই বাড়তি গতি আর পড়ন্ত জিনিসটার অনেক দ্রুততর গতি যে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না তার
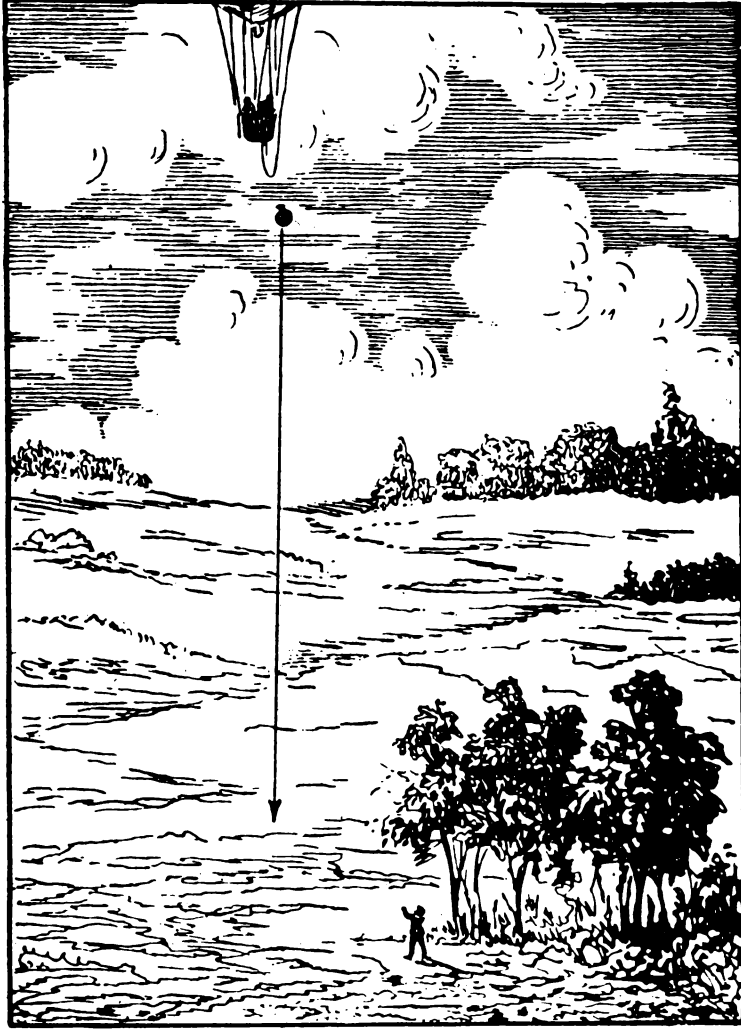
২৪ নং ছবি: একটি জিনিস অবাধে পড়লে পৃথিবীর সবাই তাকে সরল রেখায় পড়তে দেখবে।

একমাত্র কারণ হল আমরাও ঐ সব গতিতে আবদ্ধ। আমাদের গ্রহের কোন একটা গতি থেকে আমরা যদি নিজেদের আলাদা করে নিতে পারতাম তাহলে দেখতাম ঐ একই জিনিস উল্লম্বভাবে নয়, অন্য পথে পড়ছে।

ধরা যাক আমরা ঐ জিনিসটাকে পড়তে দেখছি পৃথিবীর বুকে নয়, চাঁদের বুকে
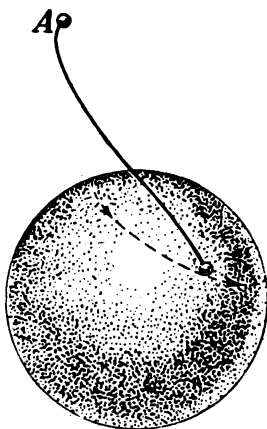
২৫ নং ছবি: চাঁদের মানুষ সেটিকেই পড়তে দেখবে বাঁক রেখায়।
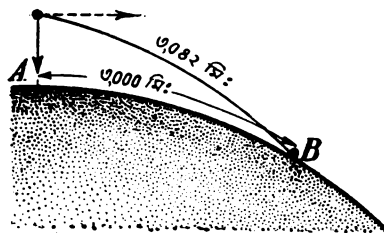
২৬ নং ছবি: পৃথিবীতে যে জিনিস অবাধে পড়ছে তা সেই সঙ্গেই একটি বৃত্তপথের স্পর্শকেও নড়ছে, অক্ষাবর্তনের ফলে পৃথিবীর বুকের বিন্দুগুলি সেই বৃত্তপথে চলে।

দাঁড়িয়ে। সূর্যপ্রদক্ষিণ আবর্তনে পৃথিবীর সঙ্গী চাঁদ। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের সঙ্গে চাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই চাঁদ থেকে আমরা জিনিসটার দুটো গতি দেখতে পাব: একটা নিচের দিকে উল্লম্বভাবে, আরেকটা পৃথিবীর বুক থেকে পূব ঘেঁষা স্পর্শকের পথে — ঐ দ্বিতীয়টা আমরা আগে দেখিনি। দুটো সমসাময়িক গতি অবশ্যই বলবিদ্যার নিয়মের অনুবর্তী। একটা সোজা আর অন্যটা বাঁকা বলে যে গতি দেখা দেয় সেটা চলে বক্র পথে। এই বক্রতা ২৫ নং ছবিতে দেখান হয়েছে, চাঁদের বুক থেকে একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে একটা জিনিসকে যে ভাবে পড়তে দেখবে তা এই।

আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কল্পনায় সূর্য থেকে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে এই ভারী বলটাকে পৃথিবীতে পড়তে দেখা যাক। সূর্যে আমরা পৃথিবীর অক্ষাবর্তন আর কক্ষাবর্তনের আওতার বাইরে থাকব। কাজেই একই সঙ্গে পড়ন্ত জিনিসটার তিনটি গতি দেখতে পাব (২৬ নং ছবি):

(১) পৃথিবীর বুকের দিকে উল্লম্বভাবে পড়া;

(২) পৃথিবীর বুক থেকে পূব ঘেঁষে স্পর্শকের পথে পড়া;

(৩) সূর্যপ্রদক্ষিণের গতি।

১ নং গতিটা ০·৫ কিঃমিটার পার হল। ২ নং গতিটা, জিনিসটার নিচে পড়ার ১০ সেকেণ্ডে, হবে ০·৩×১০=৩ কিঃমিটার (মস্কোর অক্ষাংশে)। তৃতীয় এবং দ্রুততম গতি হল সেকেণ্ডে ৩০ কিঃমিটার। তার মানে নিচে পড়ার ১০ সেকেণ্ডে জিনিসটা পৃথিবীর কক্ষপথ ধরে ৩০০ কিঃমিটার পার হবে। এই এতখানি পাড়ির তুলনায়
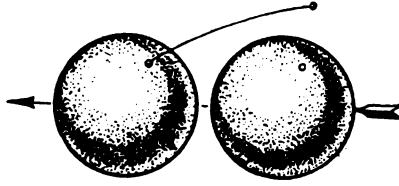
২৭ নং ছবি: সূর্য থেকে ২৪ নং ছবির জিনিসটিকে কী ভাবে পড়তে দেখা যাবে (মান মানা হয়নি)।

অন্যগুলি — ০·৫ কিঃমিটার নিচে আর স্পর্শক পথে ৩ কিঃমিটার — প্রায় ধরাই পড়বে না। সূর্যে আমাদের দেখার জায়গা থেকে প্রধান যাত্রাটাই কেবল চোখে পড়বে। কী দেখব? ২৭ নং ছবিতে যা দেখি (যথাযথ মান এখানে মানা হয়নি) প্রায় তাই। পৃথিবী বাঁয়ে সরে যাচ্ছে অথচ জিনিসটা ডান দিকে দেখানো পৃথিবীর ওপরকার একটা জায়গা থেকে পড়ছে বাঁ দিকে দেখানো পৃথিবীর জায়গারই পাল্টা বিন্দুতে (অল্প একটু নিচে)। আগেই বলেছি প্রকৃত মান এখানে মানা হয়নি — ১০ সেকেণ্ডে পৃথিবীর কেন্দ্র সরবে ১৪,০০০ কিঃমিটার নয় — আমাদের শিল্পী পরিষ্কার করে দেখানর জন্য তাই এঁকেছেন — মাত্র ৩০০ কিঃমিটার।

এবার আরেক পা এগিয়ে গিয়ে কল্পনায় চলে যাব কোন এক তারায় অর্থাৎ এমন এক দূরের সূর্যে যা আমাদের সূর্যের গতিরও বাইরে। সেখান থেকে পড়ন্ত জিনিসটার এই তিনটি গতি ছাড়াও একটি চতুর্থ গতি দেখতে পাব। সেই চতুর্থ গতিটির পরিমাণ আর দিক নির্ভর করছে কোন তারাটি থেকে দেখছি তার উপর, তার মানে, সেই তারাটির দিক থেকে সমগ্র সৌরমণ্ডলের গতির উপর।

ধরা যাক, সৌরমণ্ডল নির্দিষ্ট তারাটির দিক থেকে পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে আছে, তার বেগ সেকেণ্ডে ১০০ কিঃমিটার; (এরকমের বেগ তারাদের

হয়)। এই অবস্থাটা দেখান হয়েছে ২৮ নং ছবিতে। ১০ সেকেন্ডে এই গতি পড়ন্ত জিনিসটাকে ১,০০০ কিঃমিটার সরিয়ে দেবে আর স্বভাবতই তার যাত্রাকে জটিল করে তুলবে। অন্য তারা থেকে দেখলে এই পতন হবে বিভিন্ন গুণের আর অন্যমুখী।

আরো এগিয়ে গিয়ে ছায়াপথের বাইরের একজন দর্শক, যে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশের নক্ষত্রমণ্ডলীয় দ্রুত গতির সঙ্গে জড়িত নয়, সে পড়ন্ত জিনিসটার পৃথিবীমুখী যাত্রাটা
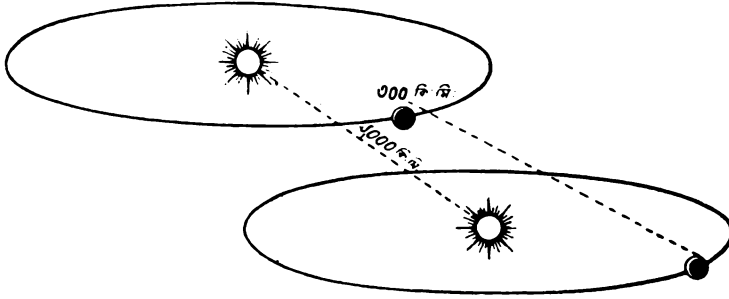
২৮ নং ছবি: পৃথিবীতে একটা জিনিসকে কী ভাবে পড়তে দেখা যাবে দূরের তারা থেকে।

কী ভাবে দেখবে তা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু তার কোন মানে হয় না। পাঠক এতক্ষণে একথা জানতে পেরেছেন যে একই পড়ন্ত জিনিসের পতন নানা জায়গা থেকে দেখলে নানা রকমের হবে।

অপার্থিব সময়

এক ঘণ্টা কাজ করার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করলেন। এই দুটো সময় কি সমান? বেশির ভাগ লোক বলবে, নিশ্চয় সমান, অবশ্য যদি ভাল ঘড়ি দিয়ে মাপা হয়। কিন্তু কোন ঘড়ি ব্যবহার করব? স্বভাবতই যে ঘড়ি জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলান। অন্য কথায় পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের গতির সঙ্গে নিখুঁৎ মিল রেখে যা চলে, সমান কোণগুলো একেবারে সমান সময়ে পার হয়।

কিন্তু জিজ্ঞেস করা যেতে পারে পৃথিবীর অক্ষাবর্তনটা যে বাঁধাধরা সেটা কী করে জানা গেল? আমাদের গ্রহের পরপর দুটো অক্ষাবর্তন যে সমান সময় নেয় এ বিষয়ে আমরা কী করে নিশ্চিত হই? পৃথিবীর অক্ষাবর্তন দিয়েই যখন সময় মাপা হয় তখন সেটা যাচাই করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি জ্যোতির্বিদরা দীর্ঘকালের বাঁধাধরা সমান গতির এই মডেল বদলে সাময়িকভাবে আরেকটি মডেল নেওয়াটি কাজের বলে মনে করছেন। তার কারণ আর ফল এই।

সযত্ন চর্চার ফলে জানা গেছে যে গ্রহনক্ষত্রের কোন কোনটির গতি তত্ত্বের ধারণার সঙ্গে মেলে না আর এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা বিশ্ববলবিদ্যার নিয়ম দিয়ে দেওয়া যায় না। দেখা গেছে চাঁদ, বৃহস্পতির ১ নং আর ২ নং উপগ্রহ, বুধ, এমনকি সূর্যের বার্ষিক দৃশ্য গতির —
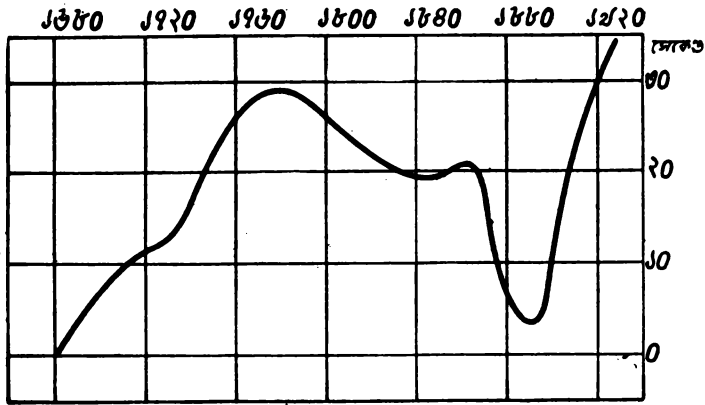
২৯ নং ছবি: বাঁকা রেখাটায় দেখা যাচ্ছে ১৬৮০ থেকে ১৯২০'র মধ্যে পৃথিবী তার বাঁধাগতি থেকে কতটা সরেছে। পৃথিবী যদি বাঁধাছন্দে অক্ষাবর্তন করত তাহলে চার্টে একটা অনুভূমিক রেখা পড়ত। পৃথিবীর অক্ষাবর্তন মন্থর হতে যে দীর্ঘতর দিন হয় তার পরিচয় হল রেখার ওঠা। রেখা নামা হল অক্ষাবর্তন দ্রুততর হতে যে হ্রস্বতর দিন হয় তার পরিচয়।

তার মানে আমাদের গ্রহের কক্ষাবর্তনের গতিরও — তারতম্য ঘটে আর আপাতভাবে তার কোন কারণ পাওয়া যায় না। যেমন চাঁদ, সে যে-পথে চলে তত্ত্ব অনুযায়ী তা থেকে তার বেশ কয়েক যুগে একটি চাপের একটি মিনিটের ১/৬ ভাগ বিচ্যুতি ঘটে। সূর্যের ঘটে একটি চাপের এক সেকেণ্ড। এই সব অমিল বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়: একটা সময়ের পরে এই গতির বেগ বাড়ে আর তার পরেই সে বেগ কমে যায়। স্বভাবতই এই বিচ্যুতিগুলির একটি সাধারণ কারণ আছে বলে মনে হয়।

আমাদের প্রাকৃতিক ঘড়ির 'খুঁৎই' কি তার জন্য দায়ী নয়, পৃথিবীর কক্ষাবর্তনকে সমান গতির (even motion) আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়ার দায়?

'পার্থিব ঘড়ি'কে বিদায় করার প্রশ্ন আসে: সে ঘড়ি সাময়িকভাবে বাতিল হয়। এবং গতি মাপা হতে থাকে আরেকটি প্রাকৃতিক ঘড়ির দ্বারা। সে ঘড়ির ভিত্তি হল বৃহস্পতির কোন একটি উপগ্রহ, চাঁদ বা বুধের গতি। এদের গতিতে তার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুশৃংখলা দেখা দেয়। কিন্তু এই নতুন ঘড়িতে পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের মাপটা দেখা যায় অসমান — বেশ কয়েক বছর ধরে তার বেগ যায় কমে, আর তার পরবর্তী কয়েক বছর ধরে যায় বেড়ে, তারপর আরেক বার যায় কমে।

১৮৯৭ সালে আগেকার বছরগুলোর তুলনায় দিন ছিল ০·০০৩৫ সেকেন্ড বড়। ১৯১৮ সালে আবার ১৮৯৭ — ১৯১৮ সালের তুলনায় ঠিক অত পরিমাণই ছোট ছিল। এখন দিন একশ বছর আগেকার তুলনায় প্রায় ০·০০২ সেকেন্ড বড়।

এদিক থেকে বলা যায় যে আমাদের গ্রহের কক্ষাবর্তনের গতি তার অন্য গতির তুলনায় অথবা গ্রহমন্ডলীয় অন্য যে সব গতি সমান গতি বলে গণ্য হয় তাদের তুলনায় অসমান। একেবারে যথার্থ সমান গতি (পূর্বে যে অর্থে বলা হয়েছে) থেকে পৃথিবীর বিচ্যুতির মান খুবই নগণ্য: ১৬৮০ থেকে ১৭৮০ এই একশ বছরে পৃথিবী ধীরে কক্ষাবর্তন করেছে, দিন তখন ছিল বড় আর আমাদের গ্রহ তার 'নিজের' সময়ের সঙ্গে 'অন্য' সময়ের পার্থক্যে ৩০ সেকেন্ড বাঁচিয়েছে। তারপর ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দিন ছোট হয়েছে আর প্রায় ১০ সেকেন্ড ছাঁট পড়েছে। এই শতাব্দী সুরু হওয়ার সময় আরো কুড়ি সেকেন্ড খোয়া যায়; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে পৃথিবীর গতি আবার কমে আসে, দিন বড় হয়, প্রায় আধ মিনিটের পার্থক্য সঞ্চিত হয় (২৯ নং ছবি)।

এই সব বদলের নানা কারণ দেওয়া হয়েছে যেমন, চান্দ্র জোয়ার, পৃথিবীর ব্যাসের পরিবর্তন* ইত্যাদি।

এই ঘটনার সম্পূর্ণ অধ্যয়নের ফলে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে।

মাস আর বছর সুরু হয় কোথা থেকে?

মস্কোয় রাত বারোটা বাজল, এল নববর্ষ। মস্কোর পশ্চিমে তখনো ৩১শে ডিসেম্বর, পূর্বদিকে ১লা জানুয়ারী। কিন্তু আমাদের গোল পৃথিবীতে পূব পশ্চিম কোথাও মিলতে বাধ্য। তার মানে ১লা আর ৩১শে, জানুয়ারী আর ডিসেম্বর, নববর্ষ আর পুরনো বছরের মধ্যে কোথাও একটা বিভেদের সীমা রেখা থাকবেই।

---

* পৃথিবীর ব্যাসের দৈর্ঘ্যের বদল সরাসরি মাপে ধরা না পড়তেও পারে, কারণ তার নিখুঁৎ হিসেব করা যায় ১০০ মিটারের ইউনিটে। দিনের স্থায়িত্বে উপরোক্ত বদল ঘটানর পক্ষে পৃথিবীর ব্যাস কয়েক মিটার ছোট বড় হওয়াই যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক দিন রেখা হল তাই। বেরিং প্রণালী আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে সেটি প্রায় ১৮০° মধ্যরেখা ধরে গেছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী তা যথার্থভাবে নির্ধারিত।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে যাওয়া এই কল্পিত রেখা ধরেই মাস আর বছররা পৃথিবীতে প্রথম বদলে যায়। এই হল আমাদের পঞ্জিকার চৌকাঠ। এইখানেই মাসের প্রতিটি দিনের সুরু। নববর্ষের জন্মস্থান এইটেই। অন্য সব জায়গার চেয়ে এখানেই মাসের প্রতিটি দিন সবচেয়ে আগে দেখা দেয়; এখান থেকেই তা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীকে পাক দিয়ে আবার জন্মস্থলে ফিরে এসে মিলিয়ে যায়।

মাসের নতুন দিনকে স্বাগত জানানর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। বেরিং প্রণালীর জল থেকে উঠে আসা সদ্যজাত দিনকে পৃথিবীতে অভ্যর্থনা জানান হয় দেজ্‌নেভ অন্তরীপে। তারপর সে যাত্রা সুরু করে পৃথিবীর সর্ব অংশে। এখানেই, সোভিয়েত এশিয়ার এই পূর্ব বিন্দুতে দিন তার ২৪ ঘণ্টার কাজ শেষ করে পরিণতি লাভ করে।

দিনের বদল ঘটে আন্তর্জাতিক দিন রেখায়। যে নাবিকরা প্রথম পৃথিবীটাকে পাক দিয়েছিল (উক্ত রেখা নির্ধারিত হবার আগে) তাদের দিনের হিসেব গুলিয়ে গিয়েছিল। মাগেল্লানের পৃথিবী প্রদক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী আন্‌তোনিও পিগাফেত্তার বলা একটি সত্যি কাহিনী শুনুন।

'১৯শে জুলাই **বুধবার** আমরা ভের্দে অন্তরীপ দ্বীপ দেখতে পেয়ে নোঙর ফেলি... লগ-বই ঠিক আছে কিনা জানার ঔৎসুক্যবশত সপ্তাহের কোন দিন সেটা খোঁজ করি। আমাদের বলা হয় **বৃহস্পতিবার**। আমরা অবাক হই, কারণ আমাদের লগ-বই বলছে **বুধবার**। আমরা সবাই একটা দিনের একই ভুল করব তা অসম্ভব মনে হল...

'পরে জানলাম আমাদের হিসেবে কোনই ভুল ছিল না। ক্রমান্বয়ে পশ্চিমমুখে যেতে যেতে আমরা সূর্যের পথ ধরেই গেছি। কাজেই যেখান থেকে ছেড়েছি সেখানে ফিরে আমরা যে সময় ছেড়েছিলাম তার উপর ২৪ ঘণ্টা বেশি লাভ করব। ব্যাপারটা ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে।'

এখন এই দিন রেখা পার হবার সময় সাগরচারীরা কী করে? ভুল এড়ানর জন্য তারা পুব থেকে পশ্চিমে যাবার সময় একটা দিন 'খোয়ায়', ফিরতি পথে একটা দিন 'বাড়ায়'। তাই 'আশি দিনে ভূপ্রদক্ষিণ'এ জুল ভার্ন যে বলেছেন যাত্রী জাহাজে করে পৃথিবী পাক দিয়ে রবিবারে 'ফিরলেও' আসলে তখনো সেটা শনিবার ছিল, তা হতে পারে না। এ ঘটনা ঘটতে পারত কেবল মাগেল্লানের সময়ে, যখন কোন দিন রেখার চুক্তি ছিল না। আমাদের কালে এরকমই সমান অসম্ভব হল এডগার এলান পোর 'সপ্তাহে

তিনটে রবিবার' গল্পের এডভেঞ্চার। তাতে এক নাবিকের কথা বলা হয়েছে। সে পূব থেকে পশ্চিমে যাত্রা করে দেশে ফিরে আরেক জনের দেখা পেয়েছে। সে লোকটি যাত্রা করেছিল উল্টো মুখে। একজন বলে আগের দিনটা ছিল রবিবার। অন্যজনের দৃঢ়বিশ্বাস আগামী কাল হবে রবিবার। অথচ তাদের বন্ধু বলে -- সে কোথাও যায়নি — রবিবার আজই।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ যাত্রায় পঞ্জিকার হিসেব ঠিক রাখতে হলে পূবমুখে যাবার সময় দিন গোনায় একটু অপেক্ষা করতে হবে, সূর্য যাতে ধরে ফেলতে পারে। তার মানে একই দিনকে **দুবার** গুনতে হবে। অপরপক্ষে পশ্চিমে যাবার সময় একটা দিন **খোয়াতে** হবে, যাতে সূর্যের পিছনে পড়ে থাকি।

ব্যাপারটা খুবই সাধারণ হলেও, মাগেল্লানের চার শতাব্দী পর আমাদের কালেও সবাই এবিষয়ে সচেতন নয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে কটা শুক্রবার পড়ে?

প্রশ্ন

ফেব্রুয়ারী মাসে শুক্রবারের সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে কম সংখ্যা কী?

উত্তর

সাধারণ উত্তর হল, সবচেয়ে বেশি সংখ্যা পাঁচ, সবচেয়ে কম চার। একথা নিঃসন্দেহ যে অধিবর্ষে যদি ১লা ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে পড়ে তবে ২৯ তারিখটাও হবে শুক্রবার। মোট পাঁচটা শুক্রবার পাওয়া যাবে।

কিন্তু শুধু ফেব্রুয়ারী মাসেই শুক্রবারের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব। ধরা যাক একটি জাহাজ সাইবেরিয়া-আলাস্কা যাতায়াত করে, আর প্রতি শুক্রবার সে এশিয়ার তীর ছাড়ে। যে অধিবর্ষে ফেব্রুয়ারীর ১লা পড়ে শুক্রবারে, সেই ফেব্রুয়ারী মাসে কটা শুক্রবার জাহাজের ক্যাপ্টেন গুনবে? ক্যাপ্টেন দিন রেখাটাকে পশ্চিম থেকে পূবের যাত্রায় পার হয় আর তাও শুক্রবারে বলে, সে সপ্তাহে দুটো করে শুক্রবার গুনবে। তার ফলে মোট দশটা শুক্রবার হবে। তেমনি আবার যে জাহাজ প্রতি বৃহস্পতিবার আলাস্কা ছেড়ে সাইবেরিয়া যায় তার ক্যাপ্টেন দিনগণনায় শুক্রবারটাকে 'খোয়াবে'। তার ফলে সে পুরো মাসটায় একটা শুক্রবারও পাবে না।

তাই ঠিক উত্তর হল ফেব্রুয়ারী মাসে শুক্রবারের সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হল ১০, আর সবচেয়ে কম সংখ্যা — ০।
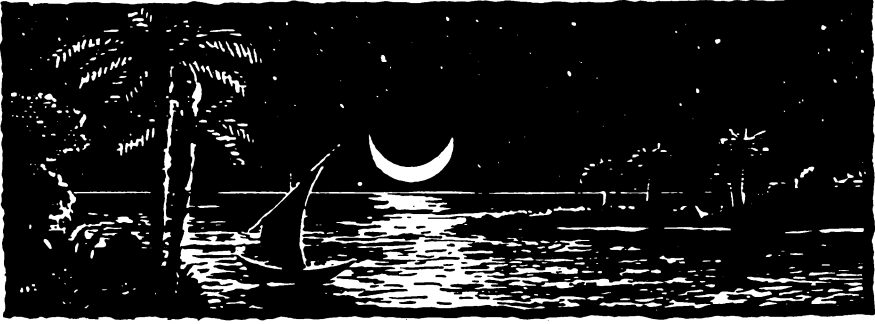
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদ আর তার গতি

শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ?

বাঁকা চাঁদের সৌন্দর্যভোগীদের সবার পক্ষে চাঁদ দেখে সঠিক বলা সম্ভব নয় শুক্লপক্ষের নতুন চাঁদ উঠল, না কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ক্ষয় ঘটছে। দুটোর তফাৎ হল এই যে তারা উল্টো দিকে মুখ করে থাকে। উত্তর গোলার্ধে শুক্লপক্ষের বাঁকা চাঁদের উত্তল (convex) দিকটা সবসময় ডানদিকে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে থাকে বাঁয়ে। এখন চাঁদ কোন দিকে মুখ করে আছে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় কী করে?
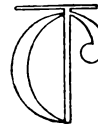
চাঁদের দুটো প্রান্তকে একটা কাল্পনিক সরল রেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। তার ফলে দুটি রোমান হরফ পাওয়া যাবে, হয় 'd' নয় 'p'। 'd' হল 'দের্নিয়ের' (শেষ) কথাটার আদ্যাক্ষর, তার মানে শেষ কলা, কৃষ্ণপক্ষ। 'p' হল 'প্রেমিয়ের' (প্রথম) কথাটার আদ্যাক্ষর। তার মানে প্রথম কলা, শুক্লপক্ষ (৩০ নং ছবি)। চাঁদকে নির্দিষ্ট অক্ষরের আকারের সঙ্গে যুক্ত করার একটা নিয়ম জার্মানদেরও আছে।

৩০ নং ছবি: শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে চেনার সহজ উপায়।

কিন্তু এ নিয়ম শুধু উত্তর গোলার্ধেই খাটে। তাই অস্ট্রেলিয়া আর ট্রান্সভালে ঠিক উল্টোটাই ঘটবে।

কিন্তু উত্তর গোলার্ধেও এরা লাগসই না হতেও পারে। যেমন, দক্ষিণ দ্রাঘিমায়। ক্রাইমিয়া আর ট্রান্সককেশিয়ায় বাঁকা আর অর্ধচাঁদ খুবই হেলে থাকে, আরো দক্ষিণে একেবারে কাৎ হয়ে থাকে। বিষুবরেখার কাছে বাঁকা চাঁদকে দেখায় যেন একটা গণ্ডোলা নৌকো ঢেউয়ের বুকে ভাসছে (আরবী উপকথার 'চাঁদের তরণী') কিম্বা যেন একটা উজ্জ্বল খিলান। এখানে ঐ ফরাসী কায়দা চলবে না কারণ শোয়া চাঁদে 'p' আর 'd' অক্ষরদুটোকে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন রোমকরা যে শোয়া চাঁদকে 'ভুল' 'fallacious' (Luna fallax) বলত, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। চাঁদের কলায় ভুল না করতে হলে আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার চিহ্ন দেখতে হবে। শুক্লপক্ষের চাঁদ ওঠে অন্ধকারের পর আকাশের পশ্চিম অংশে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে দেখা যায় ভোরের দিকে পূব আকাশে।

পতাকায় চাঁদ

প্রশ্ন

৩১ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে তুর্কী পতাকা। তাতে বাঁকা চাঁদ আর তারা। তা দেখে এ জাতীয় প্রশ্ন মনে আসে:
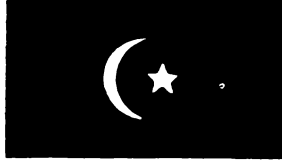
৩১ নং ছবি: তুরস্কের পুরনো নিশান।

(১) পতাকায় কোন বাঁকা চাঁদ রয়েছে, শুক্লপক্ষের না কৃষ্ণপক্ষের?

(২) পতাকায় বাঁকা চাঁদ আর তারার যে অবস্থান, আকাশে তা কি দেখা যায়?

উত্তর

(১) উপরোক্ত পন্থা খাটিয়ে আর তুরস্ক উত্তর গোলার্ধের দেশ বলে আমরা জানতে পারি পতাকার চাঁদটা হল **কৃষ্ণপক্ষের।**

(২) তারাকে চাঁদের পুরো চক্রের মধ্যে কখনো দেখতে পাওয়া সম্ভব নয় (৩২ নং ছবি 'ক')। চাঁদ থেকে সব জ্যোতিষ্কই বেশ দূরে আর তাই চাঁদে তা ঢাকা পড়ে যাবে। কেবল তার অন্ধকার অংশের পূর্ণবৃত্তের বাইরে তাদের দেখা যেতে পারে, ৩২ নং ছবি 'খ'তে যেমন দেখান হয়েছে।

কৌতূহলের বিষয় হল তুরস্কের বর্তমান পতাকায় — তাতেও বাঁকা চাঁদ আর তারা আছে — তারাটা বাঁকা চাঁদ থেকে দূরে, ঠিক ৩২ নং ছবি 'খ'তে যেমন আছে।

চন্দ্রকলার ধাঁধা

চাঁদ সূর্য থেকে আলো পায়। তাই বাঁকা চাঁদের উত্তলটা স্বভাবতই সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। শিল্পীরা কিন্তু প্রায়ই তা ভুলে যান। প্রদর্শনীতে মাঝেমাঝে এমন

৩২ নং ছবি, ক, খ: চাঁদের দুই শৃঙ্গের মধ্যে তারাদের কেন দেখা যায় না।

৩৩ নং ছবি: এই ছবিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একটি ভুল আছে। কী ভুল? (বইয়ে উত্তর পাবেন।)

দৃশ্যচিত্র দেখা যায় যেখানে অর্ধচাঁদ তার দক্ষিণ মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। কখনো কখনো দেখা যায় বাঁকা চাঁদের প্রান্তদুটি সূর্যের দিকে ফেরানো (৩৩ নং ছবি)।

প্রসঙ্গত বলি শুক্লপক্ষের চাঁদ ঠিকভাবে আঁকা মোটেই সহজ নয়। তুলি রঙের অভিজ্ঞ কারিগররাও বাঁকা চাঁদের বাইরের আর ভিতরের চাপটাকে অর্ধবৃত্তের আকারে আঁকেন (৩৪ নং ছবি 'খ')। আসলে কিন্তু বাইরের চাপটাই কেবল অর্ধবৃত্ত আকারের। ভিতরেরটা **অর্ধ উপবৃত্ত** বা **বাঁকাভাবে** দেখা একটি অর্ধবৃত্ত (সীমাকারী) (৩৪ নং ছবি 'ক')।

আকাশে বাঁকা চাঁদকে তার ঠিক জায়গায় বসানটাও সোজা নয়। অর্ধচাঁদ আর বাঁকা চাঁদ সূর্যের দিক থেকে প্রায়ই অত্যন্ত অদ্ভুত অবস্থায় থাকে। মনে হতে পারে, চাঁদ সূর্যের দ্বারা আলোকিত বলে, চাঁদের চূড়াদুটোকে যোগ করা একটি সরল রেখা সূর্যের ছেদকারী রশ্মির সঙ্গে সমকোণে থাকবে (৩৫ নং ছবি)। তার মানে চাঁদের প্রান্তদুটোকে যোগ করা সরলরেখার কেন্দ্র থেকে একটি লম্ব টানলে সেই লম্বের শেষে থাকবে সূর্য। এই নিয়ম ক্ষীণ চন্দ্রকলার বেলাতেই কেবল খাটবে। ৩৬ নং ছবিতে সূর্যরশ্মির সম্পর্কে বিভিন্ন কলায় চাঁদের অবস্থান দেখান হয়েছে। মনে হয় যেন রশ্মিগুলো চাঁদে পৌঁছবার আগেই বেঁকে গেছে।
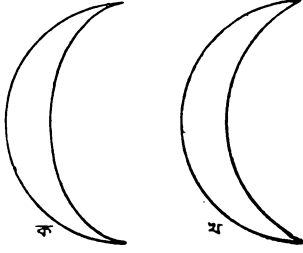
৩৪ নং ছবি: প্রতিপদের চাঁদ (ক), (খ) নয়, কী ভাবে আঁকতে হয়।

এই ধাঁধার উত্তর হল: সূর্য থেকে চাঁদের দিকে যে রশ্মি আসছে তা পড়ছে চাঁদের প্রান্তদুটোকে যুক্ত করছে যে সরলরেখা তার উপর লম্ব হয়ে আর তা শূন্যে একটা সরলরেখাই আঁকছে। কিন্তু আমাদের চোখ আকাশে এই সরলরেখাটা দেখে না। আকাশের উপুড়-করা বাটির মতো গায়ে তার প্রক্ষেপ দেখি, তার মানে বক্র রেখা। তাই
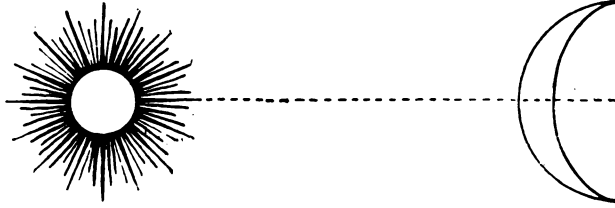
৩৫ নং ছবি: সূর্যের সম্পর্কে প্রতিপদের চাঁদ।

আকাশে চাঁদটাকে 'যেন ভুলভাবে ঝুলে আছে' বলে মনে হয়। শিল্পীদের উচিত এইসব বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করে তাদের আঁকতে শেখা।
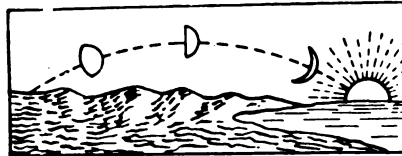
৩৬ নং ছবি: সূর্যের সম্পর্কে চাঁদকে তার নানা কলায় এই সব অবস্থানে দেখা যায়।

দ্বৈত গ্রহ

পৃথিবী আর চাঁদ মিলে হল দ্বৈত গ্রহ। এই নাম তারা পেয়েছে, তার কারণ আমাদের উপগ্রহটি অন্য গ্রহের উপগ্রহদের মধ্যে বিশিষ্ট, কারণ মূল গ্রহের তুলনায় আকারে ও ভরে তা প্রকাণ্ড। সৌরমণ্ডলীতে অবশ্য আরো বড় আর ভারী উপগ্রহ আছে। কিন্তু তাদের মূল গ্রহের তুলনায় তারা অনেক ছোট। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর একচতুর্থাংশেরও বেশি। সবচেয়ে বড় উপগ্রহ নেপচুনের ট্রাইটনের ব্যাস হল তার কেন্দ্রীয় গ্রহের ব্যাসের দশ ভাগের এক ভাগ। তারোপর চাঁদের ভর হল পৃথিবীর ১/৮১ ভাগ। সৌরমণ্ডলীর সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ, বৃহস্পতির ৩ নং উপগ্রহ, তার কেন্দ্রীয় গ্রহের ভরের চেয়ে ১/১০,০০০ ভাগ কম।

নিচের তালিকায় মূল গ্রহের তুলনায় বৃহত্তম উপগ্রহগুলির ভরের ভগ্নাংশিক পার্থক্য দেওয়া হল।

গ্রহ	উপগ্রহ	ভর (গ্রহের ভরের ভগ্নাংশ)
পৃথিবী	চাঁদ	০·০১২৩
বৃহস্পতি	গ্যানিমিড্	০·০০০০৮
শনি	টাইটান	০·০০০২১
ইউরেনাস	টাইটানিয়া	০·০০০০৩
নেপচুন	ট্রাইটন	০·০০১২৯

গ্রহের ভরের ভগ্নাংশের আকারে চাঁদই সর্বপ্রথমে।

পৃথিবী-চন্দ্র মণ্ডলীকে 'দ্বৈত গ্রহ' নাম দেবার তৃতীয় কারণ হল তাদের নৈকট্য। বহু গ্রহের উপগ্রহ আরো অনেক দূর দিয়ে ঘোরে। বৃহস্পতির কোন কোন উপগ্রহ (৩৭ নং ছবিতে ৯ নং উপগ্রহ) ৬৫ গুণ বেশি দূর দিয়ে যায়।

এখানে একটা কৌতূহলজনক তথ্য আমরা পাই — সূর্য পরিক্রমায় চাঁদের পথের সঙ্গে পৃথিবীর পথের পার্থক্য খুব সামান্যই। চাঁদ পৃথিবী থেকে ৪,০০,০০০ কিঃমিটার দূরে — একথা খেয়াল করলে ব্যাপারটা আরো অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে চাঁদ যখন একবার পৃথিবীকে পাক দেয়, তখন পৃথিবী নিজে, চাঁদকে নিয়ে, তার বার্ষিক যাত্রার প্রায় ১/১৩ ভাগ পার হয়ে যায়, তার মানে ৭,০০,০০,০০০ কিঃমিটার। ধরা যাক চাঁদের ২৫,০০,০০০ কিঃমিটারী বৃত্তাকার কক্ষপথ গেল ত্রিশ গুণ লম্বাটে হয়ে। তার গোল আকারটার তবে কী বাকি থাকবে? কিছুই না। সেই জন্যই সূর্যের চারপাশে

চাঁদের পথ প্রায় পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে মিলে যায়, কেবল ১৩টি জায়গায় যেটুকু ঢেউ খেলে যায় তা প্রায় চোখেই পড়ে না। অত্যন্ত সহজ এক হিসাবের ফলেই — সেটা দিয়ে আপনাদের বিরক্ত করব না — দেখান যায় যে, চাঁদের পথটা সবসময় সূর্যের দিকে

৩৭ নং ছবি: বৃহস্পতির পরিবারের তুলনায় পৃথিবী-চাঁদ পরিবার। (গ্রহ উপগ্রহগুলির প্রকৃত মান দেখান হয়নি।)

অবতল (concave) হয়ে আছে। তা প্রায় ১৩টি বাহু আর ১৩টি গোল কোণ নিয়ে গঠিত একটি ত্রয়োদশভুজের মতো দেখতে।

৩৮ নং ছবিতে একমাসে পৃথিবী আর চাঁদের পথের যথার্থ ছবি পাওয়া যাবে। ভাঙা ভাঙা রেখাটা হল পৃথিবীর পথ, সম্পূর্ণ রেখাটা চাঁদের। অত্যন্ত কাছে বলে তাদের পার্থক্য দেখানর জন্য খুব বড় মাপের ছবি আঁকতে হল। এই ছবিতে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাস হল আধ মিটার। যদি সেটাকে ১০ সেঃমিটার দেখান হত তাহলে দুটো পথের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফারাক লাইনদুটির ঘনত্বের চেয়েও কম হত।
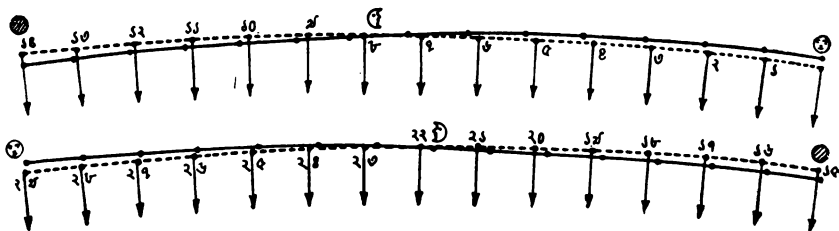
৩৮ নং ছবি: সূর্যপ্রদক্ষিণে চাঁদের মাসিক পথ (মোটা রেখা) ও পৃথিবীর মাসিক পথ (ফোঁটার রেখা)।

ছবি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী আর চাঁদ সূর্যকে পাক দেয় প্রায় একই কক্ষপথে। তাই জ্যোতির্বিদরা এদের 'দ্বৈত গ্রহ' নাম দিয়ে ঠিকই করেছেন।*

---

* ছবিটা ভাল করে যাচিয়ে দেখলে দেখা যাবে চাঁদের গতিটাকে একেবারে সমান বলে দেখান হয়নি। সত্যিই তাই। চাঁদ পৃথিবীকে পাক দেয় উপবৃত্তের পথে, পৃথিবী থাকে তার নাভিতে। তাই কেপলারের দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী চাঁদ পৃথিবীর যখন কাছে থাকে তখন দূরের চেয়ে দ্রুত ছোটে। চান্দ্র কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা হল — ০.০৫৫ — বেশ বেশি।

সূর্যের একজন দর্শক দেখবে চাঁদের পথটা হল অল্প বক্র রেখা, আর তা প্রায় পৃথিবীর কক্ষপথের উপর দিয়েই চলেছে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের পথটা যে একটু উপবৃত্তের মতো, তাতে কিছু হেরফের হবে না।

তার কারণ হল পৃথিবী থেকে দেখার সময় আমরা চাঁদকে পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথ ধরে সরতে দেখি না, কারণ আমরা নিজেরাই সেই গতিতে যোগ দিই।

চাঁদ সূর্যে পড়ে যায় না কেন?

প্রশ্নটা শোনায় খুবই সরল। চাঁদ সূর্যে পড়বেই বা কেন? পৃথিবী তো মনে হয় দূরের সূর্যের চেয়ে চাঁদকে বেশি করে টানে আর তাই চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে বাধ্য হয়।

যে পাঠক একথা ভাবেন তিনি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আসলে এর উল্টোটাই সত্যি। পৃথিবী নয়, সূর্যই চাঁদকে বেশি করে টানে!

একটু আঁকজোক করলেই তা প্রমাণ হবে। চাঁদকে যে শক্তিগুলি টানছে, সূর্য আর পৃথিবী, তাদের জোরটা একবার তুলনা করে দেখা যাক। দুটি শক্তিই নির্ভর করছে দুটি জিনিসের উপর — আকর্ষণকারী ভরের পরিমাণ আর চাঁদ থেকে তার দূরত্ব। সূর্যের ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩,৩০,০০০ গুণ বেশি। চাঁদ থেকে সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব সমান হলে চাঁদের উপর সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের তুলনায় ঠিক অত গুণই বেশি হত। কিন্তু সূর্য চাঁদ থেকে পৃথিবীর চেয়ে ৪০০ গুণ দূরে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্গদূরত্বের অনুপাতে কমে যায়। তাই সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হবে ৪০০^2, তার মানে ১,৬০,০০০ গুণ কম। সুতরাং সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর চেয়ে $\frac{৩,৩০,০০০}{১,৬০,০০০}$ গুণ বেশি হবে, তার মানে দ্বিগুণের বেশি।

তাই সূর্য চাঁদকে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির চেয়ে দ্বিগুণ জোরে টানে। তাহলে চাঁদ কেন সূর্যে পড়ে যায় না? সূর্য প্রাধান্য পায় না অথচ পৃথিবী কী করে চাঁদকে তার চারপাশে ঘুরতে বাধ্য করে?

যে কারণে পৃথিবী সূর্যে পড়ে না চাঁদও সেই কারণেই সূর্যে পড়ে না। চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যকে পাক দেয়। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টান পুরোটা খরচ হয়ে যায় চাঁদ আর পৃথিবীকে সোজা পথ থেকে সরিয়ে বক্র কক্ষপথে ঘোরানয়। তার মানে সরলরেখার গতিকে বক্র রেখার গতিতে পরিণত করায়। ৩৮ নং ছবি দেখলেই তা ধরা পড়বে।

কোন কোন পাঠকের এখনো হয়ত সন্দেহ আছে। কেমন করে এসব হয়? পৃথিবী চাঁদকে নিজের দিকে টানে। কিন্তু সূর্য চাঁদকে আরো জোরে টানে। তবু চাঁদ সূর্যে পড়ার বদলে পৃথিবীকে পাক দিতে থাকে। কেন? সূর্য যদি **কেবল** চাঁদকে টানত তাহলে ব্যাপারটা

খুবই বিস্ময়ের হত। আসলে সূর্য **চাঁদ আর পৃথিবী**, এই 'দ্বৈত গ্রহের' পুরোটাকেই টানে। অবশ্য এই জোড়ার দাম্পত্য জীবনে তা নাক গলায় না। ঠিক বলতে গেলে সূর্য পৃথিবী-চাঁদ পরিবারের সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রে টান মারে। এই কেন্দ্রটাই সৌর আকর্ষণের প্রভাবে সূর্যের চারপাশে ঘোরে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের দিকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ¾ দূরত্বে এই কেন্দ্র অবস্থিত। চাঁদ আর পৃথিবীর কেন্দ্র একই সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরে, একমাসে একটি পূর্ণ আবর্তন সমাপ্ত হয়।

চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য মুখ

স্টেরেওস্কোপিক প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল চাঁদের দৃশ্য। চাঁদ আসলে বলের মতো হলেও আকাশে তাকে থালার মতো চ্যাপ্টা মনে হয়।

আমাদের উপগ্রহের স্টেরেওগ্রাফিক ছবি তোলাটা যে কী কঠিন সে বিষয়ে খুব কম লোকেরই সামান্যতম ধারণাও আছে। তা করতে হলে তার গতির খামখেয়ালের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে হবে।

চাঁদ পৃথিবীর দিকে মুখের একটা দিকই সারাক্ষণ ফিরিয়ে রেখে তাকে পাক দেয়। পৃথিবীকে পাক দেবার সময় সে তার নিজের অক্ষেও ঘোরে। দুটি গতি একইসঙ্গে ঘটে।

৩৯ নং ছবিতে একটি উপবৃত্ত চাঁদের কক্ষপথটা দেখাচ্ছে। ছবিতে ইচ্ছা করেই চান্দ্র উপবৃত্তের দীর্ঘায়িত চেহারাটা বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। আসলে চান্দ্র কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·০৫৫ বা ১/১৮। বৃত্ত থেকে তার পার্থক্য দেখিয়ে চাঁদের কক্ষপথের একটি ছোট ছবি আঁকা অসম্ভব। কারণ প্রধান সম-অক্ষটা এক মিটার লম্বা হলে গৌণ সম-অক্ষটা হবে মাত্র ১·৫ মিঃমিটার ছোট। আর কেন্দ্র থেকে পৃথিবী মাত্র ৫·৫ সেঃমিটার দূরে থাকবে। তাই বোঝানর জন্য ছবিটা লম্বাটে উপবৃত্ত করে আঁকা হয়েছে।
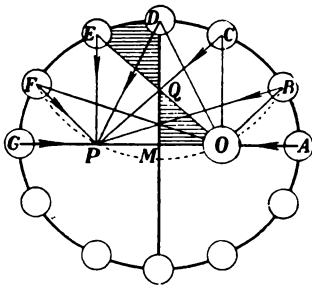
৩৯ নং ছবি: চাঁদ কী ভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণের কক্ষপথে ঘোরে (বইয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন)।

৩৯ নং ছবির উপবৃত্তটাকে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের কক্ষপথ বলে ধরে নেওয়া যাক। পৃথিবী রয়েছে O বিন্দুতে, উপবৃত্তের অন্যতম নাভি। কেপলারের বিধি যে শুধু সূর্যের চারপাশে গ্রহদের গতির বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়, কেন্দ্রীয় গ্রহের চারপাশে উপগ্রহদের গতির বেলাতেও তা খাটে, বিশেষ করে চান্দ্র আবর্তনের ক্ষেত্রে। কেপলারের দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী মাসের এক চতুর্থাংশে চাঁদ AE দূরত্ব পার হয়, OABCDE উপবৃত্তের একচতুর্থাংশ অর্থাৎ MABCD এই অংশটার সমান (OAE আর MAD আমাদের ছবিতে এই

দ্বটি এলাকা যে সমান তা প্রমাণ করা যায় কারণ MOQ আর EQD এলাকাদ্বটি প্রায় সমান)। কাজেই মাসের এক চতুর্থাংশে চাঁদ A থেকে E'তে যায়। কিন্তু চাঁদের অক্ষাবর্তন, স্বর্যপ্রদক্ষিণ আবর্তনের মতো তেমন অসমান নয়, সাধারণ গ্রহাবর্তনের মতো মোটাম্বটি সমগতি (even)। মাসের এক চতুর্থাংশে তা ঠিক ৯০° বাঁক ফেরে। তাই যখন সে E'তে পেঁছিয় পৃথিবীর দিকে A বিন্দ্বতে অবস্থিত তার ব্যাসার্ধ একটা ৯০°র চাপ পার হবে। আর তার ম্বখ M বিন্দ্বতে থাকবে না; থাকবে M'এর বাঁয়ে আর কোন বিন্দ্বতে, তার কক্ষের দ্বিতীয় নাভি P'র কাছাকাছি। চাঁদ তার পার্থিব দর্শকের দিক থেকে ম্বখ একটুখানি ফেরাতেই দর্শক ডান দিকে চাঁদের এখন পর্যন্ত অদৃশ্য গোলার্ধের এক ফালি দেখতে পাবে। F বিন্দ্বতে চাঁদ পার্থিব দর্শককে তার সাধারণত অদৃশ্য দিকের আরো ছোট এক ফালি দেখতে দেয়, কারণ OFP কোণটা OEP কোণের চেয়ে ছোট। কক্ষপথের 'অপভূ' (apogee) G বিন্দ্বতে চাঁদ পৃথিবীর সম্পর্কে 'অন্বভূ' (perigee) A বিন্দ্বর মতো অবস্থানেই আসে। তারপর চাঁদ পৃথিবী থেকে দ্বরে সরে থাকে, অবশ্য উল্টো দিকে। আমাদের গ্রহকে অদৃশ্য দিকের আরেকটা ফালি দেখিয়ে দেয়। এই ফালিটা প্রথমে চওড়া হয়, তারপর সর্ব্ব, শেষে A বিন্দ্বতে চাঁদ তার প্বরনো অবস্থানে ফিরে আসে।

দেখা গেল চাঁদের কক্ষপথ উপবৃত্ত আকারের বলে আমাদের উপগ্রহ যে পৃথিবীর দিকে কেবল একটি ম্বখই সারাক্ষণ ফিরিয়ে রাখছে, তা ঠিক নয়। এ ম্বখ সে ফিরিয়ে রাখছে পৃথিবীর দিকে নয়, তার কক্ষপথের অন্য নাভির দিকে। তাই বলা যায়, যেন সে দাঁড়িপাল্লার মতো তার মধ্যাবস্থানের দ্ব'পাশে দ্বলছে। এ থেকেই জ্যোতির্বিদরা এই পরিভাষাটি বের করেছেন 'libration', তার উৎপত্তি হল একটি লাতিন কথা 'libra' থেকে যার মানে 'তুলাদণ্ড'। কক্ষের এক একটা বিন্দ্বতে তার লিব্রেশনের পরিমাণ মাপা যায় তার পাল্টা (corresponding) কোণ দিয়ে। যেমন E বিন্দ্বতে লিব্রেশন হবে OEP কোণের সমান। সবচেয়ে বেশি লিব্রেশন হল ৭°৫৩′ বা প্রায় ৮°।

চাঁদ তার কক্ষপথে যাবার সময় লিব্রেশনের কোণটা যে ভাবে বড় ছোট হয় তা বেশ কৌতূহলজনক। D বিন্দ্বতে কম্পাসের ছ্বঁচলো পাটা বসিয়ে এমন একটি চাপ আঁকুন যা O আর P নাভিদ্বটি দিয়ে যাবে। এই চাপ B আর F বিন্দ্বতে কক্ষপথকে কাটবে। OBP আর OFP কোণদ্বটি অন্তর্লিখিত কোণ বলে কেন্দ্রীয় কোণ ODP'র অর্ধেকের সমান। তাই দেখা যায় A থেকে D'তে চাঁদের পথে লিব্রেশন দ্রুত, তার সর্বোচ্চ সীমার অর্ধেকে ওঠে B বিন্দ্বতে, তারপর ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। D আর F'এর মাঝখানে লিব্রেশন প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত কমতে থাকে। উপবৃত্তের দ্বিতীয় অর্ধে লিব্রেশন এই ভাবেই বদলায়, তবে উল্টো পর্যায়ে। (কক্ষপথের প্রতি বিন্দ্বতে লিব্রেশনের মাত্রা প্রায় উপবৃত্তের প্রধান অক্ষ থেকে চাঁদের দ্বরত্বের অন্বপাত অন্বযায়ী।)

চাঁদের এই দোলনকে বলে দ্রাঘিমাগত লিব্রেশন। আমাদের উপগ্রহটিতে কিন্তু আরো এক রকমের লিব্রেশন দেখা যায়। তাকে বলে অক্ষাংশিক লিব্রেশন। চাঁদের কক্ষপথের সমতলটা চান্দ্র বিষুব ক্ষেত্রের দিকে ৬½° ঝুঁকে থাকে। তাই একবার আমরা চাঁদকে অল্প দক্ষিণ থেকে দেখি, আরেকবার অল্প উত্তর থেকে; তার মেরু দুটির উপর দিয়ে 'অদৃশ্য' গোলার্ধে উঁকি মারতে পারি। এই অক্ষাংশিক লিব্রেশন ৬½° পর্যন্ত পৌঁছয়।

এখন বলব চাঁদ যে একটু দোলে সেটাকে জ্যোতির্বিদ স্টেরেওস্কোপিক ছবি তোলার ক্ষেত্রে কী ভাবে কাজে লাগান। পাঠক হয়ত বুঝতে পেরেছেন এ কাজ করতে হলে চাঁদের এমন দুটি অবস্থানকে ধরতে হবে যাদের মধ্যবর্তী কোণটা যথেষ্ট বড়।* A আর B, B আর C, C আর D প্রভৃতি বিন্দুতে পৃথিবীর সম্পর্কে চাঁদের অবস্থান এতটা বদলায় যে সেখানে স্টেরেওস্কোপিক ছবি তোলা সম্ভব হয়। এখানে অবশ্য আমাদের সামনে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। এই অবস্থানগুলিতে চাঁদের **বয়সের** তফাৎ -- ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টা -- এতই বেশি যে ততক্ষণে আলো-আঁধারি সীমাটার কাছে তার ভূপৃষ্ঠের ফালিটুকু প্রথম ছবিতে অন্ধকার থেকে জেগে ওঠে। এতে স্টেরেওস্কোপিক ছবি তোলা যায় না কারণ ঐ ফালিটুকু রুপোর মতো ঝকঝক করবে। তাই দেখা দেয় এক কঠিন কাজ — বিভিন্ন দ্রাঘিমাগত লিব্রেশনের মাত্রা থেকে একই রকমের চন্দ্রকলা ধরা যেখানে আলোকিত বৃত্তটা চাঁদের বুকের একই জায়গা জুড়ে থাকে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়; এই সঙ্গে দুটো অবস্থানের একই রকমের **অক্ষাংশিক** লিব্রেশনও থাকা চাই।

এবার বুঝতে পারছেন চাঁদের ভাল স্টেরেওগ্রাফ পাওয়া কত কঠিন। স্টেরেওস্কোপিক জুটির দ্বিতীয় ছবিটি নিতে যে প্রায়ই বহু বছর লেগে যায় তা শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন না।

কিন্তু পাঠক হয়ত চান্দ্র স্টেরেওফোটোগ্রাফিতে তেমন মাথা ঘামাবেন না। আমাদের এই ব্যাখ্যার কারণ কোন ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্য নয়, চাঁদের গতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা জানান যার ফলে জ্যোতির্বিদরা আমাদের উপগ্রহের সাধারণত অদৃশ্য অংশের একটি ছোট্ট ফালি দেখতে পান। চান্দ্র লিব্রেশনের ফলে আমরা চাঁদের পুরো বুকের অর্ধেক নয়, শতকরা ৫৯ ভাগ দেখতে পাই। বাকিটা আমাদের দৃষ্টির একেবারেই বাইরে। তার চেহারাটা কি রকম কেউ জানে না। এটুকু মনে করা যেতে পারে যে দৃশ্য অংশের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য কিছু নেই।** চাঁদের কোন কোন পাহাড়শ্রেণী আর উজ্জ্বল বন্ধনী অনুসরণ করে সাময়িকভাবে অনায়ত্ত গোলার্ধের বিষয়ে কিছু খুঁটিনাটি আন্দাজের চতুর

---

* চাঁদের ১° কোণের বাঁকই স্টেরেওস্কোপিক ছবি তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

** মানুষের তৈরী পৃথিবীর প্রথম উপগ্রহ নিক্ষেপ আর সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন থেকে চাঁদের অপর দিকের ছবি তোলার অনেক আগে এই বইটি লেখা। — সম্পাঃ।

প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কেবল আন্দাজীর রাজ্যেই আছি। 'এখনো পর্যন্ত' বলছি কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে বহিশূন্যে যাত্রা করতে পারে এমন যন্ত্রে চাঁদকে পাক দিয়ে আসার দিকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। যে দিন এই দুঃসাহসী কাজ করা হবে সে দিন আর দূরে নয়। একটা জিনিস আমরা জানি: চাঁদের অদৃশ্য গোলার্ধে আবহাওয়া আছে বলে যে তত্ত্ব প্রায়ই আওড়ান হয় তা একেবারেই ভিত্তিহীন। সে তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার বিধির সম্পূর্ণ বিরোধী। চাঁদের একদিকে কোন আবহাওয়া না থাকলে অন্যদিকেই বা থাকবে কী করে? (এই প্রশ্নে পরে আবার আসব)।

দ্বিতীয় চাঁদ আর চাঁদের চাঁদ

কাগজে মাঝেমাঝে খবর বেরয়, কেউ না কেউ পৃথিবীর দ্বিতীয় উপগ্রহ বা দ্বিতীয় চাঁদ দেখেছেন। এ দাবি কখনো প্রমাণিত না হলেও প্রসঙ্গটা কৌতূহলজনক।

পৃথিবীর আরেকটি উপগ্রহের প্রশ্ন কিছু নতুন নয় — তার ইতিহাস দীর্ঘ। জুল ভার্নের 'কামান থেকে চাঁদে' যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে পড়বে, এক দ্বিতীয় চাঁদের কথা লেখক বলেছেন, সে চাঁদ এতই ছোট আর দ্রুতগতি যে পৃথিবী থেকে তাকে দেখাই যায় না। জুল ভার্ন বলছেন, জ্যোতির্বিদ পৃতি তার অস্তিত্বের কথা আঁচ করেন আর পৃথিবীর চারপাশে তার আবর্তনের গতিবেগ নির্ধারণ করেন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব নাকি ৮,১৪০ কিঃমিটার। কৌতূহলের বিষয় হল জুল ভার্নের বইয়ে যে সব জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজী 'সায়েন্স্' পত্রিকা বলে যে পৃতি'র কথা এমন কি পৃতি নিজেই নাকি একেবারেই বানান। কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষেই পৃতি নামে কোনো বিজ্ঞানীর উল্লেখ নেই। তবু বানানর অপরাধে উপন্যাসকার দোষী নন। গত শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে তুলুজ মানমন্দিরের পরিচালক পৃতি সত্যিই বলেছিলেন দ্বিতীয় চাঁদের অস্তিত্বের কথা, একটা উল্কাবস্তু যার আবর্তনের সময় হল ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট, আর পৃথিবী থেকে ৮,০০০ নয়, ৫,০০০ কিঃমিটার দূরে। সে সময়ে খুব অল্প কয়জন বিজ্ঞানীই সে মত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তা তলিয়ে যায় বিস্মৃতিতে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর আরেকটি ছোট্ট উপগ্রহের কথা কল্পনা করায় অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। কিন্তু এ জাতের কোন জ্যোতিষ্ককে শুধু সে যখন চাঁদ আর সূর্যের থালা পার হচ্ছে মাত্র সেই দুর্লভ ক্ষণেই দেখা যাবে, তা নয়। যদি এমনও হয় যে সে পৃথিবীর এত কাছ দিয়ে যাচ্ছে যে প্রতি আবর্তনে সে পৃথিবীর ছায়ায় পড়ে, তবুও তাকে সকালে আর সন্ধ্যায় সূর্যের আলোয় আলোকিত একটি উজ্জ্বল তারার মতো দেখা যাওয়া উচিত। তার দ্রুত গতি আর প্রায়শ আবির্ভাবের ফলে এই তারা বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। দ্বিতীয় চাঁদ পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ও জ্যোতির্বিদদের চোখে পড়ত।

মোট কথা পৃথিবীর আরেকটি উপগ্রহ থাকলে তা প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু তা যে যায়নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আরেকটি মতে বলে, চাঁদের নিজের ছোট্ট উপগ্রহ থাকতে পারে, 'চাঁদের চাঁদ'। এ জাতীয় চান্দ্র উপগ্রহের অস্তিত্বের সরাসরি প্রমাণ দেওয়া খুবই কঠিন। এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ মুল্‌তু কী বলছেন শুনুন:

'পুরো চাঁদের আলোয় চাঁদ বা সূর্যের আলো তার কাছাকাছির ছোট্ট জ্যোতিষ্ককে দেখতে দেয় না। কেবল চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের উপগ্রহ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় আর কাছাকাছির আকাশ চাঁদের ছড়ান আলো থেকে মুক্তি পায়। তাই কেবল চন্দ্রগ্রহণের সময় আমরা চাঁদকে প্রদক্ষিণকারী একটি ছোট্ট জ্যোতিষ্ককে আবিষ্কার করতে পারি। এই পথে অনুসন্ধান চলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায়নি।'

চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই?

যে সব প্রশ্ন উল্টে দেখলে সহজ হয় এই প্রশ্নটি তাদেরই দলের।

চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই সেটা বের করার আগে দেখা যাক আমাদের গ্রহ কেন বায়ুমণ্ডলে মোড়া। মনে রাখতে হবে যে কোন গ্যাসের মতোই বাতাসও হল নানা দিকে ছুটে যাওয়া অণুর একটা বিশৃঙ্খল সমষ্টি। $0°$ সেণ্টিগ্রেডে তাদের গড়পড়তা গতিবেগ হল সেকেণ্ডে প্রায় ০·৫ কিঃমিটার। রাইফেলের বুলেটের সমান। তবে তারা মহাশূন্যে চলে যায় না কেন? যে কারণে বুলেট মহাশূন্যে চলে যায় না সেই কারণেই। মাধ্যাকর্ষণকে কাটাতেই তাদের গতিশক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, তাই অণুগুলি আবার পৃথিবীতেই পড়ে। কল্পনা করা যাক পৃথিবীর বুকের কাছাকাছি একটা অণু সোজা উঁচুতে সেকেণ্ডে ০·৫ কিঃমিটার বেগে ছুটছে। অণুটি কত উঁচুতে উঠবে? সেটা খুবই সহজ হিসেব কারণ গতিবেগের v, উচ্চতার h আর অভিকর্ষের ত্বরণ g পরস্পর এই সূত্রে গাঁথা:

$$v^২ = ২gh।$$

v'র জায়গায় তার মূল্য বসান যাক — সেকেণ্ডে ৫০০ মিঃ। g'র জায়গায় বসুক ১০ মিঃ/সেকেণ্ড২। ফল হবে

$$২,৫০,০০০ = ২০h, \text{ তার ফলে}$$

$$h = ১২,৫০০ \text{ মিঃ বা } ১২\tfrac{১}{২} \text{ কিঃমিটার।}$$

কিন্তু বাতাসের অণুরা যদি ১২½ কিঃমিটারের উপরে না যেতে পারে তাহলে এই প্রশ্নটি দেখা দেয়: এই সীমার ঊর্ধ্ববর্তী বাতাসের অণুরা এল কোথা থেকে? আমাদের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গঠিত হয় পৃথিবীর বুকের কাছে (উদ্ভিদ মারফৎ কার্বন

ডাইঅক্সাইড থেকে)। তাহলে ৫০০ কিঃমিটার বা তারও বেশি উঁচুতে যেখানে বাতাসের চিহ্ন নিশ্চিতই পাওয়া গেছে, সেখানে তাদের তুললই বা কোন শক্তি আর ধরেই রাখল বা কে? 'মানুষের গড়পড়তা জীবন ৪০ বছর হলে ৮০ বছরের বুড়ো আসে কোথা থেকে?' এ প্রশ্নের যে জবাব পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী দেবেন, পদার্থবিদ্যাও আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে সেরকম উত্তরই জোগাবে। ব্যাপার হল আমাদের হিসাব খাটে মধ্য অণু সম্বন্ধে, সত্যিকার অণুর বেলায় নয়। মধ্য অণুর গতিবেগ হল সেকেণ্ডে আধ কিলোমিটার। কিন্তু সত্যিকার অণু কোনটা গড়পড়তা গতিবেগের চেয়ে ধীরে ছোটে, কোনটা তার চেয়ে জোরে। অবশ্য যে সব অণুর গতিবেগ মধ্য হারের সমান নয়, তাদের অনুপাত তেমন বেশি নয় আর বিচ্যুতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অনুপাত দ্রুত কমে যায়। 0° সেণ্টিগ্রেডে নির্দিষ্ট ঘনত্বের অক্সিজেনে অণুর পুরো সংখ্যার মধ্যে কেবল ২০%এ সেকেণ্ডে ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার গতিবেগ থাকে। প্রায় অতগুলোরই সেকেণ্ডে ৩০০—৪০০ মিঃ গতিবেগ থাকে। ১৭%এ থাকে সেকেণ্ডে ২০০—৩০০ মিঃ। ৯%র সেকেণ্ডে ৬০০—৭০০ মিঃ। ৮%এ সেকেণ্ডে ৭০০—৮০০ মিঃ। ১%এ সেকেণ্ডে ১,৩০০—১,৪০০ মিঃ। অণুর খুবই ক্ষুদ্র অংশের (১/১০,০০,০০০তম'রও কম) সেকেণ্ডে ৩,৫০০ মিঃ গতিবেগ থাকে — ৬০০ কিঃমিটার ওঠার পক্ষে যা যথেষ্ট। এখন, ৩,৫০০২=২০h, তাই h=১,২২,৫০,০০০: ২০, তার মানে ৬০০ কিঃমিটারের বেশি।

এখন বোঝা গেল পৃথিবীর বুকের শত শত কিলোমিটার উর্ধ্বেও কেন অক্সিজেন কণিকা থাকে। তার মূল হল গ্যাসের পদার্থিক ধর্ম। কিন্তু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বাষ্প আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুর গতিবেগ কখনো একেবারে পৃথিবী ত্যাগ করার মতো জোরাল হয় না। তার জন্য প্রয়োজন সেকেণ্ডে ১১ কিঃমিটার গতিবেগ। উপরোক্ত গ্যাসের কেবল কয়েকটি খাপছাড়া অণুর নিম্নতাপে অত গতিবেগে উঠতে পারে। সেই কারণেই পৃথিবী তার বাতাসের জোব্বাটাকে এত এঁটে ধরে রাখে। হিসাব করে দেখা গেছে, পার্থিব বায়ুমণ্ডলের লঘুতম গ্যাস হাইড্রোজেনের অর্ধেক সঞ্চয় উড়ে যেতে ২৫টা সংখ্যাওয়ালা বছরের প্রয়োজন। আমাদের বাতাসের গঠন আর ভরের কোন বদল ঘটতে হলে কোটি কোটি বছর লাগবে।

এরপর চাঁদ কেন এরকমের বায়ুমণ্ডল রাখতে পারে না তা বোঝাতে আর বেশি কথার দরকার হয় না। চাঁদের অভিকর্ষ হল পৃথিবীর $\frac{১}{৬}$ ভাগ। সেই অনুপাতে তার মাধ্যাকর্ষণ পার হতে কম গতিবেগ লাগে, সেকেণ্ডে ২,৩৬০ মিটার। মাঝামাঝি তাপে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন অণুর গতিবেগ তার বেশি হতে পারে। তাই চাঁদে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হলেও ক্রমাগতই চাঁদ তা হারাবে। দ্রুততম অণুগুলি পালানর ফলে অন্য অণুরাও ঐ ক্রান্তি

গতিবেগ সঞ্চয় করবে (গ্যাসকণিকায় গতিবেগ বণ্টনের যে নিয়ম আছে তার ফল)। তাই আচ্ছাদনকারী বাতাসের কণিকা আরো বেশি পরিমাণে মহাশূন্যে চলে যাবে, তাদের আর পাওয়া যাবে না। যথেষ্ট দীর্ঘ পর্বের পর — ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে সেটা নগণ্য — এমন দুর্বল আকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট জ্যোতিষ্কের বুকের সব হাওয়া বেরিয়ে যাবে।

গণিত দিয়েই প্রমাণ করা যায় যে কোন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অণুদের গড়পড়তা গতিবেগ যদি সীমার একতৃতীয়াংশ হয় (২,৩৬০ : ৩ = ৭৯০ মিঃ/সেকেণ্ড, চাঁদের বেলায়), এ জাতের বায়ুমণ্ডল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। (জ্যোতিষ্ক তার বায়ুমণ্ডল আঁকড়ে থাকে যদি তার অণুদের মধ্য গতিবেগ সর্বোচ্চ হারের এক পঞ্চমাংশ হয়।)

বলা হয়েছে বা স্বপ্ন দেখা হয়েছে যে এককালে মানুষ চাঁদে গিয়ে চাঁদকে কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলে ঢেকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলবে। কিন্তু এতক্ষণ যা বলা হল তার ফলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন এ জাতীয় কাজের উদ্যোগ অসম্ভব। আমাদের উপগ্রহের যে বায়ুমণ্ডল নেই সেটা আকস্মিক বা প্রকৃতির খামখেয়াল নয়, পদার্থিক নিয়মের যুক্তিযুক্ত ফল।

চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তা থেকেই বোঝা যাবে কেন দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট কোন জ্যোতিষ্কে, যেমন গ্রহাণুপুঞ্জ আর অধিকাংশ গ্রহের উপগ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই।*

চাঁদের আকার

সংখ্যা দিয়ে এ বিষয়ে অবশ্য অনেক কিছুই বলা যায়, যেমন চাঁদের ব্যাস (৩,৫০০ কিঃমিটার), তার ভূপৃষ্ঠ আর আয়তন। কিন্তু সংখ্যা হিসাবের পক্ষে অপরিহার্য হলেও মনের চোখে তা চাঁদের আকারের ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এক্ষেত্রে বাস্তব তুলনা অনেক কার্যকরী।

এখানে চাঁদের মহাদেশের সঙ্গে — পুরো চাঁদটাই একটা মহাদেশ — পৃথিবীর মহাদেশগুলির তুলনা করা যাক (৪০ নং ছবি)। চাঁদের পুরো ভূপৃষ্ঠটা পৃথিবীর চৌদ্দভাগের একভাগ এই নির্বস্তুক ধারণার চেয়ে তাতে আমরা অনেক বেশি কথা জানতে পারব। বর্গ কিলোমিটারের হিসাবে চাঁদের ভূপৃষ্ঠ দুটি আমেরিকা মিলিয়ে যতটা তার চেয়ে একটু কম। চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরান, দেখা যায়, সেটা ঠিক দক্ষিণ আমেরিকার সমান।

---

* ১৯৪৮ সালে মস্কোর জ্যোতির্বিদ ইউ. ন. লিপস্কি আপাতভাবে চাঁদে বায়ুমণ্ডলের চিহ্ন ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ভর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভরের ১/১,০০,০০০ ভাগের বেশি হতে পারে না। — সম্পাঃ

পার্থিব জলধির তুলনায় চাঁদের 'সমুদ্রগুলি'র আকার বোঝানর জন্য ৪১ নং ছবিতে চাঁদের মানচিত্রে কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের বহিঃরেখা বসান হয়েছে — সমান মাপে। একনজরেই বোঝা যায় চাঁদের 'সমুদ্রগুলি' খুব বিরাট নয়, যদিও চাঁদের বুকের
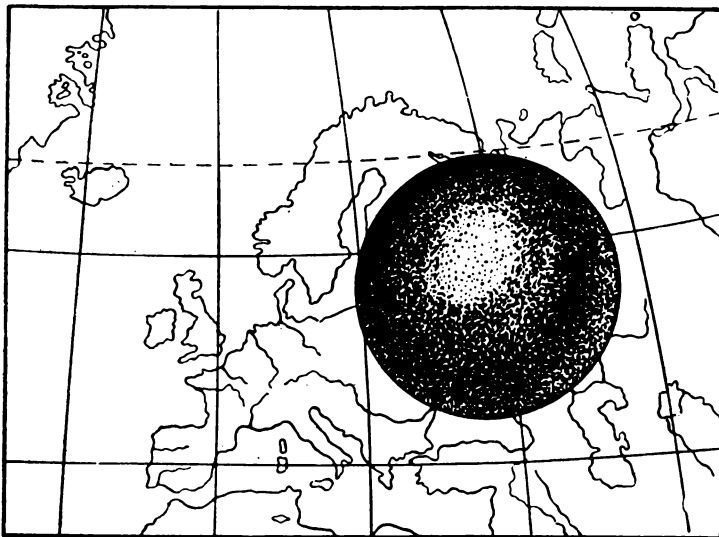
৪০ নং ছবি: ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় চাঁদ। (তার ভূপৃষ্ঠ কিন্তু আয়তনে ইউরোপের চেয়ে কম নয়।)

পক্ষে তারা বেশ বড়। যেমন চাঁদের সেরেনিটাটিস সাগর হল ১,৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, তার মানে কাস্পিয়ান সাগরের চেয়ে প্রায় ২½ গুণ ছোট।

তেমনি আবার চাঁদের গহ্বরগুলি এ জাতীয় যে কোন পার্থিব জিনিসের চেয়ে বহুগুণ বড়। যেমন গ্রিমাল্ডি গহ্বর বৈকাল হ্রদের আয়তনের চেয়েও বড়। তার মধ্যে বেলজিয়াম বা সুইজার্ল্যাণ্ডের মতো একটা ছোটখাট দেশ ধরে যায়।

চাঁদের নিসর্গ দৃশ্য

চাঁদের ভূপৃষ্ঠের বহু ছবি বইয়ে বেরিয়েছে। তাই মনে হয় পাঠকরা চাঁদের বন্ধুরতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত, যেমন (৪২ নং ছবি) 'সার্ক্' (cirques) বা চক্রাকার পাহাড়। কেউ কেউ হয়ত ছোট দূরবীন দিয়ে চাঁদের পাহাড়গুলিও দেখেছেন — ৩ সেঃমিটার লেন্সের দূরবীনও যথেষ্ট।

কিন্তু **খোদ চাঁদের ওপরকার** এক দর্শকের কাছে চাঁদের ভূপৃষ্ঠ কি রকম দেখাবে তার কোন ধারণাই ছবি বা দূরবীন দিতে পারে না। চাঁদের পাহাড়গুলোর কাছে তার জায়গা থেকে দর্শক সবকিছু একেবারে অন্য কোণ থেকে দেখবে। উঁচু জায়গা থেকে দেখা এক

৪১ নং ছবি: চাঁদের সমুদ্রের তুলনায় পৃথিবীর সমুদ্র। কৃষ্ণ সাগর আর কাস্পিয়ান সাগরকে চাঁদে নিয়ে গেলে তারা চাঁদের সব সাগরকে ছাড়িয়ে যেত। (১ — মারে নুবিয়াম, ২ — মারে নুমোরাম, ৩ — মারে ভাপোরাম, ৪ — মারে সেরেনিটাটিস।)

কথা আর কাছ থেকে দেখা একেবারে অন্য কথা। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। পার্থিব দর্শকের কাছে এরাটোস্ফেনস পাহাড়টা 'সার্কের' বা প্রাচীন রোমক মল্লভূমির মতো দেখতে। চূড়াটা তার মাঝখানে। দূরবীনে দেখা যায় পাহাড়টা খাড়া, মোটা মোটা ছায়া থেকে তার খাড়াইটা বেশ ফুটে উঠেছে। তার পার্শ্বচিত্রটা (profile)

দেখা যাক (৪৩ নং ছবি)। দেখা যাবে, তার সার্কের বিরাট ৬০ কিঃমিটার ব্যাসের তুলনায় দেয়াল আর আভ্যন্তরীণ শঙ্কু খুবই নিচু, ঢালগুলোর ফলে তাদের উচ্চতা আরো কমে গিয়েছে। এখন মনে করুন আপনি এই গহ্বরের ভিতরে পাক দিচ্ছেন। ভুলে যাবেন না

৪২ নং ছবি: খাঁটি চান্দ্র বৃত্তাকার পাহাড়।

তার ব্যাস লাদোগা হ্রদ থেকে ফিনল্যান্ড উপসাগরের দূরত্ব যতটা তার সমান। তার দেয়ালগুলোর গোল গড়ন আপনার প্রায় চোখেই পড়বে না। ওদিকে মাটির অবতলতা তার গোড়াটাকে অস্পষ্ট করে তুলবে, কারণ চাঁদের দিগন্ত পৃথিবীর দিগন্তের দ্বিগুণ সংকীর্ণ (কেননা চাঁদের ব্যাস হল পৃথিবীর ব্যাসের এক চতুর্থাংশ)। পৃথিবীতে সাধারণ লম্বা একজন লোক একটা সমতলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ৫ কিঃমিটার দেখতে পায়। তা পাওয়া যায় দিগন্তের দূরত্বের এই সূত্রটি থেকে $D=\sqrt{২Rh}$। D হল কিলোমিটারে দূরত্ব, h কিলোমিটারে চোখের উচ্চতা, R কিলোমিটারে গ্রহের ব্যাসার্ধ।

সূত্রের অক্ষরগুলোকে পৃথিবী আর চাঁদের যথাযথ সংখ্যা দিয়ে বদলে দিলে দেখতে পাই সাধারণ লম্বা একটি লোকের পক্ষে পৃথিবীতে দিগন্তের দূরত্ব হল ৪·৮ কিঃমিটার, আর চাঁদের ২·৫ কিঃমিটার।

৪৪ নং ছবিতে একজন দর্শক চাঁদের মেট্রোপলিটান গহ্বরে কী দেখবে তাই দেখান

হচ্ছে। (যে নিসর্গচিত্র দেখান হয়েছে সেটি চাঁদের আরেকটি বড় গহ্বরের — আর্কিমিডিস।) দিগন্তে পর্বতমালা সজ্জিত এই বিরাট সমতলটি 'চাঁদের গহ্বর' সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ছবির চেয়ে একেবারেই অন্য রকমের নয় কি?
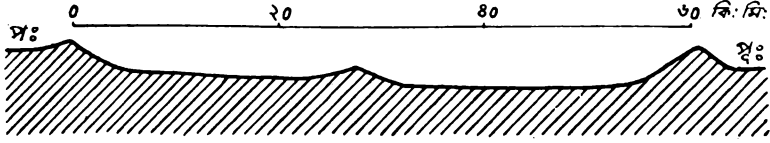
৪৩ নং ছবি: একটি বড় বৃত্তাকার পাহাড়ের পার্শ্বচিত্র।

গহ্বরের অন্য দিকের দেয়ালে উঠে দর্শক আবার অপ্রত্যাশিত কিছু দেখবেন। বাইরের ঢালটা (৪৩ নং ছবি দ্রঃ) এতই কম খাড়া যে দর্শকের চোখে সেটা পাহাড় বলেই মনে হবে না। আসল কথা হল দর্শক পাহাড়শ্রেণীটাকে কখনই গোল গহ্বরবিশিষ্ট
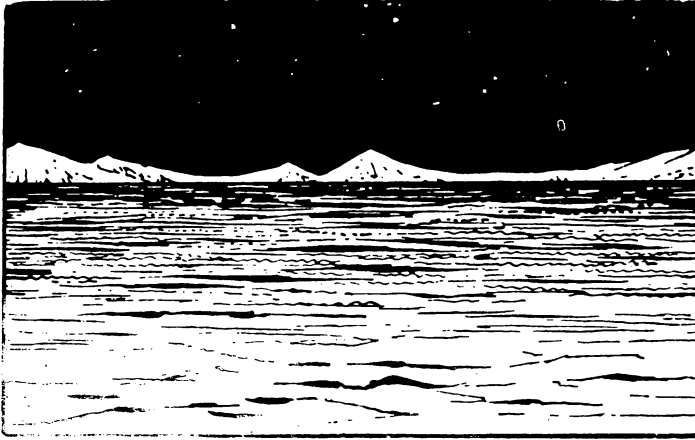
৪৪ নং ছবি: একটি বড় চান্দ্র গহ্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী দেখব।

বৃত্তাকার বলে মনে করবেন না। প্রয়োজনীয় ছবিটা পেতে হলে তাঁকে চূড়াট পার হতে হবে। তখনো, আগেই যেমন বলেছি, উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখতে পাবেন না

বিরাট বিরাট গহ্বর ছাড়াও চাঁদের অজস্র ছোট ছোট সার্ক আছে। তাদের কাছে থেকেও সহজেই দেখা যেতে পারে। তাদের উচ্চতা নগণ্য। সেখানেও দর্শক অসাধারণ

কিছু দেখতে পাবেন না। অপরপক্ষে চাঁদের পাহাড়শ্রেণী — পৃথিবীর পাহাড়শ্রেণীর নামই তারা পেয়েছে, আল্প্‌স্‌, ককেশাস, এপেনাইনস ইত্যাদি — তাদের পার্থিব সঙ্গীদের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দেয়। তারা ৭ থেকে ৮ কিঃমিটার উঁচু। অপেক্ষাকৃত ছোট্ট চাঁদে তাদের চেহারাটা মনে খুবই ছাপ ফেলে।

চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অভাব, আলো ছায়ার তীক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দূরবীনের পর্যবেক্ষণে এক কৌতূহলজনক ভ্রান্তির সৃষ্টি করে: এতটুকু অসমানতাও বড় হয়ে মোটা বন্ধুর রেখায় ফুটে ওঠে। একটা মটরশুঁটিকে আধখানা করে তার গোলদিকটাকে উপরে করে রাখুন। মটরটা দেখতে তো ছোট্টটি, তাই না? কিন্তু তার দীর্ঘ ছায়াটা দেখুন (৪৫ নং ছবি)। পাশের আলোর ফলে চাঁদের বুকে কোনো বস্তুর ছায়া প্রকৃত বস্তুটার চেয়ে ২০ গুণ

৪৫ নং ছবি: পাশ থেকে আলো পড়লে আধখানা মটরেরও লম্বা ছায়া পড়ে।

বেশি লম্বা হতে পারে। সেটা জ্যোতির্বিদদের পক্ষে বরস্বরূপ। কারণ দীর্ঘ ছায়ার ফলে চাঁদের বুকের ৩০ মিঃ উঁচু জিনিসও দূরবীনে দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ওরই ফলে আবার চাঁদের ভূপৃষ্ঠের অসমানতাটা খুব বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। যেমন পিকো চূড়াটা

৪৬ নং ছবি: মাউণ্ট পিকোকে দূরবীনে খাড়া ছুঁচলো পাহাড়ের মতো দেখায়।
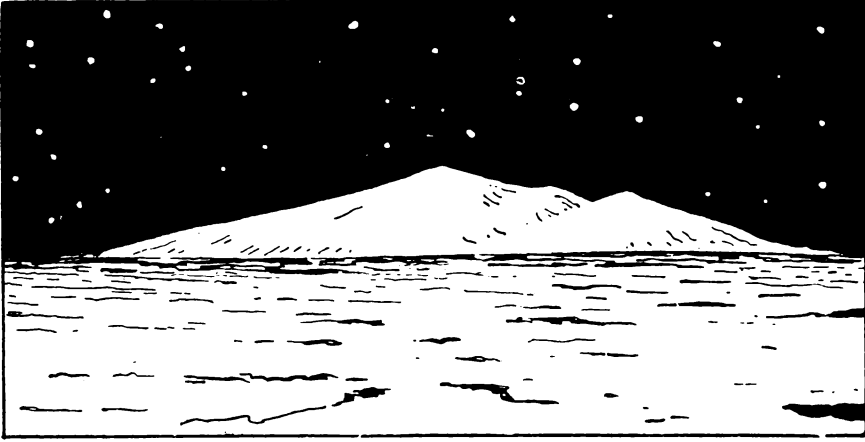
৪৭ নং ছবি: চাঁদের মানুষের কাছে মাউণ্ট পিকো হল ঢালু।

দূরবীনে এমন তীক্ষ্ম বন্ধুর রেখায় ফুটে ওঠে যে আপনা থেকেই সেটাকে খুবই খাড়া খাঁজকাটা চূড়া বলে মনে হয় (৪৬ নং ছবি)। সত্যিই অতীতে চূড়াটার ও-রকম বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাঁদের বুক থেকে তাকে আমরা অন্য রকম দেখব, ৪৭ নং ছবিতে যেমনটি দেখছি।

৪৮ নং ছবি: চাঁদের তথাকথিত 'সোজা দেয়াল' (দূরবীনে যেমন দেখায়)।

তেমনি আবার চাঁদের ভূপৃষ্ঠের অন্য কয়েকটা জিনিস আমরা কমিয়ে দেখি। দূরবীনে ছোট্ট প্রায় অদৃশ্য ফাটল চোখে পড়ে। আপাতভাবে তারা চাঁদের নিসর্গচিত্রের অতি গৌণ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের উপগ্রহের বুকে গেলে দেখতে পাব পায়ের কাছেই দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ান গভীর, অন্ধকার খাদ। আরেকটা উদাহরণ দিই। চাঁদে একধরনের খাড়া তাক আছে, তার সমতলগুলির একটিকে ছেদ করে সেই তাক গেছে। তাকে বলে 'সোজা দেয়াল'। তাকে কোন চার্টে দেখার সময় (৪৮ নং ছবি) ভুলে যাই যে তা ৩০০ মিটার উঁচু। তার গোড়ায় এলে পর তার মহিমান্বিত চেহারায় আমরা অভিভূত হতাম। ৪৯ নং ছবিতে শিল্পী দেয়ালটাকে তার গোড়া থেকে
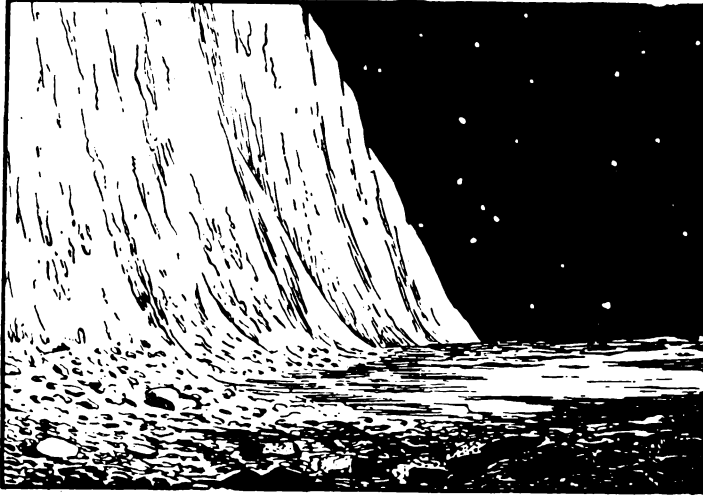
৪৯ নং ছবি: 'সোজা দেয়ালের' নিচে দাঁড়ালে তাকে এরকম দেখাবে।

যেরকম দেখাত সেই ভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার প্রান্ত মিলিয়ে গেছে দিগন্তে, কারণ দেয়ালটা ১০০ কিঃমিটার লম্বা! ঠিক তেমনিই শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে চাঁদের বুকে যে প্রায় অদৃশ্য ফাইল দেখা যায়, আসলে তারা হল বিরাট সব খাদ (৫০ নং ছবি)।

৫০ নং ছবি: চান্দ্র 'ফাটলের' প্রান্তে।

চাঁদের আকাশ

কালো ঢাকনা

পৃথিবীর কোন মানুষ চাঁদে গিয়ে পড়লে তার মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি জিনিসে আকৃষ্ট হবে।

চাঁদের আকাশের অদ্ভুত রং সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে লাগবে। কারণ মাথার উপর সুনীল ঢাকনার বদলে সেখানে রয়েছে উজ্জ্বল রোদ সত্ত্বেও মসীকৃষ্ণ আচ্ছাদন। তাতে দেখা যাবে বিচিত্র তারকারাশি। তাদের সবকটিকেই সোজাসুজি দেখা যায়, কিন্তু একটিও তারা মিটমিট করে না। তার কারণ — বায়ুমণ্ডলের অভাব।

ফ্লামারিওন তাঁর চিত্রল ভাষায় বলেছেন, 'স্বচ্ছ অমল আকাশের সুনীল ঢাকনা, ভোরের কোমল উদ্ভাস আর সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের মহিমময় অগ্নিশিখা, মরুভূমির মন কেড়ে-নেওয়া সৌন্দর্য, কুয়াশা ঢাকা দূরবিস্তৃত মাঠ ও প্রান্তর, আর আপনি, আয়নার মতো হ্রদ — তাতে দূরে নীল আকাশের ছায়া, জল তাদের অনন্তের মতোই গভীর — আপনাদের অস্তিত্ব আর যত সৌন্দর্যের একমাত্র নির্ভর হল ভূগোলকের আচ্ছাদন পাতলা আবরণটি। সেটি না থাকলে থাকত না এই সব ছবি, এই সব বর্ণাঢ্য রং। গভীর নীল আকাশের বদলে ঘিরে থাকত শেষহীন শূন্যের কৃষ্ণতা। মহিমান্বিত সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বদলে দিন হঠাৎ পরিণত হত রাত্রে, কোন ক্রম পরিণতি থাকত না, তেমনি উল্টোটাও ঘটত। চোখধাঁধান সূর্যকিরণ যেখানে সোজাসুজি পড়ে না সেখানকার কোমল আধআলোর বদলে আমাদের দৈনিক ভাস্কর যে জায়গাগুলোতে সরাসরি আলো ফেলত কেবল সে জায়গাগুলিই আলোকিত হত; অন্য সবখানে থাকত ঘন ছায়া।'

বায়ুমণ্ডল অল্প একটু পাতলা হলেই আকাশের নীল ঘন হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যহত সোভিয়েত 'ওসোভিয়াখিম' স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বেলুনের নাবিকরা ২১ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে প্রায় কালো আকাশ দেখেছিলেন। উপরের উদ্ধৃতিতে প্রকৃতির আলোকপাতের যে বর্ণনা রয়েছে তা চাঁদের বেলায় পুরোপুরি সত্যি — তার কালো আকাশ, নেই সকাল সন্ধ্যার গোধূলি, কোন কোন জায়গা অত্যন্ত আলোকিত আবার কোন কোনটি অন্ধকারে মগ্ন, কোন আধো আভা নেই।

চাঁদের আকাশে পৃথিবীটাকে কেমন দেখায়

চাঁদের দৃশ্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জিনিস হবে আকাশবক্ষে পৃথিবীর বিরাট চক্র। পৃথিবীটাকে আমাদের বড় অদ্ভুত মনে হবে। পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে যাবার সময় সে তো যেন আমাদের **নিচে** ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে আমাদের মাথার **উপরে** দেখব।

ব্রহ্মাণ্ডে সব জগতের পক্ষে সাধারণ কোন উপর নিচ নেই। কাজেই যে পৃথিবীকে নিচে ফেলে এসেছিলাম চাঁদে পৌঁছে তাকে মাথার উপরে দেখলে অবাক হবার কিছুই থাকবে না।

চাঁদের আকাশে পৃথিবীর যে চক্রটি ঝোলে তার আকারটি অত্যন্ত বিরাট। তার ব্যাস পৃথিবী থেকে চাঁদের যে ব্যাস দেখা যায় তার প্রায় চার গুণ বড়। চন্দ্রপর্যটকের পক্ষে এই হল তৃতীয় বিস্ময়। চাঁদনী রাতে আমাদের নিসর্গচিত্র যদি ভালোভাবে আলোকিত হয়, তাহলে চাঁদের রাত চাঁদের চেয়ে চৌদ্দ গুণ বড় চক্রবিশিষ্ট পৃথিবীর পূর্ণ আলোক রশ্মিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ভাস্বর বস্তুর উজ্জ্বলতা শুধু তার ব্যাসের উপর নয়, তার বুকের প্রতিফলন ক্ষমতার উপরেও নির্ভরশীল। এই দিক দিয়ে পৃথিবীর বুক চাঁদের বুকের চেয়ে ছগুণ বেশি ক্ষমতাশালী*। কাজেই চাঁদ পৃথিবীকে যতটা আলোকিত করে 'পূর্ণ পৃথিবী' চাঁদকে তার ৯০ গুণ বেশি জোর আলো দেবে। 'পূর্ণ পৃথিবীতে' চাঁদের মানুষ ছোট হরফের লেখাও পড়তে পারবে। পৃথিবী চাঁদের বুকে এত উজ্জ্বল আলো ফেলে যে ৪,০০,০০০ কিঃমিটার দূর থেকে আমরা চাঁদের চন্দ্রচক্রের নিশীথাচ্ছন্ন অংশগুলিকে মিটমিট করতে দেখি। এই হল চাঁদের 'ধূসর আলো'। ৯০টা পূর্ণিমার চাঁদ আর তার সঙ্গে আমাদের উপগ্রহের আবহাওয়ার অভাবটা যোগ করুন তবেই বুঝতে পারবেন 'পার্থিমা'য় আলোকিত চাঁদের নিশীথ দৃশ্যের রূপকথা রাজ্যের সৌন্দর্যটা।

চাঁদের বুকের দর্শক পৃথিবীর চক্রে মহাদেশ আর মহাসমুদ্রগুলির বহিঃরেখাটা দেখতে পাবেন কি? একটা খুবই প্রচলিত ভুল ধারণা হল চাঁদের মানুষের চোখে পৃথিবীটাকে ইস্কুলের ভূগোলকের মতো দেখাবে। অন্ততঃ শিল্পীরা মহাশূন্যের বুকে পৃথিবীকে দেখাতে গিয়ে তার বুকে মহাদেশগুলোর সমোন্নতিরেখা, মেরুর তুষারকিরীট আর অন্যান্য সব খুঁটিনাটি এঁকে থাকেন। এ একেবারেই কল্পিত। দর্শক অমন কিছুই দেখবেন না। পৃথিবীর বুকের অর্ধেকটা যে সাধারণত মেঘের জন্য অস্পষ্ট হয়ে থাকে সে কথা ছেড়ে দিয়েও বলতে হয় আমাদের আবহাওয়াটাই অত্যন্ত বেশি সূর্য রশ্মি বিচ্ছুরিত করে। কাজেই পৃথিবীকে শুক্রের মতো উজ্জ্বল আর পর্যবেক্ষণের বাইরে বলে মনে হবে। জ্যোতির্বিদ গ. তিখোভ এ ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করে বলেছেন, 'মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে সাদাটে আকাশ রঙের একটা চক্র দেখতে পাব, প্রকৃত ভূপৃষ্ঠের কোন খুঁটিনাটি প্রায় চোখেই পড়বে না। পৃথিবীতে যে সূর্যালোক পড়ে তার অধিকাংশই

---

* তাই চাঁদের মাটি সাদা নয়, সাধারণত যা মনে করা হয়। বরং কালো বলাটাই বেশি ঠিক। অবশ্য চাঁদের মাটি যে সাদা আলো দেয় তাতে একথা ভুল প্রমাণ হয় না। 'কালো জিনিস থেকে প্রতিফলিত হলেও সূর্যের রোদ সাদাই থাকে। চাঁদকে যদি ঘোরকৃষ্ণ মখমল দিয়ে মোড়া হত তবু তার রূপোলি চক্র দেখা যেত,' একথা টিনডাল তাঁর আলো সম্পর্কিত বইয়ে বলেছেন। চাঁদের মাটির সৌররশ্মি বিচ্ছুরণের ক্ষমতা গড়ে কালচে আগ্নেয়গিরি শিলার বিচ্ছুরণ ক্ষমতার সমান।

তার সবরকম সংমিশ্রণ নিয়ে পৃথিবীর বুকে পৌঁছনর আগেই আবহাওয়ায় বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। আর তার বুক থেকে যে অংশটা প্রতিফলিত হয় তাও আবহাওয়ার পরবর্তী বিচ্ছুরণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।'

তাই চাঁদ তার ভূপৃষ্ঠের খুঁটিনাটি ভাল করে দেখালেও পৃথিবী চাঁদের কাছে, সারা বিশ্বের কাছেই তার মুখ লুকিয়ে রাখে আবহাওয়ার আলোকিত ঘোমটার আড়ালে।

চাঁদে আর পৃথিবীতে ঐটেই একমাত্র পার্থক্য নয়। আমাদের আকাশে চাঁদ ওঠে ডোবে তারার পুরো চাঁদোয়াটা সঙ্গে নিয়ে। পৃথিবী কিন্তু চাঁদের আকাশে তা করে না। সেখানে সে ওঠেও না ডোবেও না। আর সেখানে তারাদের অত্যন্ত মন্থর শোভাযাত্রায় কোনই অংশ নেয় না। সে আকাশে সে প্রায় স্থাণু হয়েই ভেসে থাকে। চাঁদের এক একটা অংশ থেকে একই নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে দেখা যাবে। তারারা ওদিকে ধীরে ধীরে **তার পিছন দিয়ে ভেসে যায়।** এর কারণ আগে চাঁদের গতির যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই। তার মূল কথাটা হল চাঁদ সবসময় পৃথিবীর দিকে তার একটি মুখই ফিরিয়ে রাখে। চাঁদের বুকের দর্শকের কাছে পৃথিবীটাকে প্রায় আকাশের এক জায়গায় আটকান বলে মনে হবে। যেমন পৃথিবী যদি কোন চান্দ্র গহ্বরের সুবিন্দুতে আটকে থাকে তবে সে আর সে জায়গা ছেড়ে নড়বে না। তাকে দিগন্তে দেখা গেলেই সেখানেই সে চিরকালের মতো থেকে যাবে। এই স্থাণুত্বের কিছু বাধা ঘটায় পূর্বোক্ত চান্দ্র লিব্রেশন। তারকাখচিত নভমণ্ডল পৃথিবীর চক্রের পিছন দিয়ে ধীরে ধীরে ২৭⅓ দিনে আবর্তিত হয়, সূর্য আকাশ পার হয় ২৯½ দিনে, গ্রহগুলোরও ও-রকমেরই গতি থাকে, কেবল কালো আকাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পৃথিবী।

কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও পৃথিবী দ্রুতবেগে ২৪ ঘণ্টার অক্ষাবর্তন সেরে নেয়। আমাদের বায়ুমণ্ডল যদি স্বচ্ছ হত তাহলে ভাবী মহাজাগতিক জাহাজের যাত্রীরা পৃথিবী দেখেই তাঁদের ঘড়ি ভাল করে মিলিয়ে নিতে পারতেন। তাছাড়া আমাদের আকাশে আমরা চাঁদের যে সব কলা দেখি ঠিক সেরকমের কলা পৃথিবীরও আছে। কাজেই পৃথিবী চাঁদের আকাশে সবসময় পুরো চাকার মতো জ্বলে না: কখনো তা অর্ধবৃত্ত থাকে, কখনো মোটা বা সরু ফালি, কখনো অপূর্ণ বৃত্ত, চাঁদের দিকে তার সূর্যালোকিত গোলার্ধ কতটা ফেরান তার উপর তা নির্ভর করে। সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানটা ছকে নিয়ে একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীর কলা আর চাঁদের কলা একে অন্যের **বিপরীত।**

আমরা যখন পৃথিবীতে শুক্লপক্ষে প্রতিপদের চাঁদ দেখি, চাঁদের মানুষ তখন পৃথিবীর পুরো চক্রটা দেখে, 'পূর্ণ পৃথিবী'। তেমনি আবার আমরা যখন পূর্ণিমা দেখি অন্যজন তখন শুক্লপক্ষে প্রতিপদের পৃথিবী দেখে (৫১ নং ছবি)। শুক্লপক্ষে আমরা যখন

প্রতিপদের চাঁদের সরু ফালিটা দেখি চাঁদের মানুষ তখন কৃষ্ণপক্ষে পৃথিবীর ক্ষয় দেখে। তাতে সে মুহূর্তে চাঁদের যে ফালিটুকু দেখছি সেরকম ফালিরই অভাব থাকে। এখানে বলি, পৃথিবীর কলা চাঁদের মতো অমন হঠাৎ বদলে যায় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আলো-অন্ধকার সীমারেখাটা মুছে দিয়ে আলো-অন্ধকারের এমন একটা ক্রমোৎক্রমণ সৃষ্টি করে যা আমরা এখানে দেখি গোধূলিতে।
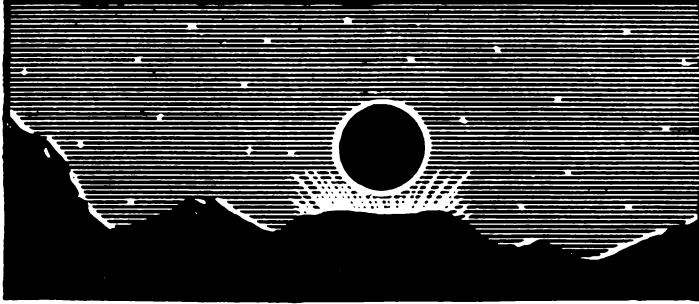
৫১ নং ছবি: চাঁদে 'শুক্লপক্ষের পৃথিবী'। পৃথিবীর কালো চক্রের চারধারে দীপ্ত বায়ুমণ্ডলের উজ্জ্বল ঘের।

পৃথিবীর আর চাঁদের কলায় আরো তফাৎ আছে। পৃথিবী থেকে আমরা কখনো সত্যিকার শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দেখতে পাই না। অবশ্য এক্ষেত্রে চাঁদ সাধারণত থাকে সূর্যের ঊর্ধ্বে বা নিচে, একেক সময় প্রায় ৫° পর্যন্ত তফাতে, তার মানে, তার ব্যাসের ১০ গুণ দূরে, ফলে চাঁদের সূর্যালোকিত অংশটা দেখা যেতে পারত। তবু তা যে চোখে ধরা পড়ে না তার কারণ সূর্যের ঔজ্জ্বল্য রুপোলি সুতোর মতো প্রতিপদের চাঁদের স্বল্প ছটা ঢেকে দেয়। শুক্লপক্ষের চাঁদ দুদিনের পুরনো হলে তবে তাকে আমরা দেখতে পাই। তার মানে যখন সে সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে। মাঝেমাঝে দুর্লভ ক্ষণে, বসন্তে, তার যখন একদিন বয়স হয় তখনই তাকে দেখতে পারি। চাঁদ থেকে আমরা যদি শুক্লপক্ষে প্রতিপদের পৃথিবীকে দেখতাম তবে কিন্তু এমনটা দেখতে পেতাম না। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হত না, আর আমাদের আহ্নিক ভাস্করের চারদিকে সাধারণত যে ছটা দেখা যায় তাও থাকত না। সেখানে তারা আর গ্রহরা সূর্যের আলোয় হারিয়ে যায় না। তারা আকাশের গায়ে পরিষ্কার ফুটে থাকে সূর্যের একেবারে কাছেই। কাজেই পৃথিবী যতক্ষণ সরাসরি সূর্যের সামনে (অর্থাৎ ঠিক গ্রহণের সময় নয়, তার কিছু উপরে বা নিচে) আসছে না ততক্ষণ তাকে সর্বদাই আমাদের উপগ্রহের কালো তারাখচিত আকাশে দেখা যাবে। তার
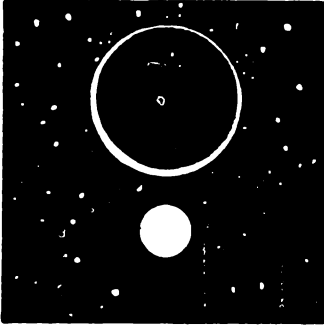
৫২ নং ছবি: চাঁদের আকাশে 'শুক্লপক্ষের' পৃথিবী। প্রতিপদের পৃথিবীর নিচের সাদা চক্রটা হল সূর্য।

আকারটা সরু বাঁকা মাকড়ির মতো চূড়াদুটো সূর্যের দিক থেকে ফেরান (৫২ নং ছবি)। পৃথিবী সূর্য থেকে যত বাঁয়ে সরবে, বাঁকা ফালিটাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

এ-রকম ঘটনা ছোট দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখার সময়েও চোখে পড়বে। পূর্ণিমার সময় আমরা আমাদের রাত্রের এই জ্যোতিষ্কের পুরো চক্রটা দেখি না। চাঁদ আর সূর্যের কেন্দ্রদুটি দর্শকের চোখের সঙ্গে সরল রেখায় নেই। তাই চাঁদের চক্রে একটা সরু ফালির অভাব থেকে যায়। চাঁদ যত ডাইনে সরে, সেই ফালিটুকু ততই অন্ধকার পোঁচের মতো আলোকিত চক্রের ধার ধরে বাঁয়ে সরে যাবে। পৃথিবী আর চাঁদের কলা সর্বদাই বিপরীত বলে উল্টো উল্টো কলা দেখায়; সে মুহূর্তে চাঁদের দর্শক শুক্লপক্ষে 'প্রতিপদের পৃথিবীর' সরু বাঁকা ফালিটুকু দেখতে পাবেন।

আগে আমরা বলেছি চাঁদের লিব্রেশনের একটি ফল হল যে পৃথিবী চাঁদের আকাশে একেবারে স্থাণু হয়ে থাকে না। মধ্যাবস্থান থেকে সে উত্তর-দক্ষিণে ১৪° সরে যায়, আর পশ্চিম-পূবে ১৬°। চাঁদের যে সব জায়গা থেকে পৃথিবীকে দিগন্তের কাছাকাছি দেখা যায়, সেখানে মনে হবে যেন পৃথিবী ডুবছে আর উঠছে কতগুলো অদ্ভুত বাঁকা রেখায় (৫৩ নং ছবি)। আকাশ প্রদক্ষিণ না করেও দিগন্তের একটা বাঁধাধরা জায়গায় পৃথিবীর এই অদ্ভুত উদয় ও অস্ত বহু পার্থিব দিন ধরে চলতে পারে।

চাঁদে গ্রহণ

চাঁদের আকাশের ছবিতে এখন জ্যোতিষ্করাজ্যে **গ্রহণ** নামে যে ঘটনাটা পরিচিত তার কথা বলব। চাঁদে দু রকমের গ্রহণ হয় সৌর আর 'পার্থিব'। প্রথম গ্রহণটি পরিচিত সূর্যগ্রহণের মতো নয়, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা যখন পৃথিবীতে চন্দ্রগ্রহণ দেখি চাঁদে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। পৃথিবী তখন সূর্য আর চাঁদের কেন্দ্রদুটিকে যুক্ত করে একটা সরল রেখায় এসে যায়। আর তখন আমাদের উপগ্রহটি পৃথিবীর ছায়ায় ঢেকে যায়। এই গ্রহণের চাঁদকে যে দেখেছে সেই বলবে যে চাঁদে তখনো কিছু আলো থাকে, একেবারে অদৃশ্যও তা হয় না। এক ধরনের চেরী-লাল রঙ দেখা যায় চাঁদে, পৃথিবীর ছায়ার শঙ্কুতে সে আলো এসে পেঁছয়। এই মুহূর্তে আমরা যদি চাঁদের বুকে গিয়ে পৃথিবীর দিকে
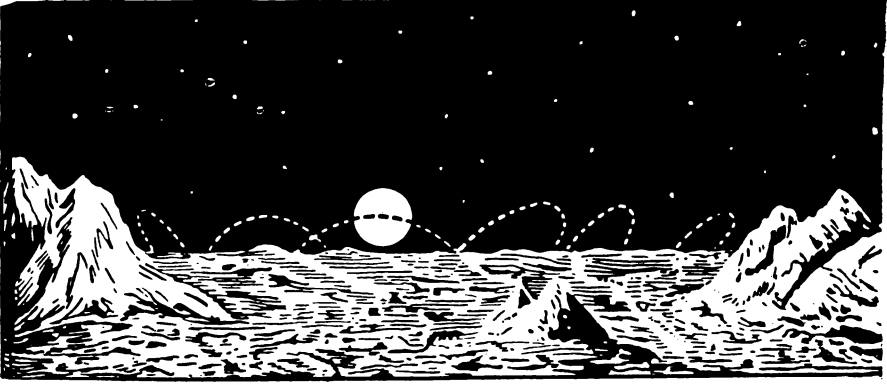
৫৩ নং ছবি: লিব্রেশনের ফলে চাঁদের দিগন্তের কাছে পৃথিবীর মন্থর গতি। ফোঁটার রেখাগুলো হল পৃথিবীচক্রের কেন্দ্রের গতিপথ।

তাকাতাম তাহলে সহজেই এই লাল আলোটির কারণ ধরতে পারতাম। চাঁদের আকাশে পৃথিবী একটা উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষুদ্রতর সূর্যের সামনে রয়েছে বলে তাকে লালচে আবহাওয়ার পাড়ে মোড়া একটা কালো চাকার মতো দেখাবে। এই পাড়টাই ছায়া ঢাকা চাঁদে লালচে আলো ফেলে (৫৪ নং ছবি)।

চাঁদে সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর মতো কয়েক মিনিটের ব্যাপার নয়। সেখানে তা চার ঘণ্টারও বেশিক্ষণ থাকে। আমাদের চন্দ্রগ্রহণের মতোই তা দীর্ঘ। কারণ আসলে তা চন্দ্রগ্রহণই, কেবল তাকে পৃথিবী থেকে না দেখে চাঁদ থেকে দেখা হচ্ছে।
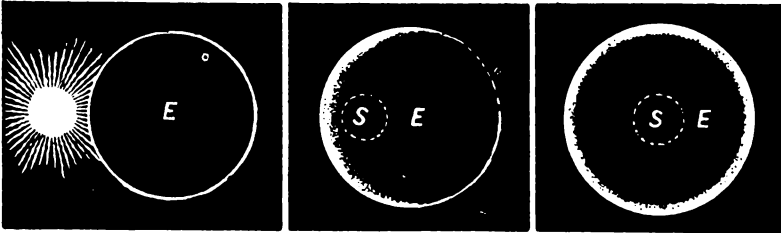
৫৪ নং ছবি: চাঁদ থেকে দৃষ্ট সূর্যগ্রহণ। S সূর্য ক্রমশ E পৃথিবীর চক্রের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। পৃথিবী চাঁদের আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

চাঁদ থেকে দেখা 'পৃথিবী'র গ্রহণ এতই সামান্য যে তার গ্রহণ নাম দেওয়াই চলে না। এ গ্রহণ দেখা দেয় পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময়। চাঁদের মানুষ তখন পৃথিবীর বিরাট চাকাটার গায়ে একটা ছোট্ট কালো বৃত্ত দেখবে। তখন পৃথিবীর যে সব ভাগ্যমন্ত জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, সে বৃত্ত সেই সব জায়গা দিয়েই যাবে।

একথা খেয়াল রাখতে হবে যে সূর্যগ্রহণের মতো গ্রহণ গ্রহ পরিবারের আর কোথাও থেকে দেখা যায় না। এই বিশেষ দৃশ্যটির জন্য আমরা একটি আকস্মিক ঘটনার কাছে ঋণী। সূর্য ও আমাদের মাঝখানে যে চাঁদ এসে পড়ে তার ব্যাস সূর্যের চেয়ে যতগুণ ছোট, পৃথিবী থেকে সে সূর্যের তুলনায় ঠিক ততগুণ কাছে আসে। এমন ঘটনা অন্য কোন গ্রহের বেলায় ঘটে না।

জ্যোতির্বিদরা কেন গ্রহণ দেখেন?

এক্ষুণি যে আকস্মিক ঘটনাটার কথা বলা হল তার ফলে আমাদের উপগ্রহের সদাসঙ্গী ছায়ার লম্বা শংকুটি পৃথিবীর বুক ছুঁতে পারে (৫৫ নং ছবি)। আসলে চাঁদের ছায়ার শঙ্কুর **মধ্য** দৈর্ঘ্য চাঁদ আর পৃথিবীর **মধ্য** দূরত্বের চেয়ে কম। আমরা যদি কেবল মধ্য পরিমাণ নিয়েই কারবার করতাম তাহলে কখনোই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখতাম না। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটে কেবল চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একটি উপবৃত্তের পথে চলে বলে আর সে পথ একেক জায়গায় অন্য জায়গার তুলনায় পৃথিবীর ৪২,২০০ কিঃমিটার কাছে এসে যায়। চাঁদ ৩,৫৬,৯০০ থেকে ৩,৯৯,১০০ কিঃমিটার দূরত্বে এসে যেতে পারে।

পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেতে যেতে চাঁদের ছায়ার পুচ্ছভাগটা 'যে সব জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দৃষ্টিগোচর' তা ফালির মতো টেনে দিয়ে যায়। সে ফালিটুকু কখনোই ৩০০ কিঃমিটারের বেশি চওড়া হয় না। তাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখতে পায় এমন ভাগ্যমন্ত জায়গা কিছু পরিমাণে সীমিত। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্বটা যোগ করুন (সেটা কয়েক মিনিটের ব্যাপার, আট মিনিটের বেশি কখনোই থাকে না), দেখবেন পূর্ণ সূর্যগ্রহণটা খুবই দুর্লভ ঘটনা। পৃথিবীর কোন একটি জায়গার পক্ষে ২০০—৩০০ বছরে একবার মাত্র ঘটে।

এই কারণেই জ্যোতির্বিদরা সূর্যগ্রহণকে সত্যি সত্যিই তাড়া করে বেড়ান। যেখানে তা দেখা যাবে সেখানে বিশেষ অভিযাত্রীদল পাঠান হয়, তা সে যত দূরেই হোক না কেন। ১৯৩৬ সালের সূর্যগ্রহণকে (১৯শে জুন) একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের চৌহদ্দির মধ্যে পূর্ণ গ্রহণ হিসেবে দেখা গিয়েছিল। দু মিনিট ধরে দেখার জন্য দশটি দেশের সত্তর জন বিজ্ঞানী আমাদের দেশে আসাটা লাভজনক মনে করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি অভিযানের

পরিশ্রম ব্যর্থ হয় মেঘলা দিনের ফলে। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত বিরাট আকারে পর্যবেক্ষণ চালান — পূর্ণ গ্রহণের জায়গায় ৩০টি অভিযান চলে।

১৯৪১ সালে যুদ্ধ সত্ত্বেও সোভিয়েত সরকার বহু অভিযানের ব্যবস্থা করে। সেই অভিযাত্রীদলগুলি পূর্ণ গ্রহণের এলাকা লাদোগা হ্রদ থেকে আলমা-আতার সীমানা জুড়ে
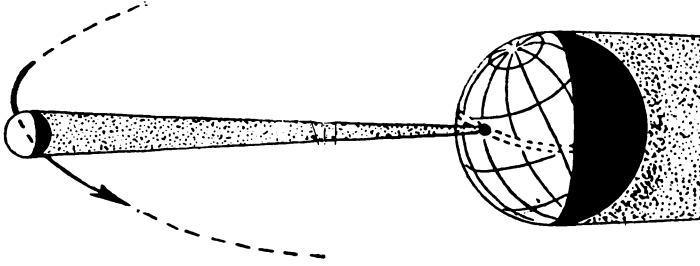
৫৫ নং ছবি: চাঁদের প্রচ্ছায়ার পুচ্ছটুকু পৃথিবীর বুকের ছায়াপথটি এ'কে দিয়ে চলেছে। ঐ অঞ্চলেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

ঘাঁটি গাড়ে। ১৯৪৭ সালে ব্রেজিলে ২০শে মের পূর্ণ গ্রহণ দেখার জন্য সোভিয়েত অভিযাত্রীদল ব্রেজিল যায়। ১৯৫২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ সালের ৩০শে জুন আর ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাট আকারেই চলে।

যদিও প্রতি তিনটি সূর্যগ্রহণে চন্দ্রগ্রহণ হয় দুটি তবু চন্দ্রগ্রহণ অনেক বেশি করে **দেখা যায়**। এই আপাত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অদ্ভুতত্বের একটি সহজ ব্যাখ্যা আছে।

আমাদের গ্রহের যে সীমিত অঞ্চলে সূর্য চাঁদের দ্বারা ঢাকা পড়ে কেবল সেখানেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। এই সংকীর্ণ এলাকার সীমানার মধ্যে কোথাও কোথাও পূর্ণ গ্রহণ দেখা যায় অন্যত্র আংশিক গ্রহণ (তার মানে সূর্য অংশত ঢাকা পড়ে)। এই ছায়াঞ্চলের নানা জায়গায় সূর্যগ্রহণের সময়টা এক নয়। তার কারণ সময় মাপের পার্থক্য নয়। পৃথিবীর বুক পার হবার সময় চাঁদের প্রচ্ছায়া একেক জায়গাকে একেক সময় ঢেকে দেয়।

চন্দ্রগ্রহণ একেবারেই অন্য জিনিস। একটা নির্দিষ্ট সময়ে পুরো গোলার্ধের যেখান থেকে চাঁদকে দেখা যায় সে সব জায়গাতেই একই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। চন্দ্রগ্রহণের ধারাবাহিক পর্বগুলি একই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে দেখা দেয়। তফাৎ হয় কেবল নানা জায়গার সময়ের মাপে।

তাই জ্যোতির্বিদদের চন্দ্রগ্রহণকে 'তাড়া' করে বেড়ানর কোন দরকার হয় না। চন্দ্রগ্রহণ আপনিই আসে। সূর্যগ্রহণকে 'ধরার' জন্য কিন্তু কখনো কখনো বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হয়। অমন ফুস করতেই শেষ গোছের পর্যবেক্ষণের জন্য এত পয়সা খরচাটা কি লাভজনক? চাঁদ কবে সূর্যকে ঢেকে দেবে সেই আকস্মিক ঘটনার জন্য বসে না থেকে এই পর্যবেক্ষণ কি চালান যায় না? সূর্য আর দূরবীনের মধ্যে একটা অনচ্ছ চক্র বসিয়ে জ্যোতির্বিদরা কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ করলেই তো পারেন? তবে তো তেমন কোন হাঙ্গামা না করেই সূর্যের প্রত্যন্ত অংশগুলি দেখা যেতে পারে। গ্রহণের সময় জ্যোতির্বিদরা ঐ অংশগুলিতেই অত্যন্ত কৌতূহলী হন।

কিন্তু চাঁদের দ্বারা সৃষ্ট সূর্যগ্রহণের সময় যে ফল পাওয়া যায় মানুষের বানান সূর্যগ্রহণ তা দিতে পারবে না। ব্যাপার হল, সূর্যরশ্মি দৃষ্টির আওতায় আসার আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়, আর সেখানে তারা বায়ুকণিকার ফলে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। তাই দিনের বেলায় আমরা আকাশটাকে একটা ফ্যাকাশে নীল গম্বুজের মতো দেখি। আবহাওয়া না থাকলে দিনের বেলায়ও যে তারাখচিত কালো চাঁদোয়া দেখতে পেতাম তা দেখা যায় না। সূর্যকে ঢেকে দিলে আমরা বায়ুসমুদ্রের তলেই থেকে যাব। আমাদের প্রতিদিনের ভাস্করের সরাসরি আসা আলোক কিরণগুলোর হাত থেকে চোখকে আড়াল করলেও মাথার উপর যে বায়ুমণ্ডল থেকে যায় তা তখনো সূর্যের আলোয় ভরে থাকে আর রশ্মিগুলোকে বিচ্ছুরিত করে। এভাবে তারাগুলোকে নিভিয়ে দেয়। পর্দাটা যদি বায়ুমণ্ডলের বাইরে থাকত তবে এ-রকমটা ঘটত না। চাঁদ একদিক দিয়ে বলতে গেলে এ-রকমেরই পর্দা, পৃথিবী থেকে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব সীমার চাইতে হাজার গুণ দূরে। সূর্য রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে চাঁদ তাদের সামনে একটা বাধার কাজ করে। তাই প্রচ্ছায়াচ্ছন্ন পথে আলো কোনভাবেই বিচ্ছুরিত হয় না। অবশ্য পুরোপুরি তা নয়। কারণ কোন কোন রশ্মি পরিপার্শ্বের আলোকিত এলাকার ফলে বিচ্ছুরিত হয়ে ছায়া এলাকায় ঢুকে পড়ে। সেই কারণেই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় আকাশটা মাঝরাত্রের মতো অন্ধকার হয় না। উজ্জ্বলতম তারাগুলোকে কেবল দেখা যায়।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার সময় জ্যোতির্বিদরা কী পেতে চান?

প্রথমত, তাঁরা সূর্যের বাইরের স্তরে বর্ণালী রেখাগুলির তথাকথিত 'রূপান্তর' ধরতে চান। চাঁদের চক্র সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেবার পর অন্ধকার পটভূমির বুকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চমকে ওঠে সৌর বর্ণালীর রেখাগুলি — বর্ণালীর উজ্জ্বল এলাকার পটভূমিতে তাদের সাধারণত অন্ধকার দেখায়। শোষণের বর্ণালী হয়ে ওঠে বিকিরণ বর্ণালী — 'ঝলক বর্ণালী'। এই ঘটনা সূর্যের বাইরের স্তর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য দেয়। শুধু গ্রহণের সময়েই নয়, কিছু কিছু নির্দিষ্ট অবস্থায় তা অন্য সময়েও দেখা যেতে

পারে বটে। তবু সূর্যগ্রহণের সময় তা এতই পরিষ্কার চোখে পড়ে যে জ্যোতির্বিদরা এমন একটা শুভক্ষণকে হেলায় হারাতে চান না।

সৌরমুকুট অধ্যয়ন হল দ্বিতীয় লক্ষ্য। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় যা কিছু দেখা যায় তার মধ্যে সৌরমুকুট হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলীর আকার ও চেহারা এক একটা গ্রহণের সময় একেক রকম, চাঁদের একেবারে কালো চক্রটাকে অগ্নিময় উদ্গতাংশ বা উচ্চাংশ দিয়ে তা ঘিরে রাখে (৫৬ নং ছবি)। তার শিখাগুলি প্রায়ই সূর্যের ব্যাসের চেয়ে কয়েকগুণ বড় হয় আর সাধারণত তাদের ঔজ্জ্বল্য হল পূর্ণিমা চাঁদের অর্ধেক।
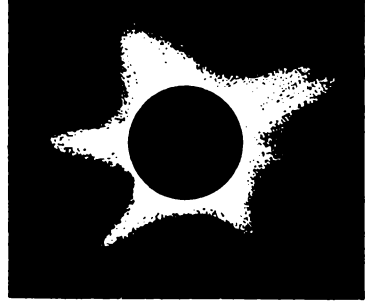
৫৬ নং ছবি: পূর্ণ গ্রহণ হলে পর 'সৌরমুকুট' চাঁদের চক্রের আড়াল থেকে দেখা দেয়।

১৯৩৬ সালের গ্রহণে অত্যধিক উজ্জ্বল সৌরমুকুট দেখা গিয়েছিল, পূর্ণিমার চেয়েও উজ্জ্বল। এ ঘটনা দুর্লভ। কিছুটা ল্যাপাপোঁছা গোছের শিখাগুলো সূর্যের ব্যাসের তিনগুণেরও বেশি ছিল। পুরো সৌরমুকুটটাকে দেখায় পাঁচমুখী তারার মতো, চাঁদের অন্ধকার চক্রটা তার মাঝখানে।

সৌরমুকুটের প্রকৃতির পুরো ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। গ্রহণের সময় জ্যোতির্বিদরা মুকুটের ছবি তোলেন, তার ঔজ্জ্বল্য মাপের আর তার বর্ণালী নিয়ে অনুসন্ধান চালান। এসবের সাহায্যেই তার পদার্থিক গঠনের অধ্যয়ন চলে।

তৃতীয় লক্ষ্যটা দেখা দিয়েছে গত কয়েক দশকে। তা হল আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ফলাফল যাচাই করা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্যকে পার হয়ে যে নক্ষত্ররশ্মি যায় তারা সূর্যের প্রবল আকর্ষণে কিছুটা পথচ্যুত হয়, সূর্যচক্রের নিকটবর্তী এলাকায় তারাদের আপাত অবস্থান-চ্যুতিতে (stellar shift) তা ধরা পড়া উচিত (৫৭ নং ছবি)। তা যাচাই করা সম্ভব একমাত্র পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়।

একেবারে সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯১৯, ১৯২২, ১৯২৬ আর ১৯৩৬ সালের গ্রহণকালের মাপজোক উল্লেখযোগ্য কোন ফল দেয়নি। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী এই অবস্থান-চ্যুতির বাস্তব সমর্থন এখনো বাকি।*

---

* পথচ্যুতি যে সত্যিই ঘটে তা প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে এই তত্ত্বের এখনো পুরো প্রমাণ মেলেনি। অধ্যাপক আ. মিখাইলভের পর্যবেক্ষণ এই তত্ত্বের কোন কোন দিকের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন ঘটিয়েছে।

এই সব কারণেই জ্যোতির্বিদরা তাঁদের মানমন্দির ছেড়ে বহুদূরে, একেক সময় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় সূর্যগ্রহণ দেখে থাকেন।

সূর্যগ্রহণ সত্যি কেমন দেখায় তার একটি চমৎকার বর্ণনা আছে করোলেঙ্কোর 'গ্রহণে' — ১৮৮৭ সালের ১৮ই আগস্ট যে গ্রহণ হয়েছিল এটি তার বিবরণী। এই গ্রহণ দেখা গিয়েছিল ভল্‌গাতীরের ইউরিয়েভেৎস সহরে। করোলেঙ্কোর গল্পটি থেকে একটু তুলে দিচ্ছি:
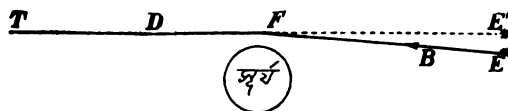
৫৭ নং ছবি: আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের একটি ফল — সূর্যের অভিকর্ষের ফলে আলোর বিক্ষেপ। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর দর্শক T বিন্দুতে দাঁড়িয়ে E′ তারাটিকে TDFE′ সরল রেখায় দেখবে, আসলে কিন্তু তারাটা রয়েছে E বিন্দুতে আর তার কিরণ পাঠাচ্ছে EBFDT বাঁকা রেখায়। সূর্য না থাকলে পৃথিবী T'র দিকে E তারা থেকে আসা কিরণ আসত ET সরলরেখায়।

'সূর্য মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছ আলোর বিরাট পর্দায় ডুবে গিয়ে আবার বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে, তখন সে স্পষ্টতই ক্ষীয়মাণ...

'বাতাসে স্বল্প বাষ্প এখনো আছে আর তা চোখধাঁধানো ছটা আরো কমিয়ে তুলেছে তাই সূর্যকে এখন খালি চোখেও দেখা যায়।

'নিস্তব্ধতা। কেবল এখানে ওখানে শোনা যাচ্ছে দ্রুত গভীর নিশ্বাসের শব্দ...

'আধ ঘণ্টা গেল। দিনটা বরাবরের মতোই উজ্জ্বল; মেঘ সূর্যকে কখনো ঢেকে দিচ্ছে কখনো প্রকাশ করছে। সূর্য বাঁকা ফালির মতো আকাশে ভাসছে।

'অল্প বয়সীরা অত্যন্ত উত্তেজিত ও কৌতূহলী।

'পক্ক শ্মশ্রুরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, বৃদ্ধারা পাগলের মতো ফোঁপাচ্ছে, তারা কেউ কেউ চীৎকার ও কাতরোক্তি জুড়েছে, যেন দাঁতব্যথায়।

'দিনের আলো স্পষ্টতই কমে আসছে। সবার মুখে ভয়ের ছাপ। মাটিতে মানুষের ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়া। ভাঁটির দিকে একটা স্টীমার চলেছে ছায়ার মতো। সে যেন হালকা হয়ে গেছে, রংগুলো ল্যাপাপোঁছা। আলোয় ভাঁটির টান, কিন্তু সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেই, নেই বায়ুমণ্ডলের নিচু স্তরে প্রতিফলিত আলোর খেলা। এ এক অদ্ভুত ছমছমে গোধূলি।

নিসর্গ যেন কিসে গলে মিশে গেছে। ঘাসেরা ঘুচিয়ে দিয়েছে তাদের শ্যামলিমা, পাহাড়েরা যেন হারিয়ে ফেলেছে তাদের গুরুভার ঘনত্ব।

'কিন্তু যতক্ষণ সূর্যের ক্ষীণ কলাটুকু থাকে ততক্ষণ অত্যন্ত ম্লান দিনের ভাবটাও রয়ে যায় আর আমার মনে হয় গ্রহণকালীন অন্ধকারের কাহিনী অতিশয়োক্তি। "সূর্যের এই ছোট্ট কণিকাটুকু, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে জ্বলছে দীপশিখাটির মতো -- তার কি এত তাৎপর্য থাকতে পারে?.." মনে মনে ভাবি, "এটি চলে গেলেই কি হঠাৎ এসে পড়বে রাত?"

'কিন্তু এখন সেই শেষ কণিকাটুকু গেছে মিলিয়ে। হঠাৎ তা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, যেন জোর করে নিজের অস্তিত্বকে টুকরো টুকরো করে দিল। সোনালি বৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই গেল মিলিয়ে। অন্ধকার গিলে ফেলল পৃথিবীকে। গোধূলি আর দ্রুত নেমে আসা অন্ধকারের মাঝখানের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তটিকে ধরতে পেরেছিলাম। সে অন্ধকার দেখা দিল দক্ষিণে তারপর বিরাট এক শবাচ্ছাদনের মতো দ্রুত ঢেকে ফেলল পাহাড় নদী প্রান্তর। আকাশের বিস্তৃতিকে ঘিরে ফেলে আমাদের দিল মুড়ে। মুহূর্তের মধ্যে মিলে গেল উত্তরের সঙ্গে। নিচু তীরে দাঁড়িয়ে আমি জনতার দিকে তাকিয়ে আছি। চারিদিকে কবরখানার স্তব্ধতা... মানুষের শরীর ডুবে গেছে ঘন অন্ধকারে...

'কিন্তু এ সাধারণ রাত্রি নয়। সে এতই ফিকে যে চোখ আপনা থেকেই সাধারণ রাতের অনচ্ছ নীলিমাকে ভেদ করে যে রুপোলি চাঁদনী তাকে খুঁজে ফেরে। কিন্তু কোন জ্যোতি বা অনচ্ছ নীলিমা কোথাও নেই। মনে হচ্ছে যেন উপর থেকে সূক্ষ্ম অদৃশ্য ছাই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিম্বা যেন অসংখ্য রেখার অতিসূক্ষ্ম জালিকাজ বাতাসে ঝুলছে। একধারে তখন উপরের স্তরে মনে হয় যেন রয়েছে বাতাসের ভাস্বর বিস্তার। তার স্রোত আমাদের অনচ্ছ অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল সব ছায়াকে, মুছে দিল বিষণ্ণতার আকার ও ঘনত্ব। মাথার উপরে, প্রকৃতির যত বিশৃঙ্খলার মধ্যে, মেঘেরা তখন ছুটে চলেছে অপূর্ব এক উদারদৃশ্যে, তাদের মধ্যে চলেছে এক মোহন দ্বন্দ্ব... একটা গোল, অন্ধকার, ক্রুদ্ধ বস্তু মাকড়সার মতো নখর বাড়িয়েছে উজ্জ্বল সূর্যের দিকে; দুটো উঠে গেছে অনেক উপরে মেঘ পার হয়ে। কালো ঢালের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে এক নৃত্যরত আলোর বর্শা দিয়েছে সেই দৃশ্যকে জীবন ও গতি। মেঘেরা তাদের অশান্ত নিঃশব্দ গতিতে সে মায়া আরো বাড়িয়ে তুলেছে।'

আধুনিক জ্যোতির্বিদ **চন্দ্রগ্রহণের** প্রতি সূর্যগ্রহণের মতো কোন অসাধারণ কৌতূহল অনুভব করেন না। চন্দ্রগ্রহণে আমাদের পূর্বপুরুষরা পেতেন পৃথিবীর গোলাকারের প্রয়োজনীয় প্রমাণ। এই ধারণা মাগেল্লানের পৃথিবীপ্রদক্ষিণ যাত্রায় কী ভূমিকা নিয়েছিল তার স্মরণ লাভজনক। প্রশান্ত মহাসাগরের জলবিস্তারের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার সময়
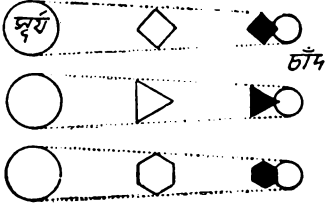
৫৮ নং ছবি: চাঁদে পৃথিবী যে ছায়া ফেলে তা থেকে কী ভাবে পৃথিবীর আকার জানা যায় সে বিষয়ে একটি প্রাচীন ছবি।

নাবিকদের দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে তারা চিরকালের মতো মাটি ছেড়ে এসেছে। সবাই তারা তাই হতাশায় ভেঙে পড়ে, কেবল মাগেল্লান আশা হারান না। 'যদিও গির্জা শাস্ত্রগ্রন্থের ভিত্তিতে সব সময় বলে এসেছে পৃথিবী হল জলে ঘেরা একটা বিরাট সমতল তবু মাগেল্লান এই যুক্তি দেখালেন: "চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী যে ছায়া ফেলে তার আকার গোল। এখন ছায়াটা যদি গোল হয় তবে যার ছায়া সেও গোল হবে," একথা লিখে গেছেন বিখ্যাত নৌচালকের সঙ্গী। প্রাচীন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রচনায় পৃথিবীর আকারের উপর চান্দ্র ছায়ার আকারের নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যা দিয়ে ছবি আছে (৫৮ নং ছবি)।

আজকাল এধরনের প্রমাণের কোন দরকার করে না। চন্দ্রগ্রহণ এখন চাঁদের ঔজ্জ্বল্য আর রঙের দ্বারা **পৃথিবীর** আবহাওয়ার উপরের স্তরের গঠন জানতে সাহায্য করে। আগেই বলেছি, চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। প্রচ্ছায়ায় বাঁকাভাবে যে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে তার ফলে চাঁদকে কিছুটা দেখা যায়। এই বিশেষ মুহূর্তে চাঁদের আলোর শক্তি আর চাঁদের নানা ঘনত্বের রং জ্যোতির্বিদদের মনে গভীর কৌতূহল জানায়। একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এসবের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের সংখ্যার যোগ আছে। তাছাড়া সৌর তাপ না থাকলে চাঁদ কী হারে শীতল হতে থাকে তা মাপার জন্যও সাম্প্রতিক কালে চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারটা কাজে লাগান হয়। এবিষয়ে পরে বলব।

প্রতি আঠার বছরে কেন গ্রহণ হয়

আমাদের কালের বহু আগেই ব্যাবিলনের নক্ষত্রদর্শকরা জেনেছিলেন যে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ দুইই প্রতি ১৮ বছর ১০ দিনে একবার করে হয়। প্রাচীনেরা এই পর্বকে বলতেন 'সারোস' আর তার সাহায্যেই তাঁরা আগে থাকতে গ্রহণের কাল জানিয়ে দিতেন। তাঁরা কিন্তু এই বাঁধাধরা পর্বছন্দ বা তার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কারণ জানতেন না। সে কারণ আবিষ্কার হয় অনেক পরে চাঁদের গতি নিয়ে সযত্ন অধ্যয়নের ফলে।

চাঁদের আবর্তনের তুল্য কাল কী? পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তন সম্পূর্ণ হল বলতে যা বোঝায় তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তরটা একেক সময় একেক রকমের হয়। জ্যোতির্বিদরা পাঁচ জাতের মাস নির্ধারিত করেছেন। বর্তমানে আমরা কেবল তাদের দুটিতে কৌতূহলী।

প্রথম হল 'সিনডিক' মাস — একটি চক্কর সম্পূর্ণ করতে চাঁদের যে সময়টা লাগে, অবশ্য **যদি গতিটা সূর্য থেকে দেখা হয়।** দুটো সমান কলা, যেমন, এক শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে আরেক শুক্লপক্ষের প্রতিপদের মধ্যবর্তী পর্ব ২৯·৫৩০৬ দিনের সমান।

দ্বিতীয় 'ড্রেকনিক' মাস — কক্ষপথের একই পাতে (node) ফিরে আসতে চাঁদের যে সময়টা লাগে। **পাত** হল যে বিন্দুতে চাঁদের কক্ষপথ ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করে। এতে ২৭·২১২২ দিন লাগে।

সহজেই দেখা যায়, পূর্ণিমা বা শুক্লপক্ষের প্রতিপদের চাঁদ যখন তার একটি পাতে পৌঁছয় কেবল তখনই গ্রহণ হয়। চাঁদের কেন্দ্র তখন থাকে পৃথিবী আর সূর্যের কেন্দ্রের মাঝখানকার সরলরেখায়। আজ যদি কোন গ্রহণ হয় তবে তা আবার হবে ততদিন পরে যখন **সিনডিক আর ড্রেকনিক মাসের পূর্ণ সংখ্যা** মিলবে। তখনই গ্রহণের সর্ত ফিরে দেখা দেবে।

সময়ের এই ব্যবধান আমরা বার করি কী করে? তা জানতে হলে আমাদের এই সমীকরণটি সমাধান করতে হবে — $২৯·৫৩০৬x=২৭·২১২২y$, x আর y হল পূর্ণ সংখ্যা। এই অঙ্ককে যদি এ-রকমের অনুপাতে বদলে দিই

$$\frac{x}{y} = \frac{২,৭২,১২২}{২,৯৫,৩০৬},$$

তবে দেখব এই সমীকরণের সর্বনিম্ন **নিখুঁৎ** সমাধান হল $x = ২,৭২,১২২$ আর $y=২,৯৫,৩০৬$। তার ফলে আমরা যে বিরাট কালপর্ব পাই তা বহু লক্ষ বছরের ব্যাপার। কার্যকরিতার দিক দিয়ে তা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা একটা **স্থূল** সমাধানেই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভগ্নাংশ স্থূলায়ণের একটা অতি সুবিধেজনক উপায়। $\frac{২,৯৫,৩০৬}{২,৭২,১২২}$ ভগ্নাংশটিকে পরবর্তী নিরবচ্ছিন্ন ভগ্নাংশে পরিণত করা যাক। পূর্ণাঙ্ক বাদ দিয়ে পাই

$$\frac{২,৯৫,৩০৬}{২,৭২,১২২} = ১ \frac{২৩,১৮৪}{২,৭২,১২২}।$$

শেষের ভগ্নাংশে লব আর হরকে লব দিয়ে ভাগ করি:

$$\frac{২,৯৫,৩০৬}{২,৭২,১২২} = ১ + \frac{১}{১১\frac{১৭,০৯৮}{২৩,১৮২}}।$$

তারপর $\frac{১৭,০৯৮}{২৩,১৮৪}$ ভগ্নাংশটির লব আর হরকে লব দিয়ে ভাগ করি। এই ভাবে ভাগ

করে গেলে শেষ পর্যন্ত পাই

$$\frac{২,৯৫,৩০৬}{২,৭২,১২২} = ১ + \cfrac{১}{১১ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{২ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{৪ + \cfrac{১}{৪ + \cfrac{১}{১৭ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{৭}}}}}}}}}।$$

এই ভগ্নাংশের প্রথম ভাগটা নিয়ে বাকিটাকে বাতিল করলে পর পর এই ধরনের স্থূলায়ণ পাই :

$$\frac{১২}{১১}, \quad \frac{১৩}{১২}, \quad \frac{৩৮}{৩৫}, \quad \frac{৫১}{৪৭}, \quad \frac{২৪২}{২২৩}, \quad \frac{১,০১৯}{৯৩৯},$$ ইত্যাদি।

এই প্রগতির (progression) পঞ্চম ভগ্নাংশটি যথেষ্ট পরিমাণ নিখুঁৎ। এখানেই যদি ক্ষান্ত দিই, মানে, x'কে ২২৩ আর y'কে ২৪২ বলে মেনে নিই, তাহলে গ্রহণের পুনরাবির্ভাবের পর্ব হবে ২২৩ সিনডিক মাস বা ২৪২ ড্রেকনিক মাস, তার ফলে পাওয়া যায় ৬,৫৮৫⅓ দিন, তার মানে, ১৮ বছর ১১·৩ (বা ১০·৩*) দিন।

এই ভাবেই সারোসের উৎপত্তি। তার উৎপত্তির কারণ জানি বলে আমরা জানি কতোটা সঠিকভাবে গ্রহণের কথা আমরা আগে থাকতে বলতে পারি। মনে রাখা দরকার যে সারোসকে ১৮ বছর ১০ দিনের সমান বলে হিসেব করে আমরা অপূর্ণ ০·৩ দিনটা বাদ দিয়ে যাই। এই বাদ পড়া সময়টা থেকে বোঝা যায় পূর্ববর্তী গ্রহণের চেয়ে সে দিনের **কত পরে** (প্রায় আট ঘণ্টা পরে) গ্রহণ ঘটবে। সঠিক সারোসের **তিন** গুণ বেশি একটা পর্বকে যদি নিই তাহলেই কেবল গ্রহণটা দিনের একেবারে সমান কালে ঘটবে। তাছাড়া সারোসের মধ্যে চাঁদ-পৃথিবী আর পৃথিবী-সূর্যের **দূরত্বের** বদলটা ধরা হয় না। এই বদলগুলিরও আবার নিজস্ব পর্ব আছে। সূর্যগ্রহণ পূর্ণ কি আংশিক হবে তা নির্ধারিত হয় এই দূরত্বের দ্বারা। কাজেই সারোসের সাহায্যে আমরা কেবল এইটুকুই বলতে পারি অমুক দিনে গ্রহণ হবে। পূর্ণ কি আংশিক বা বলয়াকার গ্রহণ হবে তা, কিম্বা আগের জায়গা থেকেই তাকে দেখা যাবে কিনা সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

---

* এই পর্বে চারটে বা পাঁচটা অধিবর্ষ পড়ে কিনা তার উপর নির্ভর করে।

শেষে বলি, একেক সময় এমনও হয় যে, যে অত্যন্ত নগণ্য আংশিক সূর্যগ্রহণ ১৮ বছরের মধ্যে ঘটে তার কলা কমিয়ে শূন্যে ঠেকিয়ে দেয়। তাই তাকে একেবারেই দেখা যায় না। তেমনি আবার এতদিন পর্যন্ত অদৃশ্য আংশিক সূর্যগ্রহণ দৃশ্য হয়ে ওঠে।

আমাদের কালে জ্যোতির্বিদরা সারোসকে ব্যবহার করেন না। পৃথিবীর উপগ্রহের খেয়ালী গতি এতই ভালভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে যে গ্রহণ কখন ঘটবে তার সেকেণ্ডটি পর্যন্ত আগে থেকে ঠিকভাবে বলে দেওয়া যায়। যদি কোন পূর্বঘোষিত গ্রহণ না ঘটে আজকের দিনের পন্ডিতরা তবে দিব্যি গেলে বলবেন তার কারণ আর যা কিছুই হোক না কেন হিসেবের গোলমাল কিছুতেই নয়। জুল ভার্ন তাঁর 'ফারের দেশ'এ একথা খুব ঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ঐ কাহিনীতে রয়েছে এক জ্যোতির্বিদের কথা। তিনি সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য মেরুযাত্রায় বেরিয়েছেন। কিন্তু সে গ্রহণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও হল না। জ্যোতির্বিদ কোন সিদ্ধান্তে পেঁৗছলেন? তিনি তাঁর সঙ্গীদের জানালেন যে বরফপ্রান্তরে তাঁরা রয়েছেন সেটা ভাসমান বরফ, মূলদেশের অংশ নয়। সে বরফ ভেসে ভেসে গ্রহণের ছায়াঢাকা পথের বাইরে চলে গেছে। তাঁর কথা শীগ্‌গিরি প্রমাণও হল। বিজ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাসের এ এক চমৎকার নিদর্শন!

এও কি সম্ভব?

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁরা দিগন্তের একদিকে দেখেছেন সূর্যের চক্র সেই সঙ্গেই অন্য দিকে চাঁদের অন্ধকার চক্র।

১৯৩৬ সালের ৪ঠা জুলাই আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময়ও তা দেখা যায়। এই বইয়ের একজন পাঠক আমায় লিখেছেন, '৪ঠা জুলাই সন্ধ্যা ৮টা ৩১ মিনিটে চাঁদ ওঠে, সূর্য অস্ত যায় সন্ধ্যা ৮টা ৪৬ মিনিটে। চাঁদ ওঠার সময়ই চন্দ্রগ্রহণ লাগে, যদিও তখন একই সঙ্গে দিগন্তের ঊর্ধ্বে চাঁদ আর সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল। ব্যাপারটা দেখে আমি খুবই অবাক হই কারণ আলোর রশ্মি যায় সরল রেখায়।'

ব্যাপারটা সত্যিই একটা ধাঁধা। যদিও ধোঁয়াটে কাচ দিয়ে 'সূর্য আর চাঁদের কেন্দ্রকে যোগ করা রেখাটি দেখা' যায় না তবু কল্পনা করা যায় যে রেখাটি এই ভাবেই পৃথিবীকে পার হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী সূর্য থেকে চাঁদকে আড়াল না করলেও কি গ্রহণ হতে পারে? অমন কোন প্রত্যক্ষদর্শীকে কি বিশ্বাস করা যেতে পারে?

বাস্তবে এ ঘটনায় অবিশ্বাসের কিছু নেই। পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর পথচ্যুতির ফলে আকাশে একই সময় সূর্য আর অন্ধকার চাঁদ দেখা সম্ভব। এই বিচ্যুতির জন্য, যাকে 'আবহ প্রতিসরণ' বলে, সব জ্যোতিষ্ককেই আমরা তার সত্যিকার অবস্থানের ঊর্ধ্বে দেখি (১৫ নং ছবি)। আমরা যখন চাঁদ সূর্যকে দিগন্তে দেখি, তখন

জ্যামিতিক দিক দিয়ে আসলে তারা তার **নিচে**। তাই সূর্য আর অন্ধকার চাঁদকে একই সময়ে দিগন্তে দেখতে পাওয়াটা অবিশ্বাস্য কিছু নয়।

এ বিষয়ে ফ্লামারিওন বলেছেন, 'লোকেরা ১৬৬৬, ১৬৬৮ আর ১৭৫০'এর গ্রহণগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়, কারণ এই অদ্ভুত ব্যাপারটা তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অত পিছনে যাবার কোন দরকার করে না। ১৮৭৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসে চাঁদ ওঠে ৫টা ২৯ মিনিটে, সূর্য অস্ত যায় ৫টা ৩৯ মিনিটে, যদিও পূর্ণ গ্রহণ এর মধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮০'তে প্যারিসে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়। সেদিন চাঁদ ওঠে ৪টেয়, সূর্য অস্ত যায় ৪টে ২ মিনিটে; প্রায় গ্রহণের মাঝখানে। গ্রহণ ৩টে ৩ মিনিটে লেগে ৪টে ৩৩ মিনিটে ছাড়ে। এ-রকম ঘটনা যে আরো বেশি দেখা যায় না তার কারণ খুব কম লোকই তা লক্ষ্য করে দেখে। সূর্য অস্ত যাবার আগে বা তা ওঠার পর পুরো গ্রহণ লাগা চাঁদকে দেখতে হলে পৃথিবীর এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে যেখানে চাঁদ গ্রহণের মাঝামাঝি সময়ে দিগন্তে থাকবে।'

গ্রহণের কোন কথাটা সবার জানা নয়

প্রশ্ন

(১) সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ কতক্ষণ চলতে পারে?

(২) বছরে কটা গ্রহণ সম্ভব?

৫৯ নং ছবি: আংশিক গ্রহণের সময় পাতার ছায়ায় আলো চমকাবে বাঁকা চাঁদের আকারে।

(৩) বছরে একবারও সূর্যগ্রহণ হল না, এমনটা হয় কি? কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ?

(৪) গ্রহণের সময় চাঁদের অন্ধকার চক্রটা সূর্যের বাঁ থেকে না ডান থেকে পার হয়?

(৫) চন্দ্রগ্রহণ কি ডাইনে বা বাঁয়ে সুরু হয়?

(৬) সূর্যগ্রহণের সময় গাছের পাতার ছায়ায় যে আলোর ঝলক দেখা যায় তারা বাঁকা ফালির মতো পড়ে কেন? (৫৯ নং ছবি।)

(৭) গ্রহণের সময় সৌরকলার আকৃতির সঙ্গে সাধারণ চন্দ্রকলার কী তফাৎ হয়?

(৮) সূর্যগ্রহণ দেখতে হলে ধোঁয়াটে কাচের কেন দরকার হয়?

উত্তর

(১) **সূর্যগ্রহণের** দীর্ঘতম **পূর্ণ কলা** হল ৭½ মিনিট (বিষুবরেখায়, উচ্চতর অক্ষাংশে এর চেয়ে কম হয়)। গ্রহণের সব কলা ৪½ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে (বিষুবরেখায়)।

চন্দ্রগ্রহণের কলা চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ কখনো ১ ঘণ্টা ৫০ মিঃ'র বেশি থাকে না।

(২) বছরে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হল ৭, সবচেয়ে কম ২। (১৯৩৫ সালে সাতটা গ্রহণ হয় — ৫টা সূর্যগ্রহণ, ২টো চন্দ্রগ্রহণ।)

(৩) প্রতি বছরেই অন্তত দুটো **সূর্যগ্রহণ** হয়। মাঝেমাঝে সারা বছরে একটাও **চন্দ্রগ্রহণ** হয় না, প্রায় প্রতি পাঁচ বছরে একবার এ-রকমটা ঘটে।

(৪) উত্তর গোলার্ধে চাঁদের চক্র সূর্যকে **ডান থেকে বাঁয়ে** পার হয়ে যায়। সূর্যের সঙ্গে তার প্রথম সংস্পর্শ ডান দিক থেকে ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক **উল্টো** গতিটা দেখা যাবে (৬০ নং ছবি)।

(৫) উত্তর গোলার্ধে চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় ঢোকে **বাঁ** দিক থেকে, দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক **উল্টোটা** ঘটে।

(৬) পাতার ছায়ায় আলোর ঝলক সূর্যের ভঙ্গিমাই আঁকে। গ্রহণের সময় সূর্য নেয় বাঁকা ফালির আকার। তাই পাতার ছায়ায় তার প্রতিরূপও সেই আকারই নেয় (৫৯ নং ছবি)।

(৭) **চাঁদের** বাঁকা ফালির বাইরের ঘেরটি হল অর্ধবৃত্ত। ভিতরের ঘেরটি অর্ধউপবৃত্ত। **সূর্যের** বাঁকা ফালি থাকে একই ব্যাসার্ধের বৃত্তের দুটি বিভিন্ন চাপের মধ্যে (৫৯ পৃঃ দ্রঃ — 'চন্দ্রকলার ধাঁধা')।

(৮) আমরা সাদা চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না, এমন কি চাঁদের দ্বারা অংশত আচ্ছাদিত সূর্যের দিকেও না। সূর্যের রশ্মি অক্ষিপটের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশগুলিকে পুড়িয়ে দেয় তার ফলে কখনো কিছুকালের জন্য. কখনো বা সারা জীবনের মতো দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
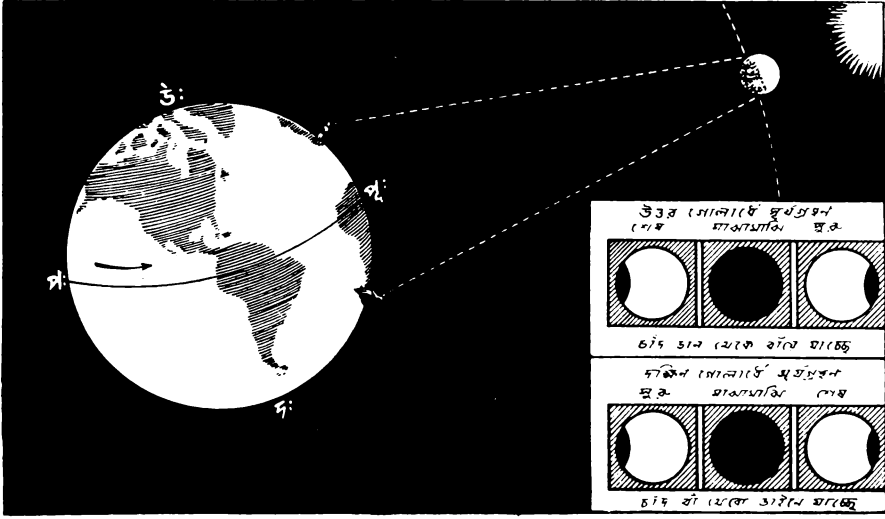
৬০ নং ছবি: গ্রহণের সময় উঃ গোলার্ধের লোক দেখে চাঁদের চক্রটা সূর্যের ভিতর ঢুকছে ডান থেকে বাঁয়ে আর দঃ গোলার্ধের লোক ঠিক উল্টোটা দেখে। কেন?

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নভগরোদের এক ঐতিহাসিক বলে গেছেন, 'জ্যোতিষ্কলোকের এই অশুভঘটনায় মহা নভগরোদের বহু অধিবাসী দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে।' একটা ভাল মতো ঘষা কাচ নিলেই এই দুর্ভাগ্য এড়ান যায়। কাচটাকে পুরু করে মোমবাতির কালিতে ঢাকতে হবে যাতে সূর্যটাকে **একটা পরিষ্কার চক্র** হিসেবে দেখা যায়। তার রশ্মি আর জ্যোতি যেন না থাকে। সুবিধের জন্য ধোঁয়াটে দিকটায় একটা পরিষ্কার কাচ বসিয়ে ধারগুলোয় কাগজ সেঁটে দেওয়া যেতে পারে। সূর্যগ্রহণ কী পরিবেশে দেখতে হবে তা আগে থেকে জানা যায় না বলে নানা মাত্রার অস্বচ্ছ কতগুলো কাচ হাতের কাছে রাখাটা ভাল।

রঙিন কাচও চলতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন রঙের কাচকে একসঙ্গে লাগাতে হবে ('পরিপূরক' রং হলেই ভাল)। সাধারণ রঙিন চশমা যথেষ্ট নয়। ফোটোর নেগেটিভে যদি যথেষ্ট কালো অংশ থাকে তবে তাও চলতে পারে।

চাঁদের আবহাওয়াটা কি রকমের?

আসলে আমরা আবহাওয়া বলতে যা বুঝি সে-রকম কোন আবহাওয়া চাঁদের নেই। যেখানে বায়ু, মেঘ, বাষ্প, বৃষ্টি, হাওয়া নেই সেখানে আর আবহাওয়া হবে কী করে? একমাত্র চাঁদের বুকের তাপের কথা বলা যেতে পারে।

চাঁদের বুকটা কত গরম? জ্যোতির্বিদদের হাতে এখন এমন সব যন্ত্র আছে যার ফলে দূর জ্যোতিষ্কেরই শুধু নয়, তার অংশেরও তাপ মাপা যায়। এই যন্ত্রগুলি গড়া হয়েছে থার্মো-ইলেকট্রিসিটির সূত্রের উপর ভর করে। দুটি ভিন্ন ধাতুর তৈরী ঝালাই-করা কনডাক্টরে ঝালাই-করা অংশদুটির একটি অন্যটির চেয়ে বেশি গরম হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্ট হয়। প্রবাহের শক্তি নির্ভর করে তাপের পার্থক্যের উপর এবং এ থেকে শোষিত তাপের পরিমাণ আমরা জানতে পারি।

যন্ত্রটি অত্যাশ্চর্য সংবেদনশীল। তাই আকার অত্যন্ত ছোট হলেও (প্রধান অংশটি লম্বায় ০·২ মিঃমিঃ, ওজনে ০·১ মিঃগ্রামের বেশি নয়)। ত্রয়োদশ মাত্রার তারা যা **এক ডিগ্রীর ১,০০,০০,০০০তম ভগ্নাংশ** পর্যন্ত তাপ বাড়ায়, তার উষ্ণতাতেও সাড়া দেয়। পূর্বোক্ত জাতের তারা দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না আর তাদের ঔজ্জ্বল্য সাদা চোখে যে

৬১ নং ছবি: চাঁদের দৃষ্ট গোলার্ধের কেন্দ্রে তাপ +১১০° সেঃ পৌঁছয় আর যত তার প্রান্তের দিকে যায় ততই দ্রুত নামতে নামতে –৫০° সেঃরও নিচে নামে।

4—820

তারাদের দেখা যায় তাদের ঔজ্জ্বল্যের ৬০০ ভাগের এক ভাগ। এই নগণ্য পরিমাণ উষ্ণতার প্রভাব কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মোমবাতির তাপদানের সমান।

এই প্রায় অলৌকিক পরিমাপ যন্ত্রটিকে জ্যোতির্বিদরা চাঁদের দূরবীনী প্রতিচ্ছবির নানা জায়গায় খাটিয়ে শোষিত উষ্ণতা মেপেছেন আর ১০° মাত্রার সঠিকতায় নানা অংশের তাপ স্থির করেছেন। ফল হল এই (৬১ নং ছবি): পূর্ণচাঁদের চক্রের কেন্দ্রে ১০০° সেঃরও বেশি তাপ; এখানে জল পড়লে সাধারণ চাপেও তা ফুটবে। একজন জ্যোতির্বিদ বলেছেন, 'চাঁদে রান্নার জন্য উনুনের দরকার নেই, হাতের কাছে যে পাথর পাব তাতেই কাজ চলবে।' চক্রের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে সমানভাবে তাপ কমে এসেছে। কিন্তু কেন্দ্র থেকে ২,৭০০ কিঃমিটার দূরেও তাপ ৮০° সেঃর কম নয়। তারপর আলোকিত গোলার্ধের প্রান্তে দ্রুত শূন্যের নিচে ৫০° সেঃএ নেমে গেছে। চাঁদ সূর্যের দিক থেকে তার যে অন্ধকার দিক ফিরিয়ে রেখেছে সেখানে আরো অনেক ঠাণ্ডা। শূন্যের নিচে ১৬০° সেঃ।

আগেই বলেছি গ্রহণের সময় চাঁদ যখন পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায় ডুবে যায় তখন তার বুক রোদের অভাবে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়। সেই ঠাণ্ডা হওয়ার পরিমাণ মাপা হয়েছে। দেখা গেছে গ্রহণের সময় একবার তাপ +৭০° সেঃ থেকে −১১৭° সেঃএ নেমে গিয়েছিল। তার মানে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টায় ২০০° সেঃ। পৃথিবীতে এ-জাতীয় অবস্থায়, যেমন সূর্যগ্রহণের সময় তাপ মাত্র ২° সেঃ বা খুব বেশি হলে ৩° সেঃ নামে। তার কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। দৃশ্যমান সূর্যালোকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হলেও এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তপ্ত বুকের অদৃশ্য 'তাপ' রশ্মিকে যেতে দেয় না।

চাঁদের ভূপৃষ্ঠ তার সঞ্চিত তাপ দ্রুত হারায় — এ থেকে বোঝা যায় তার তাপ শোষণ আর পরিবহণ ক্ষমতা কম। তার ফলেই চাঁদে তাপ জমে অল্প পরিমাণে।
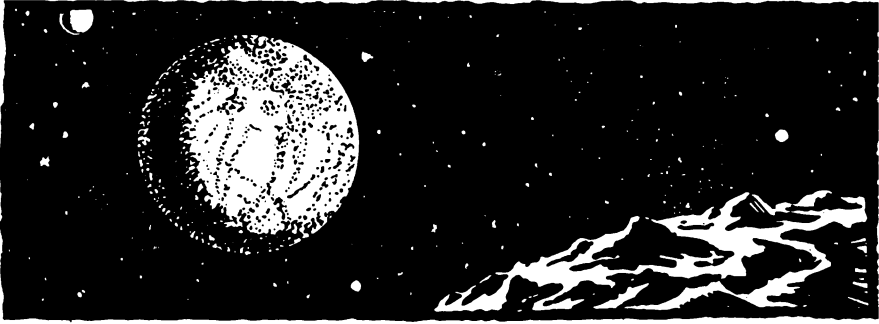
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহেরা

দিবালোকে গ্রহেরা

দিনের বেলা উজ্জ্বল রোদে গ্রহদের দেখা যায় কি? দূরবীনে যায়। জ্যোতির্বিদরা প্রায়ই দিনের বেলা গ্রহদের দেখে থাকেন, এমন কি মাঝারি শক্তির দূরবীন দিয়েও। অবশ্য রাত্রের মতো অত পরিষ্কার দেখা যায় না। ১০ সেঃমিঃ ব্যাসের দূরবীন দিয়ে দিনের বেলায় বৃহস্পতিকে দেখা যায়, এমন কি তার কালো মোটা দাগগুলো পর্যন্ত। বুধকে তো সে যখন দিনের বেলা দিগন্তের ঊর্ধ্বে থাকে তখনই দেখা যায় সবচেয়ে ভাল। সূর্যাস্তের পর বুধ আকাশের এত নিচে নেমে আসে যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দূরবীনে তার চেহারাটা বেশ বিকৃত করে তোলে।

তেমন তেমন অবস্থায় কোন কোন গ্রহকে দিনের বেলা খালি চোখেও দেখা যায়।

সবচেয়ে উজ্জ্বল শুক্রকে দিনের আলোতে দেখা যায় বেশি, অবশ্য যদি সে সময় শুক্রের উজ্জ্বলতা ওঠে চরমে। আরাগোর একটি সুপরিচিত গল্প আছে। তাতে বলা হয়েছে, নেপোলিয়ন একবার বিজয়গর্বে প্যারিসের ভিতর মার্চ করে যেতে যেতে জনতার ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছিলেন। জনতা তখন দুপুরবেলা শুক্রের উদয়ে মহামহিমময় নেপোলিয়নকে বাদ দিয়ে গ্রহের দিকেই নজর দিয়েছিল।

দিনের বেলায় শুক্রকে খোলা জায়গার চেয়ে সহরের রাস্তা থেকে ভাল দেখা যায় কারণ বড় বড় বাড়ি সূর্যকে দেয় আড়াল করে আর তার ফলে চোখ সূর্যের সরাসরি চোখধাঁধানো আলো থেকে রক্ষা পায়। প্রাচীন রুশ ঐতিহাসিকরাও দিনের বেলার শুক্রের

কথা বলে গেছেন। নভগরোদের ইতিকথায় বলা হয়েছে যে ১৩৩১ সালে 'আকাশে গির্জার ঊর্ধ্বে এক উজ্জ্বল তারকার অশুভলক্ষণ দৃষ্ট হয়।' দ. স্ভিয়াৎস্কি আর ম. ভিলিয়েভের পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় সে তারাটি হল শুক্র।

দিনের বেলায় শুক্রকে সবচেয়ে ভাল করে দেখার সময় আসে প্রতি আট বছর অন্তর। মনোযোগী নক্ষত্রদর্শী দিনের বেলায় শুধু শুক্র নয়, বৃহস্পতি আর বুধকে দেখার সৌভাগ্যও পেতে পারেন।

এখানে গ্রহদের উজ্জ্বলতার তুলনাটা দেওয়া ভাল। সাধারণ লোকে জিজ্ঞেস করেন: শুক্র, বৃহস্পতি আর মঙ্গলের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে উজ্জ্বল? এই গ্রহ তিনটি যদি একই সঙ্গে জ্বলত বা তাদের যদি পাশাপাশি দেখা যেত, তাহলে এই প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু তারা ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন সময়ে দেখা দেয় বলে কোনটা বেশি উজ্জ্বল তা ঠিক করা বেশ কঠিন কাজ। ঔজ্জ্বল্যের ক্রমটা হল এই: শুক্র, মঙ্গল আর বৃহস্পতি লুব্ধকের চেয়ে উজ্জ্বল; বুধ আর শনি লুব্ধকের তুলনায় অনুজ্জ্বল হলেও প্রথম মাত্রার তারাদের চেয়ে উজ্জ্বল।

পরের পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বলব।

গ্রহের বর্ণমালা

সূর্য চন্দ্র গ্রহকুল বোঝানর জন্য আজকের জ্যোতির্বিদরা বহু প্রাচীন প্রতীক ব্যবহার করেন (৬২ নং ছবি)। এই প্রতীকগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন, কেবল চাঁদেরটি ছাড়া কারণ তাকে দেখেই চেনা যায়। বুধ বা মার্কারির চিহ্ন হল পৌরাণিক দেবতা মার্কারির দণ্ডের একটা সরল ছবি। মার্কারি হলেন এই গ্রহের অধিদেবতা। শুক্র বা ভেনাসের চিহ্ন হল একটা হাত-আয়না। দেবী ভেনাসের নারীত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক সেই আয়না। মঙ্গল বা মার্সের চিহ্ন হল যোদ্ধার অস্ত্র, ঢালের পিছনে বর্শা, কারণ মঙ্গলের অধিদেবতা হলেন যুদ্ধের দেবতা। বৃহস্পতি বা জুপিটারের চিহ্ন হল কেবল গ্রীক জুপিটার—জিউস (বড় হাতের Z) নামটির আদ্যাক্ষর। ফ্লামারিওনের মতানুযায়ী শনির চিহ্ন হল 'কালের কাস্তের' একটা বিকৃত ছবি, ভাগ্যদেবতার ঐতিহ্যগত সঙ্গী।

পূর্বোক্ত চিহ্নগুলো ৯ম শতাব্দী থেকে চলে আসছে। ইউরেনাসের প্রতীকটি স্বভাবতই পরের। কারণ ঐ গ্রহটি কেবল ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে আবিষ্কৃত হয়। তার চিহ্ন হল একটি চক্রের উপরে H অক্ষরটি। তাতে এই গ্রহের আবিষ্কর্তা হের্শেলের কথাই মনে পড়ে। ১৮৪৬ সালে আবিষ্কৃত নেপচুনের প্রতীকে সমুদ্রগর্ভের দেবতার ত্রিশূল এঁকে পুরাণকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শেষ গ্রহ প্লুটোর চিহ্নটি খুবই সহজবোধ্য।

গ্রহকুলের এই বর্ণমালার সঙ্গে আমরা যে গ্রহের অধিবাসী তার আর আমাদের

সৌরমণ্ডলীয় কেন্দ্র সূর্যের চিহ্নদুটিকে যোগ করতে হবে। শেষ প্রতীকটি বহু প্রাচীন। বহু হাজার বছর আগে মিশরীরা তা ব্যবহার করে।

ইউরোপের জ্যোতির্বিদরা যে সপ্তাহের দিনগুলোকে নাম দেবার বেলায় গ্রহকুলের বর্ণমালার প্রতীকই ব্যবহার করে থাকেন, সেটা হয়ত অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। যেমন রবিবারের বেলায় রবি, সোমবারের বেলায় সোম, মঙ্গলবারের বেলায় মঙ্গল, বুধবারের বেলায় বুধ, বৃহস্পতিবারের বেলায় বৃহস্পতি, শুক্রবারের বেলায় শুক্র, শনিবারের বেলায় শনি।

দিনগুলোর রুশ নয়, লাতিন, ফরাসী বা ভারতীয় নামের সঙ্গে যদি গ্রহপ্রতীকের তুলনা করি তবে এই সম্পর্ক খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। লাতিন, ফরাসী ও ভারতীয় অনেক ভাষাতে দিনগুলোর নামের সঙ্গে গ্রহদের নামের যোগ বজায় রয়েছে (সোমবার ফরাসীতে হল লুঁদি — চাঁদের দিন, মঙ্গল হল মার্দি — মঙ্গলের দিন ইঃ)। কিন্তু এই অদ্ভুত মিলের বিষয়ে আর কিছু বলব না, কারণ ওর সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার চেয়ে ভাষাতত্ত্ব আর সংস্কৃতির ইতিহাসেরই বেশি সম্পর্ক।

পুরাকালের এলকেমিস্টরা গ্রহকুলের বর্ণমালাকে ধাতুর চিহ্ন হিসেবেও ব্যবহার করতেন। সূর্যের চিহ্ন দিয়ে সোনা বোঝান হত, চাঁদের চিহ্ন দিয়ে রুপো, বুধের চিহ্ন দিয়ে পারা, শুক্রের চিহ্ন দিয়ে তামা, মঙ্গলের চিহ্ন দিয়ে লোহা, বৃহস্পতির চিহ্ন দিয়ে টিন আর শনির চিহ্ন দিয়ে সীসা।

চাঁদ ☾
বুধ ☿
শুক্র ♀
মঙ্গল ♂
বৃহস্পতি ♃
শনি ♄
ইউরেনাস ♅
নেপচুন ♆
প্লুটো ♇
সূর্য ☉
পৃথিবী ♁

৬২ নং ছবি: সূর্য, চাঁদ আর অন্যান্য গ্রহদের প্রতীকচিহ্ন।

তার কারণ হল এলকেমিস্টদের চিন্তাধারা। তাঁরা প্রতি ধাতু কোন না কোন প্রাচীন পৌরাণিক দেবতাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আধুনিক উদ্ভিদবিদ আর প্রাণিবিদরা যখন পুরুষ ও স্ত্রী বোঝাতে গিয়ে মঙ্গল আর শুক্রের চিহ্ন ব্যবহার করেন তখনো গ্রহকুলের প্রতীকের প্রতি মধ্যযুগীয় এই মর্যাদার লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। বার্ষিক উদ্ভিদের চিহ্ন হিসাবে উদ্ভিদবিদরা সূর্যের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রতীকও ব্যবহার করে থাকেন। দ্বিবার্ষিক উদ্ভিদ বোঝানর ক্ষেত্রেও তাঁরা ঐ একই চিহ্ন একটু বদলে ব্যবহার করেন (চক্রের ভিতরে দুটি ফোঁটা)। বৃহস্পতির চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয় চিরজীবী ঘাস আর শনির চিহ্ন দিয়ে ঝোপঝাড় আর গাছপালা।

আমরা যা আঁকতে পারি না

আমাদের সৌরমণ্ডলীর ঠিক ছকটা কিছুতেই কাগজে আঁকা যায় না। জ্যোতির্বিদ্যার বইয়ে সৌরমণ্ডলীর যে ছক দেওয়া হয় সেটা আসলে গ্রহকুলের **কক্ষপথের** ছবি,

সৌরমণ্ডলী মোটেই নয়। এই সব ছবিতে গ্রহদের আকার অনেকটা না বদলালে চলে না। গ্রহদের মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় গ্রহরা এতই নগণ্য যে তাদের আকারের সঠিক ধারণা করা অসম্ভব। গ্রহ পরিবারের একটা ক্ষুদ্রাকার তুলনা করলে সেটা আঁচ করতে সুবিধা হবে। তবেই বোঝা যাবে সৌরমণ্ডলীটাকে কেন কাগজে পেন্সিলে আঁকা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র গ্রহদের আর সূর্যের তুলনামূলক আকারটা দেওয়া যেতে পারে (৬৩ নং ছবি)।
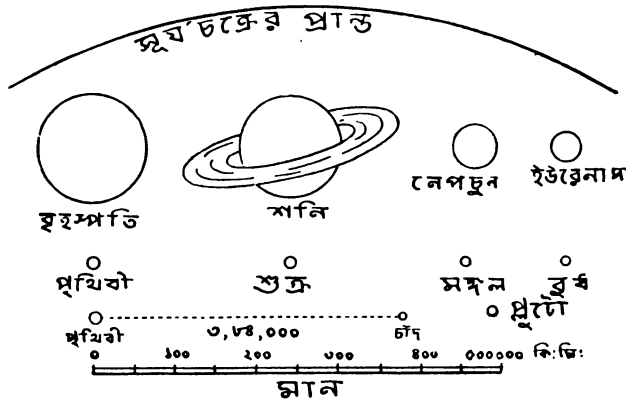
৬৩ নং ছবি: সৌর আর গ্রহমানের তুলনা। এই মাপে সূর্যের ব্যাস হল ১৯ সেঃমিঃ।

পৃথিবীকে দেখাতে হলে আমরা একটা ক্ষুদ্র মান নেব যেমন পিনের মাথা। ধরা যাক পৃথিবীটা হল ১ মিঃমিঃ ব্যাসের একটা বল। তাহলে ১ মিঃমিঃএ প্রায় ১৫,০০০ কিঃমিঃ— এই মাত্রা ধরে নেওয়া হচ্ছে, বা ১:১৫,০০,০০,০০,০০০। ¼ মিঃমিঃ ব্যাসের একটা ছোট্ট ফোঁটা চাঁদকে তবে পিনের মাথা থেকে ৩ সেঃমিঃ দূরে বসাতে হবে। ১০ সেঃমিঃ ব্যাসের একটা বল-সূর্য পৃথিবী থেকে ১০ মিঃ দূরে থাকবে। একটা বড় ঘরের এক কোণে একটা বল, অন্য কোণে একটা পিনের মাথা — এ থেকেই ধারণা করা যাবে মহাশূন্যে সূর্য আর পৃথিবীর অবস্থানটা কী। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বস্তুর চেয়ে শূন্যই অনেক বেশি। আসলে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে দুটো গ্রহ আছে — বুধ আর শুক্র। কিন্তু তাদের দ্বারা শূন্যটা কিছুই প্রায় ভরে না। আমাদের ঘরে তারা কেবল দুটো ছোট্ট ফোঁটা হয়েই থাকবে। তাদের একটা ⅓ মিঃমিঃ ব্যাসের। সেটা হল বুধ। আমাদের সূর্য-বলের কাছ থেকে ৪ মিঃ দূরে। অন্যটা হল পিনের মাথা শুক্র, সূর্য-বল থেকে ৭ মিঃ দূরে।

পৃথিবীর অন্য দিকেও কিছু বস্তুকণা থাকবে। ই মিঃমিঃ ব্যাসের মঙ্গল সূর্য-বলকে ১৬ মিঃ দূর থেকে পাক দেয়। প্রতি ১৫ বছরে পৃথিবী আর মঙ্গলের চিহ্ন ফোঁটাদুটো পরস্পরের সবচেয়ে কাছে আসে, ৪ মিঃএর ব্যবধানে: এই দুই জগতের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যবধান। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ, কিন্তু আমাদের মডেলে তাদের দেখান যাবে না। কারণ যে মাত্রা আমরা বেছে নিয়েছি তাতে ঐ উপগ্রহদুটি দুটি বীজাণুর সমান হবে। **গ্রহাণুপুঞ্জ** বা যে হাজার দেড়েক ছোটো ছোটো গ্রহ মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী মহাশূন্যে ঘোরে তারাও কার্যত ঐ সমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার নেবে। আমাদের মাত্রায় তারা সূর্য থেকে গড়ে ২৮ মিঃ দূরে থাকবে। গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো সেটি আমাদের মডেলে একটি চুলের সমান (১/২০ মিঃমিঃ) পুরু হবে। সবচেয়ে ছোটটি হবে একটি বীজাণুর মতো।

বিরাট বৃহস্পতিকে দেখাতে হবে একটা বাদামের আকারে (১ সেঃমিঃ)। সূর্য-বল থেকে তা ৫২ মিঃ দূরে থাকবে। তার ১২টি উপগ্রহের সবচেয়ে বড় যারা তারা বৃহস্পতির কাছ দিয়ে যথাক্রমে ৩, ৪, ৭ আর ১২ সেঃমিঃ দূর দিয়ে যায়। বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় চাঁদের আকার হবে ই মিঃমিঃ। অন্যরা হবে বীজাণুর আকারের। তার দূরতম উপগ্রহ, ৯ নং উপগ্রহ, বৃহস্পতির প্রতীক বাদামটি থেকে ২ মিঃ দূরে থাকবে। তাই আমাদের মডেলে সমগ্র বার্হস্পত্য পরিবারটির ব্যাস হবে ৪ মিঃ। ৬ সেঃমিঃ ব্যাসের পৃথিবী-চন্দ্র পরিবারের তুলনায় মন্দ বড় নয়। কিন্তু বৃহস্পতির নিজস্ব ১০৪ মিঃ ব্যাসের কক্ষপথের তুলনায় সামান্যই বলব।

একটা ছবিতে গোটা সৌরমণ্ডলীকে দেখান যে অসম্ভব তা দেখতে পাচ্ছি। এ ব্যাপারে যতই এগব, তার অসম্ভবতা ততই স্পষ্ট হবে। শনিকে সূর্য-বলের কাছ থেকে ১০০ মিঃ দূরে রাখতে হবে, আর তার প্রতীক হবে ৮ মিঃমিঃ ব্যাসের একটা বাদাম। বিখ্যাত শনির বলয় যা ৪ মিঃমিঃ চওড়া আর ১/২৫০ মিঃমিঃ পুরু, বাদামটার বুক থেকে ১ মিঃমিঃ দূরে থাকবে। নটি উপগ্রহ গ্রহ থেকে প্রায় আধ মিটার দূরে ছড়িয়ে থাকবে। তাদের আকার হবে ১/১০ মিঃমিঃ বা তারও কম ব্যাসের শস্যকণার মতো।

সৌরমণ্ডলের ধারের দিকে যত এগব গ্রহদের মধ্যবর্তী শূন্য ততই বাড়বে। আমাদের মডেলে ইউরেনাস সূর্যের ১৯৬ মিঃ দূরে থাকবে। আর তার আকার হবে ৩ মিঃমিঃ ব্যাসের একটা ছোট্ট মটরদানার সমান। পাঁচটি ছোটো ছোটো উপগ্রহ গ্রহটি থেকে ৪ সেঃমিঃ পর্যন্ত দূরে থাকবে।

এই সেদিন পর্যন্ত যে গ্রহটিকে সৌরমণ্ডলের শেষ গ্রহ বলে মনে করা হত, সেই নেপচুনের প্রতীক হবে একটা ছোট্ট মটরদানা। তার দুটি উপগ্রহ, ট্রাইটন আর নীরিড, তার কাছ থেকে যথাক্রমে ৩ আর ৭০ সেঃমিঃ দূরে থাকবে। আর কেন্দ্রীয় বলটির কাছ থেকে ৩০০ মিঃ দূরে ধীরে ধীরে আবর্তিত হবে।

আরো দূরে আমাদের মডেলে ৪০০ মিঃ দূরে ছোট্ট গ্রহ প্লুটো। তার ব্যাস পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক।

এই শেষ গ্রহটির কক্ষপথকেও আমাদের সৌরমণ্ডলীর সীমা বলে মনে করা যায় না। কারণ তাতে গ্রহ ছাড়াও ধূমকেতু আছে। তাদের অনেকেই সূর্যকে পাক দেয় আবদ্ধ কক্ষপথে। এই সব 'দীর্ঘকেশী তারাদের' ('কমেট' কথাটার সত্যিকার মানে তাই) মধ্যে কোন কোনটির আবর্তনপর্ব ৮০০ বছরের, যেমন ৩৭২ খৃঃ পূঃ, ১১০৬, ১৬৬৮, ১৬৮০, ১৮৪৩, ১৮৮০, ১৮৮২ (২টি ধূমকেতু) আর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ধূমকেতুগুলি। আমাদের মডেলে তাদের প্রতিটির পথ হবে একটি লম্বাটে উপবৃত্ত। তার একটি প্রান্ত, সবচেয়ে কাছেরটা (অনুসূর) সূর্যের মাত্র ১২ মিঃমিঃ দূরে থাকবে, সবচেয়ে দূরের বিন্দু (অপসূর) থাকবে ১,৭০০ মিঃ দূরে, প্লুটোর চারগুণ বেশি। এই সব ধূমকেতুর উপর নির্ভর করে যদি সৌরমণ্ডলীর আকার মাপতে যাই তাহলে আমাদের মডেলের ব্যাস ৩½ কিঃমিঃ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। আর তা ৯ বর্গকিলোমিটার জুড়ে থাকবে। মনে রাখা দরকার, পৃথিবী পিনের মাথার চেয়ে বড় হবে না! এই ৯ বর্গকিঃমিঃএ এই সব জিনিস থাকবে: একটা বল, দুটো বাদাম, দুটো মটরদানা, দুটো পিনের মাথা, আর তিনটে বিন্দু।

ধূমকেতুগুলোকে তাদের সংখ্যা সত্ত্বেও আমরা বাতিল করব। তাদের ভর এতই সামান্য যে 'দেখা যায় অথচ কিছুই-না' বলাটা খুবই ঠিক।

তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রহপরিবারের ছবি ঠিক মাত্রায় আঁকা সম্ভব নয়।

বুধে বায়ুমণ্ডল নেই কেন?

গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের সঙ্গে আক্ষিক আবর্তনের সম্পর্কটা কী? মনে হয় বুঝি কিছুই নেই। কিন্তু সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধকে দেখেই কোন কোন ক্ষেত্রে সে সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

বুধপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডলকে — অবশ্য অত ঘন নয় — টেনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

বুধপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণকে একেবারে কাটিয়ে উঠতে হলে সেকেণ্ডে ৪,৯০০ মিঃএর গতিবেগ প্রয়োজন। নিম্ন তাপে আমাদের বায়ুমণ্ডলের দ্রুততম অণুও সে গতিবেগ পেতে পারে না।* তবু বুধের বায়ুমণ্ডল নেই। তার কারণ চাঁদ পৃথিবীকে যেভাবে পাক দেয়, বুধ সেইভাবেই সূর্যকে পাক দেয়। তার মানে সূর্যের দিকে সে সবসময় একটি মুখই ফিরিয়ে রাখে। তার কক্ষাবর্তনের কাল (৮৮ দিন) অক্ষাবর্তনের সমান।

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৬৮ পৃঃ, 'চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই?' দ্রষ্টব্য।

তাই বুধের যে দিকটি সূর্যের দিকে সর্বদা ফেরান সেখানে সবসময়ই দিন, অনন্ত গ্রীষ্ম। তেমনি আবার যে দিকটি সূর্যের দিক থেকে অন্য দিকে ফেরান সেখানে শেষহীন রাত, অন্তহীন শীত। বুধের 'দিবালোকিত' মুখটিতে যে কী ভীষণ গরম তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য এখানে আড়াই গুণ কাছে। তাই তার রশ্মির তাপপ্রভাব হবে ২½ × ২½, তার মানে ৬¼ গুণ বেশি। তেমনি আবার নিশীথরাতের দিকটি লক্ষ কোটি বছরে একবারও সূর্যের আলো না পাওয়ায় ঠাণ্ডায় জমে আছে। তার তাপ মহাশূন্যের তাপের* কাছাকাছি (প্রায় —২৬৪° সেঃ)। কারণ 'আলোকিত' দিকের তাপ গ্রহ ফুঁড়ে অপর দিকে যেতে পারে না। আলো-অন্ধকার সীমানাটায় ২৩° চওড়া একটা ফালি আছে। সেখানে লিব্রেশনের** ফলে সূর্য কিছুটা উঁকি মেরে যায়।

এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় গ্রহের বায়ুমণ্ডলের কী হয়? বলাই বাহুল্য তীব্র ঠাণ্ডার ফলে নিশীথরাতের গোলার্ধে বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডায় ঘন হয়ে জমে যায়। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রচণ্ড হ্রাস পাওয়ায় 'আলোকিত' দিকটি থেকে গ্যাস ছুটে আসবে অন্য গোলার্ধে যেখানে গ্যাস জমে যাচ্ছে। তার ফলে ক্রমশ সমগ্র বায়ুমণ্ডল ঘনীভূত হয়ে জমবে নিশীথরাতের অংশে, আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে সূর্যের স্পর্শরিক্ত অংশটিতে। কাজেই বুধে বায়ুমণ্ডলের অভাব হল পদার্থিক নিয়মের অনিবার্য ফল।

চাঁদের অদৃশ্য দিকে বায়ুমণ্ডল আছে — এই জাতীয় যে অনুমান প্রায়ই শোনা যায় তাও অগ্রাহ্য এই একই কারণে। এক দিকে বায়ুমণ্ডল না থাকলে অন্য দিকেও থাকবে না — এ কথা একেবারে স্থির নিশ্চিত।*** এইচ. জি. ওয়েলসের কল্পোপন্যাস 'চাঁদে প্রথম মানুষ' বইটিতে এই ভুল করা হয়েছে। ঔপন্যাসিকের মতে চাঁদে বাতাস আছে; সে বাতাস দুসপ্তাহব্যাপী স্থায়ী একটি পুরো রাতে ঠাণ্ডায় জমে যায়, কিন্তু দিন এলেই আবার গ্যাসের আকার ফিরে পেয়ে বায়ুমণ্ডলে পরিণত হয়। আসলে এ-রকম কিছুই হয় না। এ বিষয়ে অধ্যাপক ও. খ্ভলসন লিখছেন, 'চাঁদের আলোরিক্ত দিকটির বাতাস যদি জমে যায় তাহলে আলোকিত দিকের প্রায় সব বাতাসই সেদিকে বইবে আর তারপর জমে যাবে। সূর্য রশ্মি শক্ত বাতাসকে গ্যাসে পরিণত করবে। সেই গ্যাস আবার সঙ্গে সঙ্গেই অনালোকিত দিকে

---

* 'মহাশূন্যের তাপ' বলতে পদার্থবিদরা সূর্যের রশ্মি আড়াল-করা কালো থার্মোমিটারে মহাশূন্যে যে তাপ দেখা যায় তাই বোঝেন। চরম শূন্যাঙ্ক, –২৭৩° সেঃ, এর চেয়ে তা একটু বেশি। নক্ষত্র-বিকিরণের তাপপ্রভাবের ফলে তা ঘটে।

** 'চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য মুখ' (২য় পরিঃ, ৬৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। চাঁদ যে উপান্তিক নিয়ম মেনে চলে তা বুধের দ্রাঘিমাগত লিব্রেশনের বেলায়ও খাটে। বুধের একটি গোলার্ধ সারাক্ষণ সূর্যের দিকে নয়, তার অনেকটা বর্ধিত কক্ষপথের অন্য নাভিটির দিকে চেয়ে থাকে।

*** ৭০ পৃঃর পদটীকা দ্রঃ।

এসে শক্ত হয়ে যাবে... সারাক্ষণই বাতাসের পাতন চলবে আর তা কোনরকম লক্ষণীয় স্থিতিস্থাপকতা পাবে না।'

বুধ আর চাঁদের বায়ুমণ্ডল নেই — একথা প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গেই বলতে হয় সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় গ্রহ শুক্রের বেলায় উল্টোটাই ঠিক।

এও দেখা গেছে যে শুক্রের বায়ুমণ্ডল, **স্ট্রেটোস্ফিয়ার** বলাটাই আরো ঠিক, কার্বন ডাইঅক্সাইডে সমৃদ্ধ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি।

শুক্রের কলা

বিখ্যাত গণিতবিদ গাউস বলেছেন যে তিনি একবার তাঁর মাকে সন্ধ্যাকালের উজ্জ্বল শুক্রতারা দূরবীন দিয়ে দেখতে বলেন। তিনি মাকে অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ দূরবীনে শুক্রকে বাঁকা ফালির মতো দেখায়। কিন্তু তাজ্জব বনতে হয় গাউসকেই। কারণ তাঁর মা এতটুকুও অবাক না হয়ে কেবল জিজ্ঞেস করেন বাঁকা ফালিটার মুখ অন্য দিকে কেন... গাউস তখন ভাবতেও পারেননি যে তাঁর মা খালি চোখেই শুক্রের কলাগুলি দেখতে
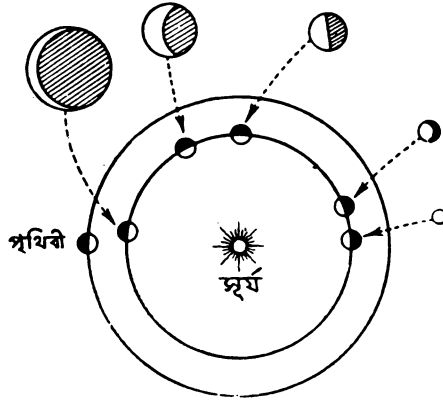
৬৪ নং ছবি: দূরবীনে দৃষ্ট শুক্রের কলা। শুক্রের আপাত ব্যাস পৃথিবী থেকে তার দূরত্বের বদলের জন্য নানা কলায় বদলে যায়।

পারতেন। এমন তীক্ষ্ন দৃষ্টি দুর্লভ। দূরবীন আবিষ্কারের আগে কেউ একথা ভাবতেও পারত না শুক্রেরও চাঁদের মতো কলা আছে।

শুক্রের কলার বৈশিষ্ট্য হল নানা-অবস্থায় তাদের ব্যাসের তারতম্য ঘটে। সরু বাঁকা ফালির ব্যাস পূর্ণ চক্রের চেয়ে অনেক লম্বা (৬৪ নং ছবি)। তার কারণ হল এই গ্রহটি তার

নানা কলায় আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে থাকে। সূর্য থেকে শুক্রের মধ্য দূরত্ব হল ১০,৮০,০০,০০০ কিঃমিটার, পৃথিবী থেকে — ১৫,০০,০০,০০০ কিঃমিটার। সহজ হিসেবের ফলেই জানা যায় দুটি গ্রহের নিকটতম ব্যবধান হল ১৫০ থেকে ১০৮ বাদ দিলে যত হয় ততটা, তার মানে, ৪,২০,০০,০০০ কিঃমিটার। আর বৃহত্তম ব্যবধান হল ১৫০'এর সঙ্গে ১০৮'এর যোগফল, তার মানে, ২৫,৮০,০০,০০০ কিঃমিটার। কাজেই পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব এই সীমানার মধ্যেই বদলে চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে শুক্র তার অন্ধকার মুখটি আমাদের দেখায়, তাই তার সবচেয়ে বড় কলাটি একেবারেই অদৃশ্য। 'অমাবস্যার শুক্র' — এই অবস্থা থেকে সে যতই সরে যায় ততই সে বাঁকা ফালির আকার নেয়। সেই ফালিটি যতই পূর্ণ হয় তার ব্যাস ততই কমে যায়। শুক্রকে যখন তার পূর্ণচক্রে দেখা যায় বা তার ব্যাস যখন হয় দীর্ঘতম তখন সে মোটেই সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকে না। তা হয় একটা মধ্যবর্তী কলায়। পূর্ণচক্রটা দেখা যায় ১০″ দৃষ্টিকোণ থেকে। সবচেয়ে বড় বাঁকা ফালিটা ৬৪″ দৃষ্টিকোণ থেকে। অপরপক্ষে 'অমাবস্যার শুক্রের' ৩০ দিন পর গ্রহটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। তখন তার কোণাকার ব্যাস হয় ৪০″ আর বাঁকা ফালির কোণাকার প্রস্থ ১০″। এসময়ে সে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের চেয়ে ১৩ গুণ উজ্জ্বলতর।

অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা

অনেকেই জানেন মঙ্গল প্রায় প্রতি পনের বছরে একবার সবচেয়ে উজ্জ্বল হয় আর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। এর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম হল মঙ্গলের অত্যন্ত অনুকূল প্রতিপক্ষতা। নামটি খুবই প্রচলিত। সাম্প্রতিক 'প্রতিপক্ষতার' সমারোহ কাল হল ১৯২৪, ১৯৩৯ (৬৫ নং ছবি) আর ১৯৫৬। কিন্তু প্রতি ১৫ বছরে এই ঘটনা কেন ঘটে সেটা খুব কম লোকেই জানে। প্রসঙ্গত বলি, এ ব্যাপারের 'অংকটা' খুবই সহজ।

পৃথিবী তার কক্ষপথ একবার পুরো ঘোরে ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিনে, মঙ্গল ৬৮৭ দিনে। দুটো গ্রহ একবার যেন সবচেয়ে কাছাকাছি এল, পরের বার আবার আসবে পার্থিব আর মঙ্গলীয় বছরের **পূর্ণাঙ্ক** নিয়ে গঠিত অবকাশের পর।

তার মানে পূর্ণাংকয় এই সমীকরণটি কষতে হবে

$$৩৬৫\tfrac{1}{4}x = ৬৮৭y,$$

বা

$$x = ১\cdot৮৮y,$$

তার ফলে

$$\frac{x}{y} = ১\cdot৮৮ = \frac{৪৭}{২৫}।$$

শেষোক্ত ভগ্নাংশটাকে নিরবচ্ছিন্ন অঙ্কে (৯২ পৃঃ দ্রঃ) পরিণত করলে পাই:

$$\frac{৪৭}{২৫} = ১ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{৭ + \cfrac{১}{৩}}}$$

প্রথম তিনটি অংশ এই স্থূলায়ন দেয়

$$১ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{৭}} = \frac{১৫}{৮},$$

তাই ১৫টি পার্থিব বছর মঙ্গলের ৮ বছরের সমান হয়। কাজেই মঙ্গল নিকটতম প্রতিপক্ষতায় আসবে প্রতি ১৫ বছরে (আমরা অবশ্য সমস্যাটাকে কিছুটা সহজ করে নেবার জন্য ১·৮৮ ধরে নিয়েছি যদিও ১·৮৮০৯টাই বেশি ঠিক)।

৬৫ নং ছবি: মঙ্গলের আপাত ব্যাস বিংশ শতাব্দীতে প্রতিপক্ষতার কালে কী ভাবে বদলেছে। ১৯০৯, ১৯২৪ আর ১৯৩৯ সালে সবচেয়ে অনুকূল প্রতিপক্ষতা দেখা যায়।

বৃহস্পতির নিকটতম প্রতিপক্ষতার পর্বও একই উপায়ে জানা যায়। একটি বার্হস্পত্য বছর হল ১১·৮৬ (১১·৮৬২২) পার্থিব বছরের সমান। এই ভগ্নাংশকে নিরবচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত করলে পাই:

$$১১ \cdot ৮৬ = ১১\frac{৪৩}{৫০} = ১১ + \cfrac{১}{১ + \cfrac{১}{৬ + \cfrac{১}{৭}}}।$$

প্রথম তিনটি অংশে আমরা ৮৩/৭ এই স্থূলায়ন পাই। তাই বৃহস্পতির নিকটতম প্রতিপক্ষতা ঘটে প্রতি ৮৩ পার্থিব বছরে, বা প্রতি সাতটি বার্হস্পত্য বছরে। এই বছরগুলোতেই বৃহস্পতি দৃশ্যতঃ সবচেয়ে উজ্জ্বল। তার শেষ নিকটতম প্রতিপক্ষতা ঘটে ১৯২৭ সালে। পরেরটা ঘটবে ২০১০ সালে। বৃহস্পতি তখন পৃথিবী থেকে ৫৮,৭০,০০,০০০ কিঃমিটার দূরে থাকবে — এই হল সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে কম দূরত্ব।

গ্রহ না ছোট সূর্য?

বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির বেলায় এই প্রশ্ন করা চলে। ১,৩০০টি পৃথিবীকে তৈরী করার পক্ষে যথেষ্ট বড় এই বিরাট গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণীয় টান এতই জোরাল যে তার ফলে একটা পুরো উপগ্রহের ঝাঁক তার চারপাশে ঘোরে। জ্যোতির্বিদরা দেখেছেন বৃহস্পতির বারটি চাঁদ আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে চারটিকে গ্যালিলিও তিন শতাব্দী আগে আবিষ্কার করেন তারা রোমক সংখ্যা I, II, III, IV দিয়ে চিহ্নিত। ৩ নং আর ৪ নং উপগ্রহদুটি বুধের সমান বড়।

নিচের তালিকায় উপগ্রহগুলির ব্যাসের সঙ্গে বুধ আর মঙ্গলের ব্যাসের তুলনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বৃহস্পতির প্রথম দুটি উপগ্রহ আর আমাদের চাঁদের ব্যাসের কথাও বলা হয়েছে:

নাম	ব্যাস	
মঙ্গল	৬,৬০০	কিঃমিটার
বৃহস্পতির ৪ নং উপগ্রহ	৫,১৫০	”
” ৩ নং ”	৫,১৫০	”
বুধ	৪,৭০০	”
বৃহস্পতির ১ নং উপগ্রহ	৩,৭০০	”
চাঁদ	৩,৪৮০	”
বৃহস্পতির ২ নং উপগ্রহ	৩,২২০	”

৬৬ নং ছবি এই তালিকার চিত্ররূপ। বড় চক্রটা হল বৃহস্পতি। এ চক্রের ব্যাস বরাবর যে গোলকগুলিকে বসান হয়েছে সেগুলি পৃথিবী, ডাইনে রয়েছে চাঁদ, মঙ্গল আর বুধ, বাঁয়ে বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ। মনে রাখবেন এটা ছবি, ডায়াগ্রাম নয়। গোলকগুলির ক্ষেত্রের পরিমাণ দেখে তাদের **আয়তনের** পরিমাণ বোঝা যাবে না কারণ এ আয়তন হল ব্যাসের **ঘনকের** অনুপাতে।

পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির ব্যাস ১১ গুণ বড় বলে তার আয়তন হবে ১১৩, তার মানে, ১,৩০০ গুণ বেশি। তাই ৬৬ নং ছবি চোখে দেখে যে ধারণা হবে, তাকে মনে মনে ঐ হিসেবে বাড়িয়ে নিতে পারলেই তবে বৃহস্পতির বিরাটত্ব কিছুটা আঁচ করা সম্ভব।

বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষের টান সত্যিই একটা বলবার মতো ব্যাপার। এই বিরাট গ্রহটি
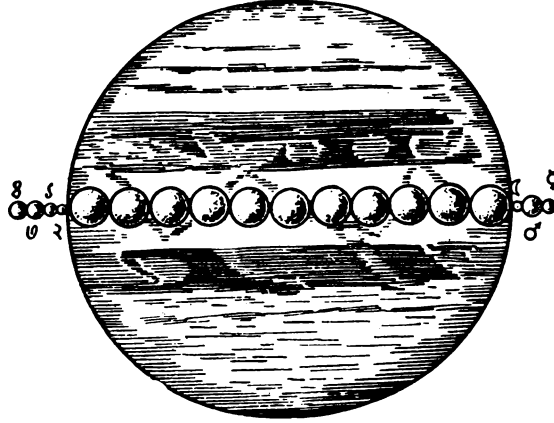
৬৬ নং ছবি: বৃহস্পতি আর তার উপগ্রহগুলি (বাঁয়ে)। তাদের সঙ্গে পৃথিবী (ব্যাসের মধ্যে) আর চাঁদ, মঙ্গল আর বুধের (ডাইনে) তুলনা।

যে ব্যবধান থেকে তার চাঁদদের পাক খাওয়ায় তার কথা খেয়াল রাখলে একথা বিশেষ করেই খাটে। ব্যবধানের তালিকাটা দেওয়া গেল।

ব্যবধান	কিঃমিটার	ক'গুণ
চাঁদ থেকে পৃথিবী	৩,৮০,০০০	১
৩ নং উপগ্রহ থেকে বৃহস্পতি	১০,৭০,০০০	৩
৪ নং ” ” ”	১৯,০০,০০০	৫
৯ নং ” ” ”	২,৪০,০০,০০০	৬৩

এ থেকেই বোঝা যাবে বার্হস্পত্য পরিবারটি পৃথিবী-চাঁদ পরিবারের চেয়ে ৬৩ গুণ বড়। আর কোন গ্রহের এমন ব্যাপক বিস্তৃত উপগ্রহ পরিবার নেই।

তাই বৃহস্পতিকে যে ছোট সূর্য বলা হয় সেটা অকারণ নয়। তার ভর অন্য সব গ্রহের মোট ভরের চেয়ে তিন গুণ বেশি। হঠাৎ যদি সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় তবে তার জায়গায় বৃহস্পতিকে দিয়ে অন্য সব গ্রহদের তাকে কেন্দ্র করে পাক খেতে বাধ্য করান যেতে পারে।

বৃহস্পতি আর সূর্যের ভৌতিক গঠনেও মিল আছে। বৃহস্পতির মধ্য ঘনত্ব — জলের ১·৩৫ গুণ — সূর্যের কাছাকাছি (১·৪)। কিন্তু বৃহস্পতির কমলালেবুর মতো আকার। তাই মনে হয় সে যেন বরফের পুরু স্তর আর বিরাট বায়ুমণ্ডলে ঢাকা ঘন বস্তু।

এই সেদিন পর্যন্তও সূর্যের সঙ্গে বৃহস্পতির তুলনাকে আরো দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। মনে করা হত বৃহস্পতির কোন শক্ত ত্বক নেই। আর তা এখনো জ্বলন্ত পিণ্ডের পর্ব পার হয়নি। এ মত এখন বাতিল হয়ে গেছে। সরাসরি মাপার ফলে জানা গেছে যে বৃহস্পতির তাপ অত্যন্ত কম, শূন্যের নিচে ১৪০° সেঃ! অবশ্য এটা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘের তাপ।

বৃহস্পতির তাপ খুবই নিচে বলে তার ভৌতিক বৈশিষ্ট্যের কারণ জানা খুবই কঠিন কাজ। যেমন তার বায়ুমণ্ডলীয় ঝড়, কালো দাগ, কলঙ্ক ইত্যাদি। জ্যোতির্বিদ্যাকে এখানে একের পর এক ধাঁধার সম্মুখীন হতে হয়।

সম্প্রতি ঠিকভাবে জানা গেছে যে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে (তার প্রতিবেশী শনির বায়ুমণ্ডলেও) এমোনিয়া আর মেথেন* বিরাট পরিমাণে আছে।

শনির বলয়ের মিলিয়ে যাওয়া

১৯২১ সালের একটি দিনে দুনিয়া একটা খবরে অবাক হয়ে যায়: শনির বলয়গুলো আর নেই! তাদের টুকরো, বলা হয়, সূর্যের দিকে ছুটছে; পথে তারা আমাদের পৃথিবীকে ধাক্কা দেবে। এমন কি বিপর্যয়কর সংঘাতের তারিখও দিয়ে দেওয়া হয়...

গুজব যে কী ভাবে জন্মায় তার নিদর্শন হল এই গল্পটি। এই চাঞ্চল্যকর খবরের উৎস হল এই ঘটনাটি। সে বছর শনির বলয়দের কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায় না বা, তখনকার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকাতে যা বলা হয়েছিল, 'অদৃশ্য হয়ে যায়'। জনশ্রুতি

---

* আরো দূরের গ্রহ ইউরেনাস আর বিশেষ করে নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে মেথেনের ভাগ আরো বেশি। ১৯৪৪ সালে শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানের মেথেন বায়ুমণ্ডল আছে বলে জানা গেছে। — সম্পাঃ

আক্ষরিক অর্থেই পদার্থিক অবলুপ্তির কথা ধরে নেয়, অর্থাৎ বলয়গুলি ধ্বংস বলে। তারপর তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে বিশ্ববিপর্যয়ের সব খুঁটিনাটি তথ্যে: তার ফলেই সূর্যে বলয়গুলির টুকরোগুলোর পতন আর পৃথিবীর সঙ্গে তাদের অনিবার্য সংঘর্ষের কথা ওঠে।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকায় শনিচক্রের চাক্ষুষ অবলুপ্তি সংক্রান্ত একটা নির্দোষ খবর কী সোরগোলই না তুলেছিল! বলয়গুলি মিলিয়ে যায় কেন? মনে রাখতে হবে বলয়গুলি পাতলা। তারা ত্রিশ কিলোমিটার পুরু, তাদের প্রস্থের তুলনায় সেটা একটা কাগজের মতো।
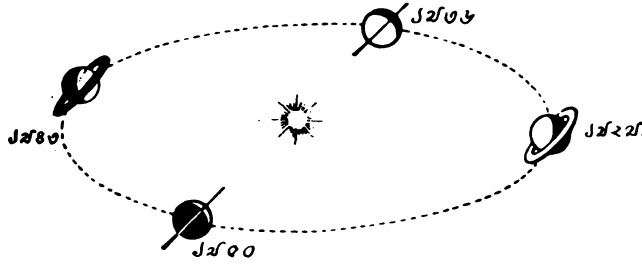
৬৭ নং ছবি: শনির আবর্তনের ২৯ বছরের পর্বে সূর্যের সম্পর্কে তার বলয়গুলির অবস্থান।

কাজেই তারা যখন সূর্যের দিকে আড়ভাবে থাকে তখন তাদের দু পিঠে আর আলো পড়ে না আর তাই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের কানাতটা যখন পৃথিবীতে দর্শকের দিকে মুখ করে থাকে তখনো তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

বলয়গুলি ক্রান্তিবৃত্তের দিকে ২৭° কোণ করে ঝুঁকে থাকে। কিন্তু ২৯ বছরে গ্রহটির পূর্ণ কক্ষাবর্তনের ভেতর সূর্য আর পৃথিবীর দর্শকের দিকে দুটি উল্টো বিন্দুতে (৬৭ নং ছবি) আড়ভাবে মুখ ফেরায়। অন্য দুটি বিন্দুতে, প্রথম দুটির চেয়ে ৯০° দূরে, বলয়গুলোর ব্যাপকতম পৃষ্ঠতল ফেরে সূর্য আর পৃথিবীর দিকে, জ্যোতির্বিদদের ভাষায় ‘খুলে যায়’।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক এনাগ্রাম

গ্যালিলিওকে শনির বলয়ের অবলুপ্তি ধাঁধায় ফেলেছিল। তিনি শনির এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটির মর্ম উদ্ঘাটনে অনেকদূর এগিয়েছিলেন, কিন্তু বলয়গুলোর দুর্বোধ্য অবলুপ্তিতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। ব্যাপারটা কিছু কৌতূহলজনক। গ্যালিলিওর কালে প্রথম

আবিষ্কারকের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার যে রেওয়াজটা ছিল সেটা অদ্ভুত। এমন যদি কিছু একটা আবিষ্কার করা হল যার আরো প্রমাণ প্রয়োজন তাহলে বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত এনাগ্রামের (বর্ণমালার অদলবদল) শরণ নিতেন। পাছে আর কেউ তাঁরটা নিয়েই তাঁকে হারিয়ে দেয়, তাই নিজ আবিষ্কারের মূলকথাটা বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করে রাখতেন এমন এনাগ্রামের সাহায্যে যার প্রকৃত অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তার ফলে বৈজ্ঞানিক অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো না করে তাঁর আবিষ্কারকে যাচিয়ে দেখতে পারতেন। প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে আর কোন দাবীদার এলে নিজের দাবী জানাতে পারতেন। তাঁর আদি অনুমান ঠিক এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ামাত্র বৈজ্ঞানিক তাঁর এনাগ্রামের সংকেত ঠিকভাবে পড়ে দিতেন। তাঁর ত্রুটিপূর্ণ দূরবীনে শনির পার্শ্বে এক জাতীয় বাড়তি জিনিস দেখে গ্যালিলিও তাড়াতাড়ি তাঁর আবিষ্কার ঘোষণার উদ্দেশে এই বর্ণমালার জগাখিচুড়িটি প্রকাশ করেন:

Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras.

এই সংকেতের মানে কেউ বুঝতে পারেনি। অবশ্য ৩৯টি অক্ষরের সবরকম স্থানপরিবর্তন ছকে দেখলে গ্যালিলিওর লুকনো কথাটা ধরা যেত। কিন্তু তাতে অনেক খাটুনীর প্রয়োজন। সমবায় (combinations) ও বিন্যাসের (permutations) নিয়মটা জানা থাকলেই সম্ভাব্য পরিবর্তনের (পুনরাবৃত্তি সমেত) মোট সংখ্যা বের করা যায়। যথা:

$$\frac{৩৯!}{৩!\,৫!\,৪!\,৪!\,২!\,২!\,৫!\,৩!\,৩!\,২!\,২!}$$

যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাতে প্রায় ৩৫টি অঙ্ক। মনে রাখতে হবে এক বছরে সেকেণ্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় 'কেবল' ৮টি অঙ্কে! বুঝতেই পারছেন গ্যালিলিও কীরকম সন্তর্পণে তাঁর ঘোষণাটি লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ইতালীয় বৈজ্ঞানিকের সমসাময়িক কেপলার, তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ধৈর্যকে কাজে লাগিয়ে গ্যালিলিওর ঘোষণার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। প্রকাশিত বর্ণমালা থেকে (দুটো অক্ষর বাদ পড়েছিল) নিচের এই লাতিন বাক্যটি গঠন করে কেপলার মনে করেন তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে:

Salve, umbistineum geminatum Martia proles

(তোমাদের নমস্কার, মঙ্গলের যমজসন্তান)।

কেপলারের দৃঢ়বিশ্বাস হয় গ্যালিলিও মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন। ঐ

দুটি উপগ্রহের অস্তিত্ব তিনি নিজেও আঁচ করেছিলেন।* (আসলে তারা ২৫০ বছর পরে ধরা পড়ে।) কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেপলারের অনুমান ব্যর্থ হয়। গ্যালিলিও তাঁর গোপন রহস্য উন্মোচন করলে পর জানা যায় কথাটা ছিল এই (দুটো অক্ষর বাদ দিয়ে):

Altissimum planetam tergeminum observavi

(একটি অত্যন্ত উঁচু আর ত্রিগুণ (triple) গ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়াছি)।

তাঁর দূরবীনের শক্তি কম ছিল বলে গ্যালিলিও শনির এই 'ত্রিগুণ' রূপের প্রকৃত মানেটা ধরতে পারেননি। কয়েক বছর পর গ্রহটির পার্শ্ববর্তী বাড়তি জিনিসগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে গ্যালিলিওর ধারণা হয় তাঁর ভুল হয়েছিল, শনির কোনো লেজুড় নেই।

তার অর্ধশতাব্দী পর হিউইগেন্স্ সৌভাগ্যক্রমে শনির বলয় আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিওর মতো তিনিও তাঁর আবিষ্কারের কথা তখনই ঘোষণা না করে তাঁর অনুমান হেঁয়ালির আকারে লিখে রাখেন:

Aaaaaaacccccdeeeeeghiiiiiiillllmmnnnnnnnnn
oooopppqrrstttttuuuuu

তিন বছর পর তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে হিউইগেন্স্ তাঁর ঘোষণা খুলে প্রকাশ করেন:

Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente,
ad eclipticam inclinato

(বৃত্তের দ্বারা ঘেরা, পাতলা, চ্যাপ্টা, কোথাও মেলে না
আর ক্রান্তিবৃত্তের দিকে ঝোঁকা)।

---

* এ ক্ষেত্রে কেপলার আন্দাজ করেছিলেন গ্রহদের উপগ্রহ সংখ্যাটা চলবে প্রগতির ছকে। পৃথিবীর একটি আর বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ এটা তাঁর জানা ছিল বলে মধ্যবর্তী মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ থাকাটা তিনি খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করেছিলেন। আরো অনেকে এই যুক্তিবশে মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের কথা ভেবেছেন। ভলটেয়ারের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কল্পোপন্যাস 'মিক্রোমেগাস' (১৭৫০) বইয়ে এক যাত্রীদলের কথা আছে। তারা মঙ্গলের কাছে এসে দেখে 'দুটো চাঁদ এই গ্রহের সেবক আর এতদিন তাহারা আমাদের জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল।' আরো আগে ১৭২৬ সালে লেখা সুইফ্টের 'গালিভারের ভ্রমণকাহিনী'তে এ-রকমেরই একটি মন্তব্য আছে। তা অনুযায়ী লাপুটীয় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকরা 'মঙ্গল প্রদক্ষিণকারী দুটি ছোটদরের তারকা বা উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন।' ১৮৭৭ সালে হল (Hall) মঙ্গলের উপগ্রহদুটি আবিষ্কার করলে পর এই কৌতূহলজনক অনুমানদুটি পুরোপুরি ঠিক প্রমাণ হয়।

নেপচুনেরও পরের গ্রহ

১৯২৯ সালে এই বইটি যখন প্রথম বেরয় তখন লিখেছিলাম সৌরমণ্ডলীর জ্ঞাত গ্রহদের মধ্যে নেপচুন হল সবচেয়ে দূরের — সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে ৩০ গুণ দূরে। এখন আর সেকথা বলা যাবে না। কারণ ১৯৩০ সালে সৌরমণ্ডলীতে একটি নতুন সদস্যের দেখা পাওয়া গেছে। নবম প্রধান গ্রহ। সূর্যকে সে পাক দেয় নেপচুনেরও দূর দিয়ে।

এই আবিষ্কারটি একটা অত্যন্ত আকস্মিক কিছু নয়। নেপচুনেরও পরে আরেকটি অজানা গ্রহের কথা জ্যোতির্বিদরা অনেক কাল থেকেই ভাবছিলেন। এক শতাব্দীর অল্পকিছু আগে পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল ইউরেনাসই হল সৌরমণ্ডলীর দূরতম গ্রহ। কিন্তু তার গতির কিছু বেয়াড়াপনার ফলে তাঁদের সন্দেহ হয় আরো দূরে হয়ত কোন গ্রহ আছে আর তার মাধ্যাকর্ষণের জন্যই ইউরেনাসের পথের বাঁধা ছন্দ ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রশ্নে বৃটিশ গণিতবিদ এডাম্‌স্‌ আর ফরাসী জ্যোতির্বিদ লেভেরিয়েরের গাণিতিক অনুসন্ধান এক চমৎকার আবিষ্কার ঘটায়; সন্দেহের পাত্র গ্রহটি দূরবীনে ধরা পড়ে। যে জগতের অস্তিত্ব 'কলমপেশা' হিসেবের দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল মানুষের চোখ তাকে দেখতে পায়।

এই হল নেপচুন আবিষ্কারের ইতিহাস। কিন্তু পরে দেখা গেল কেবল নেপচুনের প্রভাবই ইউরেনাসের গতির বেয়াড়াপনার সবটুকুর কারণ হতে পারে না। তখন মনে করা হল হয়ত নেপচুনের পরেও আরেকটি গ্রহ আছে। গণিতবিদরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। বহু সমাধানের প্রস্তাব এল। নবম গ্রহটি সূর্য থেকে নানা রকমের দূরত্বে অধিষ্ঠিত হল, নানা রকমের ভর তার উপর চাপান হল।

১৯৩০ সালে, ঠিক বলতে হলে বলতে হয় ১৯২৯ সালের শেষ দিকে সৌরমণ্ডলীপ্রান্তের বিষণ্ণ অন্ধকারের ভেতর থেকে দূরবীনে ধরা পড়ল আমাদের গ্রহপরিবারের আরেকটি সদস্য। প্লুটো নামের এই নতুন গ্রহটি আবিষ্কার করেন তরুণ জ্যোতির্বিদ টম্‌বো।

আগেই যে পথ হিসাব কষে বের করা হয়েছিল প্লুটো তারই খুব কাছ দিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এটাকে গণিতের বিজয় বলা যায় না। মিলটা একেবারেই আকস্মিক।

এই নবাবিষ্কৃত জগৎ সম্বন্ধে আমরা কী জানি? এখন পর্যন্ত খুবই কম। গ্রহটি এত দূরের আর সূর্যের আলো তাতে এত কম পড়ে যে অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্রও তার ব্যাস মাপতে পারেনি। পরে দেখা গেছে এ ব্যাস হল ৫,৯০০ কিঃমিটার বা পৃথিবীর ব্যাসের ০·৪৭ ভাগ।

প্লুটো সূর্যকে পাক দেয় বেশ ব্যাপক কক্ষপথে, যে পথের উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·২৫। ক্রান্তিবৃত্তের দিকে সে স্পষ্টতই ১৭°তে ঝুঁকে আছে। সূর্য থেকে সে পৃথিবীর ৪০ গুণ দূরে অবস্থিত। এই বিরাট পাক শেষ করতে প্লুটোর ২৫০ বছর লাগে।

প্লুটোর আকাশে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য আমাদের তুলনায় ১,৬০০ গুণ কম, আর তাকে ৪৫ কৌণিক সেকেণ্ডের একটা ছোট্ট চাকার মতো দেখায়। বৃহস্পতিকে আমরা যেরকম দেখি প্রায় সেরকম। প্লুটোর কাছে সূর্য বা পৃথিবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ কোনটা বেশি উজ্জ্বল তা নির্ধারণ করাটা কৌতূহলজনক।

দূরের প্লুটোকে সূর্যালোকের অভাবে যতটা দুস্থ মনে করা হয় আসলে হয়ত সে তত দুস্থ নয়। পূর্ণিমাতে আমরা যে আলো পাই তা সূর্যের আলোর চেয়ে ৪,৪০,০০০ গুণ দুর্বল। সূর্য আমাদের যে আলো দেয় প্লুটোয় তার চেয়ে ১,৬০০ গুণ কম জোরাল আলো পড়ে। কাজেই প্লুটোর সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীতে পূর্ণিমার আলোর চেয়ে $\frac{৪,৪০,০০০}{১,৬০০}$ বা ২৭৫ গুণ বেশি জোরাল। প্লুটোর আকাশ যদি পৃথিবীর আকাশের মতোই পরিষ্কার হয় — হয়ত সত্যিই তাই কারণ প্লুটোতে মনে হয় কোন বায়ুমণ্ডল নেই — তাহলে সেখানকার দিবালোক একসঙ্গে ২৭৫টি পূর্ণিমাচাঁদের আলোর সমান হবে, বা লেনিনগ্রাদের উজ্জ্বলতম শ্বেতরাত্রির চেয়ে ৩০ গুণ জোরাল। কাজেই প্লুটোকে চিররাত্রির দেশ বলাটা ভুল।

বামন গ্রহ

সৌরমণ্ডলের গ্রহকুল শুধু পূর্বোক্ত ৯টি বড় গ্রহ নিয়েই গঠিত নয়। তারা কেবল বড় গ্রহ। সূর্যকে নানা দূরত্বে পাক দিচ্ছে আরো ছোট ছোট গ্রহদল। গ্রহজগতে এই বামনরা গ্রহাণুপুঞ্জ নামে পরিচিত (asteroids — যার মানে হল 'তারার মতো') বা শুধু 'ছোট গ্রহ'। তাদের মধ্যে বৃহত্তমটি হল সিরিস। তার ব্যাস হল ৭৭০ কিঃমিটার। চাঁদের চেয়ে সে অনেক ছোট — চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে যত গুণ ছোট ততটাই।

প্রথম ছোট গ্রহ সিরিস আবিষ্কৃত হয় ১লা জানুয়ারী ১৮০১ সালে। উনবিংশ শতাব্দীতে ৪০০টিরও বেশি বামন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এই সেদিন পর্যন্ত মনে করা হত মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে যে বিরাট ব্যবধান সেখানেই এই গ্রহাণুপুঞ্জরা একসারে রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে গ্রহাণুপুঞ্জদের বন্ধনীর সীমানা দুদিকেই বেড়ে গেছে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত ইরস এই সীমানা ভেঙে দেয়, কারণ তার পথের অধিকাংশই পড়ে মঙ্গলের কক্ষপথের ভিতর দিকে।

১৯২০ সালে জ্যোতির্বিদরা হিদাল্‌গো গ্রহাণুটিকে আবিষ্কার করেন। তার পথ বৃহস্পতির কক্ষপথকে কেটে যায় আর শনির কক্ষপথের কাছ দিয়ে যায়। হিদাল্‌গোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল তার কক্ষপথ অন্য সব পরিচিত গ্রহের চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত (উৎকেন্দ্রিকতা ০·৬৬) আর সে ক্রান্তিবৃত্তের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে (৪৩°তে)।

এখানে বলি এই গ্রহাণুটি মেক্সিকোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিদাল্‌গো-ই-কস্তিল্লার নামে নামাঙ্কিত। হিদাল্‌গো-ই-কস্তিল্লাকে ১৮১১ সালে গুলি করে মারা হয়।

১৯৩৬ সালে ০·৭৮ উৎকেন্দ্রিকতার একটি গ্রহকণিকা দেখা গেলে বামন গ্রহদের এলাকা আরো বেড়ে যায়। আমাদের সৌরমণ্ডলীর এই নতুন সদস্যের নাম হয় এডনিস। তার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে তার অনুসূর সূর্য থেকে যত দূরে বৃহস্পতি থেকেও ততটাই দূরে, অথচ অপসূরে তা বুধের কক্ষপথের কাছাকাছি যায়।

সবশেষে ছোট্ট গ্রহ ইকারাস। সেটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৯ সালে। তার অসাধারণ পথটির উৎকেন্দ্রিকতা হল ০·৮৩, অনুসূর বিন্দুটি পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ আর অপসূর সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় পাঁচভাগের একভাগ দূরত্বে অবস্থিত। পরিচিত গ্রহদের কোনটিই ইকারাসের মতো সূর্যের অত কাছে যায় না।

নব আবিষ্কৃত গ্রহাণু লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিটি কৌতূহলজনক — জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও তা সফলভাবে কাজে লাগান যায়। প্রথমে আবিষ্কারের বছরটি লিপিবদ্ধ হয়, তারপর আবিষ্কারের সময়ে যে অর্ধমাস চলে তার পরিচায়ক একটি অক্ষর (এক বছরকে ২৪টি অর্ধমাসে ভাগ করা হয়, তারা বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী চিহ্নিত)।

একই অর্ধমাসে প্রায়ই একাধিক ছোট গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, তারা বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী আরেকটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত। ২৪টি অক্ষরে না কুলোলে তাদের ফিরে ব্যবহার করা হয় অবশ্য তখন তাদের সঙ্গে ছোট সংখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩২ EA_1 মানে হল একটি গ্রহকণিকা ১৯৩২ সালে মার্চ মাসের প্রথমার্ধে আবিষ্কৃত হয়েছে, এটি ঐ অর্ধমাসের ২৫তম। নবাবিষ্কৃত গ্রহের কক্ষপথ নির্ধারিত হলে তাকে একটি ক্রমিক সংখ্যা আর নাম দেওয়া হয়।

হয়ত অসংখ্য ছোট গ্রহের খুব অল্প সংখ্যকই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়েছে। গণনানুযায়ী সৌরমণ্ডলীতে ৪০ থেকে ৫০ হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ আছে।

আজ পর্যন্ত যত বামন গ্রহ লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের সংখ্যা ১,৫০০'এরও বেশি। তাদের একশটিরও বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে ক্রাইমিয়ার সিমেইজ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদদের দ্বারা। প্রধানত দক্ষ গ্রহাণুপুঞ্জ শিকারী গ. নেউইমিনের কর্মকুশলতার ফলে। ছোট গ্রহদের তালিকায় 'ভ্যাদিলেনা' (ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিনের সম্মানে), 'মরোজোভিয়া

আর 'ফিগ্‌নেরিয়া' (দুজন বীর রুশ বিপ্লবীর সম্মানে), 'সিমেইজা' প্রভৃতি নাম দেখলে পাঠকদের অবাক হবার কোন কারণ থাকবে না। গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কারের সংখ্যার দিক দিয়ে সিমেইজ দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রবর্তী মানমন্দিরগুলির একটি। গ্রহাণুপুঞ্জ সংক্রান্ত তত্ত্বীয় প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপক কাজের ক্ষেত্রে সোভিয়েত জ্যোতির্বিদরা বিশিষ্টস্থান অধিকার করেন। লেনিনগ্রাদে তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিদ্যা ইনস্টিটিউটে বহুসংখ্যক ছোট গ্রহের অবস্থান আগে থেকে চার্ট করার ক্ষেত্রে আর তাদের গতিতত্ত্বের বিকাশে বহু বছর ধরে কাজ চলেছে। প্রতি বছর সেখান থেকে দুনিয়ার সব মানমন্দিরের জন্য ছোট গ্রহদের অবস্থানের কথা (তথাকথিত **এফিমেরি**) আগে থেকে নির্দেশ করে প্রকাশ করা হয়।

ছোট গ্রহদের আকারের পার্থক্য বিরাট। অল্প কয়টিই সিরিস বা পাল্লাসের মতো (ব্যাস ৪৯০ কিঃমিটার) বড়। প্রায় ৭০টির ব্যাস ১০০ কিঃমিটারের বেশি। অনেকের ব্যাস ২০ থেকে ৪০ কিঃমিটার। তারপর আছে অসংখ্য বেশ 'ছোট্ট' গ্রহাণুপুঞ্জ। তাদের ব্যাস কোনরকমে ২ কি ৩ কিঃমিটারে ঠেকে ('ছোট্ট' কথাটাকে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়েছি তার কারণ জ্যোতির্বিদরা যখন ও-কথাটি উচ্চারণ করেন তখন তার আপেক্ষিক অর্থই নিতে হয়)। গ্রহাণুপুঞ্জের সব সদস্যেরা চার্টে মোটেই ধরা পড়েনি কিন্তু তবু আমরা বলতে পারি যে আবিষ্কৃত আর অনাবিষ্কৃত গ্রহাণুপুঞ্জের মোট ভর পৃথিবীর হাজার ভাগের এক ভাগ। আজ পর্যন্ত আধুনিক দূরবীনের আওতায় পড়ে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা অনুমিত গ্রহাণুপুঞ্জের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ।

'মনে হতে পারে যে গ্রহাণুপুঞ্জের পদার্থিক ধর্ম প্রায় সমানই,' গ. নেউইমিন বলছেন, আসলে কিন্তু তাদের বৈচিত্র্যে স্তম্ভিত হতে হয়। যেমন, প্রথম চারটি গ্রহাণুপুঞ্জের প্রতিফলন ধর্ম নির্ধারণ করে দেখা গেছে, যে সিরিস আর পাল্লাস পৃথিবীর কালো শিলার মতো করেই আলো প্রতিফলিত করে, জুনো করে হালকা রঙের শিলার মতো আর ভেস্টা সাদা মেঘের মতো। ছোট বলে এদের কোন বায়ুমণ্ডল থাকা সম্ভব নয়, তাই এই ঘটনা আরো বেশি বিস্ময়কর। অথচ এ ঘটনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই প্রতিফলন ধর্মের পার্থক্যকে আমরা গ্রহাণুপৃষ্ঠের পদার্থের ফল বলে মানতেই বাধ্য।'

কোন কোন ছোট গ্রহের ঔজ্জ্বল্যে তারতম্য ঘটে। তা থেকে বোঝা যায়, তারা অক্ষাবর্তন করে ও তাদের গঠন অসম।

আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীরা

পূর্বোক্ত গ্রহাণু এডনিস শুধু যে তার ধূমকেতুর মতো অত্যন্ত দীর্ঘায়িত কক্ষপথের জন্যই উল্লেখযোগ্য তা নয়; তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সে পৃথিবীর খুব কাছে আসে। যে বছরে এডনিস আবিষ্কৃত হয় সে বছরে সে ১৫,০০,০০০ কিঃমিটার দূরে ছিল।

চাঁদ আরো কাছে হলেও আর আরো বড় হলেও তার পদমর্যাদা নিচে। কারণ সে উপগ্রহ, স্বাধীন গ্রহ নয়। আরেকটি গ্রহাণু এপলো-ও পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীদের একটি বলে দাবী করতে পারে। আবিষ্কারের বছরে এপলো পৃথিবী থেকে মাত্র ৩০,০০,০০০ কিঃমিটার দূরে ছিল। গ্রহদের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি দূর নয়। কারণ মঙ্গল যখন সবচেয়ে কাছে আসে তখন ৫,৫০,০০,০০০ কিঃমিটার দূরে থাকে। শুক্র তো কখনোই ৪,০০,০০,০০০ কিঃমিটারের চেয়ে কাছে আসে না। কৌতূহলের বিষয় হল এই গ্রহাণু আবার শুক্রের আরো কাছ দিয়ে যায়, ২,০০,০০০ কিঃমিটার দূর দিয়ে, তা চাঁদ আর পৃথিবীর অর্ধেক ব্যবধানের সমান! এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তার মধ্যে এইটেই হল সৌরমণ্ডলীতে ঘনিষ্ঠতম আন্তর্গ্রহ সম্বন্ধ।

আমাদের এই প্রতিবেশী গ্রহটি লিপিবদ্ধ গ্রহকুলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বলেও উল্লেখযোগ্য। তার ব্যাস নিশ্চিতভাবেই ২ কিঃমিটারের বেশি নয়, বরং আরো কম হতে পারে। ১৯৩৭ সালে হের্মেস আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রহাণু একেক সময় চাঁদের মতো পৃথিবীর সমান কাছে আসে (৫,০০,০০০ কিঃমিটার)। তার ব্যাস ১ কিঃমিটারের বেশি নয়।

এই গ্রহাণুটিকে নিয়ে একবার দেখা যাক জ্যোতির্বিদ্যায় 'ছোট্ট' বলতে কী বোঝায়। এই ছোট্ট গ্রহকণিকাটি—যার ঘনত্ব হল মাত্র ০·৫২ কিঃমিঃ৩, তার মানে ৫২,০০,০০,০০০ ঘন মিটার — গ্রানিটে গঠিত হলে তার ওজন হত প্রায় ১৫০,০০,০০,০০০ টন। এতটা গ্রানিট দিয়ে চেওপ্‌স্‌ পিরামিডের মতো ৩০০ পিরামিড গড়া যেত।

এ থেকেই বোঝা যাবে জ্যোতির্বিদ্যায় 'ছোট্ট' কথাটির মানে কী।

বৃহস্পতির সহযাত্রীরা

১,৬০০ পরিচিত গ্রহাণুপুঞ্জের পনেরটির নামকরণ ঘটেছে ট্রোজান বীরদের নামানুযায়ী, **আকিলিস, পাট্রোক্লুস, হেক্‌টর, নেস্টর, প্রিয়ামাস, আগামেনন** ইত্যাদি। তারা তাদের গতিবৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি 'ট্রোজানই' সূর্যের কাছ দিয়ে পাক খায়। তার ফলে সব অবস্থাতেই গ্রহাণু, বৃহস্পতি আর সূর্য থাকে এক একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিন চূড়ায়। 'ট্রোজান'দের বৃহস্পতির সহযাত্রী বলা যায়। তারা বৃহস্পতিকে সঙ্গ দেয় বেশ দূর থেকে—কেউ বৃহস্পতির সামনে ৬০° পর্যন্ত, কেউ তার পিছনে ঠিক অতটাই দূরে থাকে। কিন্তু সবাই একই কালপর্বে সূর্যকে পাক দেয়।

গ্রহ ত্রিভুজের স্থিতিসাম্যটা স্থায়ী। গ্রহকণিকা তার স্থানচ্যুত হলেও মাধ্যাকর্ষণ তাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনবে।

'ট্রোজানরা' আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই তিনটি আকর্ষণকারী বস্তুর এ-রকমের সচল ভারসাম্যের কথা আগে থেকেই বলা হয়েছিল ফরাসী গণিতবিদ লাগ্রাঁজের নিতান্ত তত্ত্বীয় অনুসন্ধানে। একটা কৌতূহলজনক গাণিতিক সমস্যা হিসাবে লাগ্রাঁজ এটা নিয়ে খাটেন। আর বলেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন জায়গায় বাস্তবে এ-রকমের সম্বন্ধ দেখা যেতে পারে না। গ্রহাণুপুঞ্জের নিরলস অনুসন্ধানের ফলে লাগ্রাঁজের অনুমানের বাস্তব নিদর্শন আমাদের গ্রহপরিবারেই পাওয়া যায়। ছোট গ্রহ নামে পরিচিত জ্যোতিষ্ক দল নিয়ে সযত্ন চর্চা যে কত প্রয়োজনীয় তার চমৎকার প্রমাণ হল এই ঘটনা।

অন্য আকাশ

আমরা আগেই কল্পনায় চাঁদে গিয়ে পৃথিবী আর অন্য সব জ্যোতিষ্ক সেখান থেকে কেমন দেখায় তা দেখেছি।

এবার সৌরমণ্ডলীর অন্য গ্রহে গিয়ে দেখি তাদের আকাশের ছবিগুলো কী রকম।
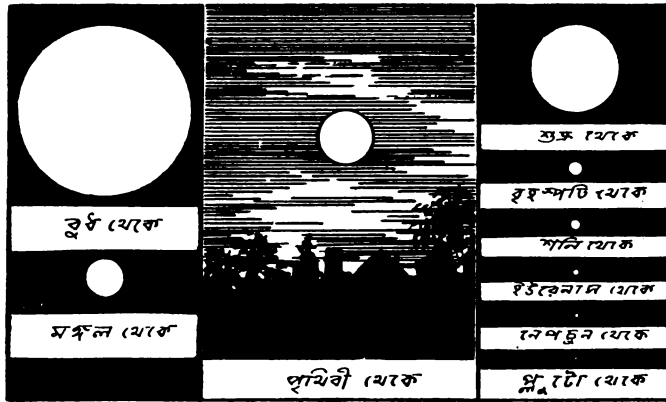
৬৮ নং ছবি: পৃথিবী আর অন্য গ্রহ থেকে সূর্যের আপাত আকার।

শুক্র থেকে সুরু করব। তার বায়ুমণ্ডল যদি যথেষ্ট স্বচ্ছ হয় তাহলে সেখানে আমাদের আকাশের সূর্যের চেয়ে দ্বিগুণ বড় এক সূর্যকে দেখতে পাব (৬৮ নং ছবি)। তার মানে এই সূর্য শুক্রকে পৃথিবীর চেয়ে দ্বিগুণ বেশি উত্তাপ আর আলো দেয়। শুক্রের নিশীথ আকাশে আমরা একটি অসাধারণ উজ্জ্বল তারা দেখতে পাব। সেটি হল পৃথিবী, আমাদের আকাশে শুক্র যতটা উজ্জ্বল এ তারাটি দেখাবে তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, যদিও আকারে দুটি গ্রহই প্রায় সমান। এ ঘটনার কারণটা সহজ। পৃথিবীর চেয়ে শুক্রই সূর্যের

বেশি কাছে। তাই সে যখন পৃথিবীর কাছে আসে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পাই না কারণ তখন সে তার আঁধার মুখটাই আমাদের দিকে ফিরিয়ে রাখে। দেখা দিতে হলে তাকে কিছুটা একপাশে সরে যেতে হবে। তাহলে সরু বাঁকা ফালির আকারে আলো বিচ্ছুরিত হবে. শুক্রের চক্রে একটা ছোট অংশে তা পড়বে। অথচ পৃথিবী যখন শুক্রের সবচেয়ে কাছে আসে তখন সে ঐ আকাশে পূর্ণ চক্রে জ্বলে, আমাদের মুখোমুখি এসে মঙ্গল যেমন জ্বলে। তার ফলে শুক্রের আকাশে পৃথিবী তার পূর্ণ কলায় আমাদের আকাশে শুক্রের সবচেয়ে উজ্জ্বলতার চেয়ে ছ'গুণ বেশি উজ্জ্বল হবে। অবশ্য সেটা ঘটবে আমাদের প্রতিবেশীর আকাশটা যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তবেই। শুক্রের রাত্রে যে রুপোলি পাংশুধূসর আভা দেখা যায় সেটাকে অঢেল পৃথিবী-জ্যোৎস্নার ফল বলে মনে করলে ভুল করা হবে। একটা সাধারণ মোমবাতিকে ৩৫ মিঃ দূরে রাখলে যতটা আলো পাওয়া যায়, পৃথিবীও শুক্রকে প্রায় ততটা আলোই দেয়। শুক্রের রুপোলি আভা ফোটানর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

শুক্রের আকাশে 'পৃথিবী-জ্যোৎস্নার' সঙ্গে প্রায়ই যোগ দেয় চাঁদের আলো। সেখানে তা লুব্ধকের চেয়ে চার গুণ বেশি উজ্জ্বল। শুক্রের আকাশে পৃথিবী-চাঁদ মিলিতভাবে যেরকম দেখা দেয় সেরকম চিত্তাকর্ষক কোন বস্তু সারা সৌরমণ্ডলীতে পাওয়া বোধহয় অসম্ভব। শুক্রের দর্শক অধিকাংশ সময়েই পৃথিবী আর চাঁদকে পৃথকভাবে দেখবেন। দূরবীন দিয়ে তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠের খুঁটিনাটি দেখতে পাবেন।

শুক্রের আকাশে বুধ হল আরেকটি উজ্জ্বল গ্রহ। শুক্রের ভোরের তারা, সন্ধ্যাতারা। বুধকে অবশ্য পৃথিবী থেকে উজ্জ্বল তারার মতো দেখায়, লুব্ধককেও সে উজ্জ্বলতায় হারিয়ে দেয়। শুক্রের আকাশে সে কিন্তু পৃথিবীর আকাশের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি উজ্জ্বল। তেমনি আবার মঙ্গল আড়াই গুণ কম আলো দেয়, আমাদের বৃহস্পতির চেয়েও কিছু নিষ্প্রভ।

স্থির তারাদের বেলায় নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানটা সৌরমণ্ডলীর সব গ্রহের আকাশেই একেবারে এক। বুধ, বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন বা প্লুটো যেখানেই থাকি না কেন একই নক্ষত্রজগৎ দেখব। এতেই বোঝা যায় আন্তর্গ্রহ দূরত্বের তুলনায় তারারা আরো কত দূরে।

* * *

এবার শুক্র ছেড়ে বুধে যাওয়া যাক। সে এক অদ্ভুত জগৎ। তাতে না আছে বায়ুমণ্ডল না দিনরাত্রির বদল। এখানে সূর্য আকাশে স্থির হয়ে ঝুলে থাকে। সে সূর্য হল পৃথিবী থেকে যাকে দেখা যায় আয়তনে তার ছ'গুণ বড় (৬৮ নং ছবি)। বুধ থেকে আমাদের গ্রহ তারার মতো জ্বলে, আমাদের আকাশের শুক্রের চেয়ে সেখানে সে দ্বিগুণ উজ্জ্বল।

শুক্রও সে আকাশে অসাধারণ রকম উজ্জ্বল। বুধের কালো মেঘমুক্ত আকাশে শুক্র যেমন অত্যুজ্জ্বল আমাদের সৌরমন্ডলীর আর কোথাও কোন তারা বা গ্রহ সেরকম উজ্জ্বল হয় না।

* * *

আমাদের পরবর্তী যাত্রা **মঙ্গলে**। এখানে সূর্যকে আয়তনের দিক দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ ছোট বলের মতো দেখায় (৬৮ নং ছবি)। মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীকে ভোরের তারা আর সন্ধ্যাতারার মতো দেখায়, আমাদের আকাশে শুক্রের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাতেই, তবে তার ঔজ্জ্বল্য কম, বৃহস্পতিকে আমরা যেমন দেখি অনেকটা সেরকম। এখানে পৃথিবীকে কখনো তার পূর্ণকলায় দেখা যায় না। মঙ্গলের অধিবাসী কখনোই পৃথিবীর চক্রের তিন চতুর্থাংশের বেশি দেখতে পাবে না। চাঁদকে সে খালি চোখেই দেখবে, লুব্ধকের মতো উজ্জ্বল। দূরবীনে পৃথিবী আর তার সঙ্গী চাঁদের কলাগুলো দেখা যাবে।

এখানে মঙ্গলের নিকটতম উপগ্রহ ফোবোসের কথা বলতে হবে। উপগ্রহটি মঙ্গলের এত কাছে যে তার আকার সামান্য হলেও (১৬ কিঃমিটার ব্যাস) আমাদের আকাশে শুক্রের চেয়ে 'পূর্ণ ফোবোস' ২৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল। দ্বিতীয় উপগ্রহ ডেইমোস আরো অনেক কম উজ্জ্বল হলেও মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীকে সে হার মানিয়ে দেয়। ফোবোস মঙ্গলের খুব কাছে থাকে বলে ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও তার কলাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। চোখ যার ভাল সে বোধহয় ডেইমোসের কলাগুলোও দেখতে পাবে (মঙ্গলে ডেইমোসকে ১ কোণ থেকে দেখা যায়, ফোবোসকে প্রায় ৬′ কোণ থেকে)।

আর একবার আগে কিছুক্ষণের জন্য মঙ্গলের নিকটতম উপগ্রহের বুকে দাঁড়ান যাক। এই জায়গা থেকে আমরা একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাব। একটা বিরাট চক্র, দ্রুত তার কলাগুলো বদলে চলেছে, আমাদের চাঁদের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল। এই হল মঙ্গল। তার চক্র আকাশের ৪১° জুড়ে থাকে — আমাদের আকাশে চাঁদের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি। একমাত্র বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহ থেকে এ-রকম অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা সম্ভব।

* * *

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য সদ্য উক্ত বিরাট গ্রহটি। **বৃহস্পতির** আকাশ পরিষ্কার থাকলে আমাদের আকাশের সূর্যের চেয়ে তার সূর্যের গোলক আয়তনে ২৫ গুণ ছোট হবে (৬৮ নং ছবি।)। আর অত গুণই বেশি নিষ্প্রভ হবে। এখানে পাঁচ ঘণ্টার হ্রস্ব দিন দ্রুত রাত্রে পরিণত হয়। তাই এই নক্ষত্রখচিত আকাশে পরিচিত গ্রহগুলোকে দেখা যাক। তাদের অবশ্যই খুঁজে পাব, কিন্তু খুবই পরিবর্তিত আকারে! বুধ তো একেবারেই সূর্যের আলোয়

হারিয়ে গেছে। শুক্র আর পৃথিবী কেবল গোধূলির সময় দূরবীন দিয়ে দেখা সম্ভব — তারা সূর্যের সঙ্গেই অস্ত যায়।* মঙ্গল প্রায় অদৃশ্য। অথচ শনি সফলভাবেই লুব্ধকের সঙ্গে ঔজ্জ্বল্যের পাল্লা দেয়।

বৃহস্পতির আকাশে তার চাঁদেরাই প্রধান। ১ আর ২ নং উপগ্রহ শুক্র-আকাশের পৃথিবীর সমান উজ্জ্বল, তৃতীয় তিন গুণ বেশি উজ্জ্বল, ৪র্থ আর ৫মটি লুব্ধকের চেয়ে কয়েক গুণ উজ্জ্বলতর। আকারের দিক দিয়ে প্রথম চারটি উপগ্রহের দৃশ্য ব্যাস সূর্যের দৃশ্য ব্যাসের চেয়ে বড়। প্রতি আবর্তনে প্রথম তিনটি উপগ্রহ বৃহস্পতির ছায়ায় পড়ে, তাই তারা কখনো পূর্ণকলায় দেখা দেয় না। পূর্ণ সূর্যগ্রহণও দেখা যায়, কিন্তু কেবল বৃহস্পতির বুকের খুবই একটা সংকীর্ণ ফালি থেকে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের পক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো স্বচ্ছতা প্রায় অসম্ভব। কারণ তা অত্যন্ত উঁচু আর ঘন। এত ঘনত্বের ফলে আলোক প্রতিসরণ সঞ্জাত এক অদ্ভুত দৃষ্টিভ্রম সৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে আলোর বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ খুবই সামান্য। তার ফলে কেবল জ্যোতিষ্কগুলির কিছুটা করে উন্নয়ন (দৃষ্টিগত) ঘটে (৩৭ পৃঃ দ্রঃ)। বৃহস্পতির উচ্চ আর ঘন বায়ুমণ্ডল অনেক বেশি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভ্রম ঘটাতে পারে। বৃহস্পতি পৃষ্ঠের কোন বিন্দু থেকে যেসব রশ্মি ট্যারচাভাবে বেরয় তারা (৬৯ নং ছবি) বায়ুমণ্ডল একেবারে ত্যাগ করে না, তারা গ্রহের বুকের দিকে বেঁকে আসে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রেডিও তরঙ্গ যেমন করে। এই বিন্দুতে দর্শক অসাধারণ কিছু দেখতে পাবেন। তাঁর মনে হবে তিনি যেন এক বিরাট বাটির গর্ভে দাঁড়িয়ে আছেন। কার্যত বিরাট গ্রহটির পুরো পৃষ্ঠটাই মনে হবে তার পেটের মধ্যে, প্রান্তের বহিঃরেখাগুলি খুবই চেপে যাবে। মাথার উপরে আকাশ। আমাদের মতো অর্ধেক আকাশ নয়। প্রায় **পুরোটাই।** বাটির একেবারে শেষে একটা অস্বচ্ছ কুয়াশা ঘেরা পাড়ে সে আকাশ শেষ হয়ে গেছে। এই আকাশ থেকে সূর্য কখনোই সরবে না। তার ফলে গ্রহের সব জায়গা থেকেই মধ্যরাত্রির সূর্য দেখা যাবে। অবশ্য বৃহস্পতির এই সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্যিই আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।
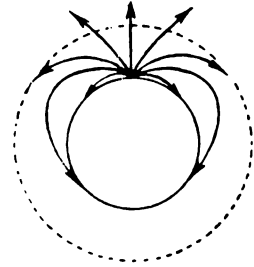
৬৯ নং ছবি: বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে আলো সম্ভবত এই ভাবে বেঁকে যায় (এ ঘটনার ফলের কথা বইয়ে বলা হয়েছে)।

নিকটতম উপগ্রহ থেকে বৃহস্পতির একটা বড় ছবি (৭০ নং ছবি) এক বিস্ময়কর দৃশ্য তুলে ধরবে। পঞ্চম এবং নিকটতম উপগ্রহ থেকে দেখলে তার বিরাট চক্রটির ব্যাস

* বৃহস্পতির আকাশে পৃথিবী হল অষ্টম মাত্রার তারার মতো।

চাঁদের প্রায় ৯০ গুণ বড় হবে।* সূর্যের চেয়ে তার ঔজ্জ্বল্য মাত্র ছয় কি সাত গুণ কম। তার নিম্নাঙ্গ যখন দিগন্ত ছুঁচ্ছে, ঊর্ধ্বাঙ্গ তখন আকাশের কেন্দ্রে। দিগন্তে ডোবার সময় চক্রবালের ৮ ভাগের এক ভাগ জুড়ে থাকে। মাঝেমাঝে এই দ্রুত আবর্তিত চক্রের উপর

৭০ নং ছবি: বৃহস্পতির দৃশ্য তার তৃতীয় উপগ্রহ থেকে।

দিয়ে অন্ধকার সব বৃত্ত পার হয়ে যায়। তারা হল বৃহস্পতির চাঁদদের ছায়া। এই বিরাট গ্রহে চোখে পড়ার মতো 'গ্রহণ' ঘটাতে তারা অক্ষম।

* * *

এখন যাওয়া যাক **শনিতে**। আমরা কেবল দেখব তার বিখ্যাত বলয়গুলোকে কেমন দেখায়। প্রথমেই আমরা আবিষ্কার করব শনির সব জায়গা থেকে বলয়গুলি দেখা যায় না। যেমন মেরু থেকে ৬৪ অক্ষাংশ পর্যন্ত তাদের মোটেই দেখা যাবে না। এই এলাকার সীমানায় কেবল বাইরের বলয়ের প্রান্তটা দেখতে পাব (৭১ নং ছবি)। ৬৪ আর ৫০ অক্ষাংশের মধ্যে বলয়দের ভাগ করে দেখা যায়। ৫০ অক্ষাংশে দর্শক বলয়গুলির পুরো পরিধি চমৎকার দেখবে। এখানে তাদের সবচেয়ে বৃহত্তম কোণ ১২°তে দেখা যায়। বিষুবরেখার কাছে তারা সংকীর্ণ হয়ে আসে, যদিও দিগন্তের বেশ ঊর্ধ্বে থাকে। বিষুবরেখায় বলয়গুলিকে কেবল সংকীর্ণ রেখার মতো দেখায়, সুবিন্দুকে তা পশ্চিম থেকে পুবে কেটে যায়।

---

* ঐ উপগ্রহ থেকে দেখলে বৃহস্পতির কৌণিক ব্যাস হয় ৪৪°রও বেশি।

এটাই পুরো ছবি নয়। মনে রাখতে হবে যে **বলয়গুলির একটি পাশ মাত্র আলোকিত।** অন্যটা ছায়ায় ঢাকা। আলোকিত দিকটা শনির যে অর্ধাংশের দিকে মুখ করে থাকে কেবল সেখান থেকে দেখা যায়। দীর্ঘ শনিবর্ষের অর্ধেকটাতে আমরা বলয়গুলিকে কেবল গ্রহের একার্ধ থেকে দেখি (বাকি সময়টায় তাদের অপরার্ধ থেকে দেখা যায়), আর তাও প্রধানত দিনের বেলায়। রাত্রে অল্পকালের জন্য বলয়গুলিকে যখন দেখা যায় তখনো তারা
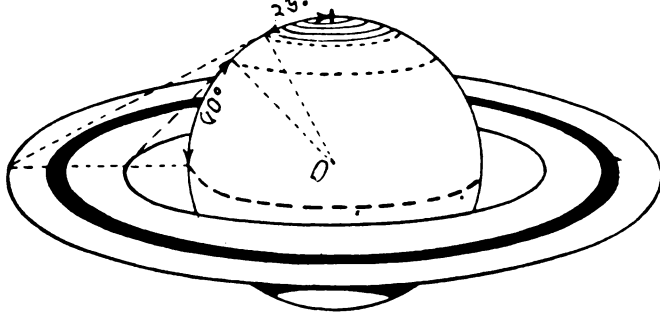
৭১ নং ছবি: শনির নানা জায়গা থেকে তার বলয়গুলির দৃশ্যমানতার পরিমাণ কী করে জানা যায়। মেরু আর ৬৪ নং সমান্তরালের মধ্যে তাদের একেবারেই দেখা যায় না।

প্রায়ই গ্রহের ছায়ায় ঢাকা পড়ে। শেষে আরেকটি কৌতূহলজনক তথ্য: বিষুবাঞ্চল বেশ কয়েক পার্থিব বছর ধরে বলয়গুলির ছায়ায় ঢাকা থাকে।

শনির একটি নিকটতম উপগ্রহ থেকে দর্শক যা দেখবেন তাঁর কাছে জ্যোতিষ্ক রাজ্যের সব দৃশ্য একেবারেই হার মেনে যায়। বিশেষ করে অপূর্ণ কলায় শনি যখন বাঁকা ফালির আকার নেয়, তখন বলয়মণ্ডলিত শনির যে দৃশ্য তা গ্রহপরিবারে আর কোথাও দেখা যাবে না। আকাশে দেখতে পাব এক বিরাট বাঁকা ফালি, বলয়ের এক সরু ফিতে তাকে কেটে চলে গেছে, আর তাদের দেখা যাচ্ছে প্রান্তচক্রের দিক থেকে। তাদের ঘিরে রয়েছে শনির একদল উপগ্রহ। তারাও বাঁকা ফালির আকারের, কেবল অনেক ছোট।

* * *

বিভিন্ন গ্রহের আকাশে নানা জ্যোতিষ্কের আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্য, বেশি থেকে কম এই ক্রমানুযায়ী, দেখান হয়েছে নিচের তালিকায়:

(১) বুধ থেকে শুক্র
(২) শুক্র থেকে পৃথিবী
(৩) বুধ থেকে পৃথিবী
(৪) **পৃথিবী থেকে শুক্র**
(৫) মঙ্গল থেকে শুক্র
(৬) মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি
(৭) **পৃথিবী থেকে মঙ্গল**
(৮) শুক্র থেকে বুধ
(৯) মঙ্গল থেকে পৃথিবী
(১০) **পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি**
(১১) শুক্র থেকে বৃহস্পতি
(১২) বুধ থেকে বৃহস্পতি
(১৩) বৃহস্পতি থেকে শনি

সংখ্যায় গ্রহপরিবার

আকার। ভর। ঘনত্ব। উপগ্রহ

নাম	মধ্য ব্যাস			আয়তন	ভর	ঘনত্ব		উপগ্রহের সংখ্যা
	দৃশ্য	প্রকৃত						
	এত ″তে	কিঃমিটার	♁ = ১	♁ = ১	♁ = ১	♁ = ১	জল=১	
বুধ . .	১৩ — ৪·৭	৪,৭০০	০·৩৭	০·০৫০	০·০৫৪	১·০০	৫·৫	—
শুক্র . .	৬৪ — ১০	১২,৪০০	০·৯৭	০· ৯০	০·৮১৪	০·৯২	৫·১	—
পৃথিবী .	—	১২,৭৫৭	১·০	১· ০০	১·০০০	১·০০	৫·৫২	১
মঙ্গল . .	২৫ — ৩·৫	৬,৬০০	০·৫২	০· ১৪	০·১০৭	০·৭৪	৪·১	২
বৃহস্পতি .	৫০ — ৩০·৫	১,৪২,০০০	১১·২	১, ২৯৫	৩১৮·৪	০·২৪	১·৩৫	১২
শনি	২০·৫ — ১৫	১,২০,০০০	৯·৫	৭৪৫	৯৫·২	০·১৩	০·৭১	৯
ইউরেনাস .	৪·২ — ৩ ·৪	৫১,০০০	৪·০	৬৩	১৪·৬	০·২৩	১·৩০	৫
নেপচুন	২·৪ — ২ ·২	৫৫,০০০	৪·৩	৭৮	১৭·৩	০·২২	১·২০	২
প্লুটো . .	০ · ২ ?	৫,৯০০	০·৪৭	০·১	?	?	?	?

দূরত্ব। প্রদক্ষিণ। অক্ষাবর্তন। মাধ্যাকর্ষণ

নাম	মধ্য দূরত্ব		কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা	পার্থিব বছরের সংখ্যায় সূর্য প্রদক্ষিণ কাল	কক্ষ প্রদক্ষিণের মধ্য গতি সেকেণ্ডে কত কিলোমিটার	অক্ষাবর্তনের কাল	কক্ষতলের সঙ্গে বিষুব তলের কোণ	মাধ্যাকর্ষণ ♀ = ১
	জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক	১০ লক্ষ কিলোমিটারের হিসেবে						
বুধ	০·৩৮৭	৫৭·৯	০·২১	০·২৪	৪৭·৮	৮৮ দিঃ	?	০·২৬
শুক্র	০·৭২৩	১০৮·১	০·০০৭	০·৬২	৩৫	৩০ দিঃ?	?	০·৯০
পৃথিবী	১·০০০	১৪৯·৫	০·০১৭	১	২৯·৭৬	২৩ ঘঃ ৫৬ মিঃ	২৩°২৭′	১
মঙ্গল	১·৫২৪	২২৭·৮	০·০৯৩	১·৮৮	২৪	২৪ ঘঃ ৩৭ মিঃ	২৫°১০′	০·৩৭
বৃহস্পতি	৫·২০৩	৭৭৭·৮	০·০৪৮	১১·৮৬	১৩	৯ ঘঃ ৫৫ মিঃ	৩°০১′	২·৬৪
শনি	৯·৫৩৯	১,৪২৬·১	০·০৫৬	২৯·৪৬	৯·৬	১০ ঘঃ ১৪ মিঃ	২৬°৪৫′	১·১৩
ইউরেনাস	১৯·১৯১	২,৮৬৯·১	০·০৪৭	৮৪·০২	৬·৮	১০ ঘঃ ৪৮ মিঃ	৯৮°০০′	০·৮৪
নেপচুন	৩০·০৭১	৪,৪৯৫·৭	০·০০৯	১৬৪·৮	৫·৪	১৫ ঘঃ ৪৮ মিঃ	২৯°৩৬′	১·১৪
প্লুটো	৩৯·৪৫৮	৫,৮৯৯·১	০·২৫	২৪৭·৭	৪·৭	?	?	?

৭২ নং ছবি: ১০০ গুণ বর্ধিত করার ক্ষমতাসহ দূরবীনে দৃষ্ট চাঁদ আর গ্রহরা।
করার ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীনে

৪, ৭ আর ১০ নম্বরকে আমরা বড় হরফে দিয়েছি — অর্থাৎ **পৃথিবী থেকে** গ্রহদের কেমন দেখায় — সেটা। কারণ তাদের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে অন্য গ্রহ থেকে জ্যোতিষ্কদের দৃশ্যমানতা মাপার কাজে তাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজে লাগান যাবে। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে আমাদের গ্রহ সূর্যের নিকটবর্তীদের মধ্যে একটা প্রধান স্থান পায়: এমন কি বুধের আকাশেও পৃথিবী আমাদের আকাশে শুক্র আর বৃহস্পতির চেয়ে উজ্জ্বলতর।

ছবিটাকে চোখ থেকে ২৫ সেঃমিঃ দূরে ধরতে হবে; তাহলে নির্দিষ্ট বর্ধিত তাদের যেমন দেখায় সেরকম দেখাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'গ্রহদের নাক্ষত্র মাত্রা' অংশে আবার পৃথিবী আর অন্য গ্রহদের আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্যের সঠিক মূল্যায়নে হাত দেব।

শেষে সৌরমণ্ডলী সম্বন্ধে এমন কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া যাক যা খুবই কাজে লাগে।

সূর্য: ব্যাস ১৩,৯০,৬০০ কিঃমিটার, পৃথিবীর আয়তনের চেয়ে ১৩,০১,২০০ গুণ বড়, ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩,৩৩,৪৩৪ গুণ বেশি, ঘনত্ব ১·৪১ গুণ (জল = ১)।

চাঁদ: ব্যাস ৩,৪৭৩ কিঃমিটার, পৃথিবীর তুলনায় আয়তন ০·০২০৩ গুণ কম, ভর

পৃথিবীর চেয়ে ০·০১২৩ গুণ কম, ঘনত্ব ৩·৩৪ (জল = ১)। পৃথিবী থেকে মধ্য দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিঃমিটার।

১২৬ — ১২৭ পৃষ্ঠায় যে তালিকা রয়েছে তাতে সৌরমণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহের বিষয়ে নানা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৭২ নং ছবিতে ছোট দূরবীনে গ্রহগুলি কেমন দেখাবে তার ছবি দেওয়া হয়েছে একশ গুণ বাড়িয়ে। বাঁয়ে সমান গুণ বাড়ান চাঁদ, তাকে রাখা হয়েছে তুলনার জন্য। (ছবিটিকে ধরতে হবে সুস্পষ্ট দৃষ্টির বিন্দুতে, তার মানে চোখ থেকে ২৫ সেঃমিটার দূরে।) উপরে রয়েছে বুধ, সমান বর্ধিত আকারে, আমাদের কাছ থেকে নিকটতম আর দূরতম অবস্থায়। তারপর ক্রমান্বয়ে রয়েছে শুক্র, মঙ্গল, বার্হস্পত্য পরিবার আর বৃহত্তম উপগ্রহগুলি নিয়ে শনি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারারা

তারাদের তারার মতো দেখায় কেন?

খালি চোখে তারাদের দিকে তাকালে দেখি তাদের ছটা বেরচ্ছে তারার আকারে। তার কারণটা আমাদেরই চোখ; এ চোখের কেলাসিত লেন্‌সের স্বচ্ছতা যথেষ্ট নয়, তার গঠন ভাল লেন্‌সের মতো সমমাত্র নয়, তন্তুময়। এ বিষয়ে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস তাঁর 'দৃষ্টি তত্ত্বের সাফল্য' গ্রন্থে বলেছেন:

'আলোর বিন্দু চোখে তারার মতো একটা ত্রুটিপূর্ণ রূপ গড়ে তোলে। তার কারণ কেলাসিত লেন্‌স, ছয়টি বিভিন্ন দিকে তার তন্তুগুলো প্রসারিত। যে রশ্মিগুলো আমরা আলোর বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে করি, যেমন তারা বা দূরের আলো, তারা হল কেবল কেলাসিত লেন্‌সের অরীয় (radial) গঠনের প্রতিফলন। চোখের এই দুর্বলতার সর্বজনীনতার প্রমাণ হল যে কোন রশ্মিজাতের বস্তুকে সাধারণত তারার আকারের বলা হয়ে থাকে।'

চাইলে পর আমরা কেলাসিত লেন্‌সের এই ত্রুটি দূর করতে পারি। তারাদের দেখতে পারি অরীয় জ্যোতি ছাড়াও। আর তাও দূরবীন ছাড়াই। তা কী করে করা যায় ৪০০ বছর আগে তা বলে গিয়েছিলেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি।

তিনি লিখেছেন, 'নক্ষত্রদের দেখ ছটা ছাড়াই। সরু ছুঁচ ফুটাইয়া একটি ক্ষুদ্র এপার্চার বানাইয়া তাহাকে চোখে লাগাইয়া তাহার মধ্য দিয়া তাকাইলেই তা সম্ভব হয়। নক্ষত্রগুলি এত ক্ষুদ্র ঠেকিবে যে মনে হইবে ক্ষুদ্রতর আর কিছুই বুঝি সম্ভব নহে।'

এই উক্তি নক্ষত্রছটার উৎপত্তি সম্বন্ধে হেল্‌ম্‌হোলৎসের ধারণার বিপরীত নয়। বরং উক্ত পরীক্ষা সে তত্ত্বকে সমর্থন করে। ছোট্ট এপার্চার দিয়ে দেখার সময় চোখ কেবল একটি সরু আলোকরশ্মিকেই গ্রহণ করে, সে রশ্মি কেলাসিত লেন্‌সের মধ্যভাগ দিয়ে যায়, তাই ঐ লেন্‌সের অরীয় গঠন তার উপর কোন প্রভাব ফেলে না।*

আমাদের চোখের গঠনগুণ যদি আরো নিখুঁৎ হত তাহলে আমরা আকাশে 'তারা' নয়, আলোর বিন্দু দেখতে পেতাম।

গ্রহরা স্থিরভাবে জ্বলে অথচ তারারা চমকায়, কেন?

খালি চোখে আমরা সহজেই স্থির আর 'সচল' তারা বা গ্রহকে** আলাদা করে চিনতে পারি, এমন কি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মানচিত্র ছাড়াই। গ্রহরা দেয় **স্থির** আলো। অথচ তারারা সারাক্ষণই **চমকাচ্ছে** — তারা জ্বলে ওঠে, কাঁপে, তাদের ঔজ্জ্বল্যের বদল ঘটে, আর দিগন্তের কাছের উজ্জ্বল তারাগুলো যত দপদপ করে তার যেন আর শেষ নেই। ফ্লামারিওন বলেছেন, 'কখনো উজ্জ্বল, কখনো ক্ষীণ, কখনো সাদা, কখনো সবুজ বা লাল এই আলো, নির্মলতম হীরের মতো দ্যুতিময়, বিরাট নাক্ষত্র জগৎকে উজ্জীবিত করে তোলে, তাই তারাদের আমরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ বলে মনে করি।' হিমশীতল রাত্রে খ্যাপা বাতাসে ভরা আবহাওয়ায়, প্রবল বৃষ্টির পরে আকাশ যখন দ্রুত মেঘমুক্ত হয়ে যায় তখন তারাদের দেখা যায় বিশেষ করে।*** চক্রবালের তারারা উঁচু আকাশের তারাদের চেয়ে বেশি চমকায়। আর সাদা তারারা বেশি মিটমিট করে হলদে বা লাল তারাদের চেয়ে।

যেমন তারার ছটা তেমনি তার দপদপানিটাও তারাদের নিজস্ব গুণ নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের চোখে ঠেকার সময় এ গুণটা তাদের উপর বর্তায়। আমাদের ঘিরে রাখা যে চঞ্চল গ্যাসীয় বস্তুর মধ্যে দিয়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ডকে দেখি তার ঊর্ধ্বে যদি উঠতে পারতাম তবে দেখতাম তারারা চমকাচ্ছে না, শান্ত স্থির আলো দিচ্ছে।

সূর্যের ক্রিয়ায় মাটি তেতে তাপ-তরঙ্গ উঠলে পর দূরের জিনিস যে কারণে কাঁপে তারারাও সেই কারণেই চমকায়।

তারার আলোকে আসতে হয় সমমাত্র মাধ্যম পেরিয়ে নয়, নানা তাপ ও ঘনত্বের

---

* 'নাক্ষত্র ছটা' মানে তারাদের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালে যে ছটা দেখি — তারা থেকেই আসছে মনে হয় — সে ছটা নয়; এই ছটা চোখের পাতায় আলোর অপবর্তনের (diffraction) ফল।

** গ্রীক ভাষায় 'প্ল্যানেট' (গ্রহ) শব্দটির মানে হল 'সচল তারা'।

*** গ্রীষ্মকালে জোরে চমকটা বৃষ্টির লক্ষণ, সাইক্লোনের সম্ভাবনা জানায়। বৃষ্টির আগে তারারা প্রধানত নীল আলো দেয়। সবুজ আলো দেয় অনাবৃষ্টির সময়।

গ্যাস স্তর, তার ফলে নানা রকমের প্রতিসরণের মধ্যে দিয়ে। এ জাতের বায়ুমণ্ডল যেন অজস্র অপ্‌টিক্যাল প্রিজ্‌ম্‌, অবতল আর উত্তল লেন্‌সের সমষ্টি আর এরা সবাই সদা গতিশীল। এদের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আলো থেকে থেকেই সোজা পথ থেকে সরে যায়, কখনো তা অভিসারী (convergent) কখনো প্রতিসারী (divergent)। এই জন্যই তারাদের ঔজ্জ্বল্যে ঘন ঘন বদল ঘটে। প্রতিসরণের সঙ্গেই রঙেরও ক্ষয় ঘটে বলে তার ঔজ্জ্বল্যের বদলের সঙ্গে সঙ্গে রংও বদলায়।

তারার চমক নিয়ে গবেষণাকারী জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ. তিখোভ বলেছেন, 'একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি চমকান দপদপে তারা কতবার রং বদল করে তা মাপার পথ ও উপায় আছে। বদলগুলো ঘটে অতি দ্রুত আর তার সংখ্যারও বদল ঘটে — সেকেন্ডে কয়েক ডজন থেকে একশ কি তারও বেশি। একটা সহজ পদ্ধতি দিয়েই তা দেখা যায়। একটা বাইনাকুলার নিয়ে একটি উজ্জ্বল তারা দেখার সময় লেন্‌সটা দ্রুত ঘোরাতে থাকুন। একটি তারার বদলে অজস্র নানারঙা তারার বলয় দেখতে পাবেন। চমক যখন মন্থর হয়ে আসে বা লেন্‌সগুলোকে যখন দ্রুত ঘোরান হয়, তখন বলয়টা ভেঙে গিয়ে তারা নয়, নানা রঙের হ্রস্ব দীর্ঘ চাপে পরিণত হয়।'

এখন বলব গ্রহরা কেন তারাদের মতো চমকায় না, স্থির শান্ত দীপ্তি দেয়। গ্রহরা তারাদের চেয়ে আমাদের অনেক নিকটবর্তী। তাই তাদের বিন্দু নয়, বৃত্ত বা আলোক চক্রের মতো দেখি আর এ বৃত্তের ক্ষুদ্র কৌণিক আয়তন তাদের উদ্দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যের ফলে প্রায় চোখেই পড়ে না।

এই আলোক চক্রের প্রতিটি বিন্দু চমকায়। কিন্তু তাদের প্রতিটির দীপ্তি আর রং স্বতন্ত্রভাবে আর ভিন্ন সময়ে বদলায় বলে তারা একে অন্যের পরিপূরক। একটি বিন্দুর ঔজ্জ্বল্যের ক্ষীণতার সঙ্গে আরেকটি বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির যোগ ঘটে যায়, কাজেই গ্রহটির মোট আলোকদান সমানই থাকে। তাই গ্রহদের ঔজ্জ্বল্য থাকে সমান অপরিবর্তিত।

গ্রহরা নানা বিন্দুতে চমকায় কিন্তু নানা সময়ে। তাই আমাদের মনে হয় গ্রহরা চমকায় না।

দিনের আলোয় তারা দেখা সম্ভব কি?

ছ'মাস আগে যে নক্ষত্রমণ্ডলীদের রাত্রে দেখেছিলাম এখন তারা দিনের বেলায় আমাদের মাথার উপরে। ছ'মাস পরে আবার রাতের আকাশে দেখা দেবে। সূর্যের আলোয় আলোকিত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের চোখের আড়ালে রাখে কারণ তারারা যত রশ্মি দেয় বায়ুকণিকারা তার চেয়ে বেশি সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত করে।*

---

* একটি উঁচু পাহাড়, যার নিচে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের ঘনতম আর সবচেয়ে ধূলিপূর্ণ স্তর, তার মাথায় উঠে দিনের বেলাতেও উজ্জ্বল তারাগুলোকে দেখা যাবে। যেমন আরারাৎ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে

তারারা দিনের আলোয় কেন অদৃশ্য তা বোঝা যাবে একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের একটি পাশে কতগুলো ফুটো করুন। এমনভাবে ফুটো করতে হবে যাতে তারা একটা পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে মেলে। তারপর বাইরের দিকে একটা সাদা কাগজ সেঁটে দিন। বাক্সের ভিতরে একটা আলো বসিয়ে সেটাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে যান। ভিতরে আলো আছে বলে রাতের আকাশে তারাদের প্রতীক ফুটোগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। কিন্তু বাক্সের আলোটা না নিভিয়ে ঘরের আলো জেবলে দিন, দেখবেন কাগজের বুকের নকল তারারা নিশ্চিহ্ন: 'দিনের আলো' তাদের নিভিয়ে দিয়েছে।

প্রায়ই পড়া যায় যে গভীর খনি বা কুয়োর তল, লম্বা চিমনী ইত্যাদি থেকে দিনের আলোতেও তারা চোখে পড়ে। এই মতের পিছনে অনেক বিশিষ্ট নাম থাকলেও সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এ কথা ঠিক নয়।

আসলে এ বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন সেই প্রাচীন আরিস্টটল্ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর হের্শেল পর্যন্ত কেউই উক্ত অবস্থায় তারা দেখার হাঙ্গামাটা পোয়াননি। তাঁরা তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য তুলে দিয়েছেন। কিন্তু 'প্রত্যক্ষদর্শীরা' যে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে কত অনির্ভরযোগ্য তা স্পষ্ট হবে নিচের এই দৃষ্টান্ত থেকে। একটি মার্কিন পত্রিকা কুয়োর তল থেকে দিনের বেলা তারা দেখতে পাওয়াটাকে গল্প বলে উড়িয়ে দেয়। এক চাষী তার জোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে একটা ২০ মিটার উঁচু সাইলো-টাওয়ারের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে তিনি দিনের বেলা কাপেল্লা আর আল্‌গোল দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথা যাচাই করায় দেখা গেল তাঁর খামার যে অক্ষাংশে অবস্থিত তাতে তাঁর নির্দিষ্ট দিনে কাপেল্লা আর আল্‌গোল সুবিন্দুতে ছিল না আর তাই সাইলো-টাওয়ারের তল থেকে কিছুতেই দেখা যেতে পারে না।

খনি বা কুয়ো থেকে দিনের বেলায় তারা দেখতে পাওয়ার কোন তত্ত্বীয় কারণও নেই। আগেই বলেছি দিনের বেলায় সূর্যের আলো তারাদের নিভিয়ে দেয় বলেই তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। খনিগর্ভের দর্শকের চোখেও তাই ঘটবে। উক্ত অবস্থায় কেবল পাশ থেকে আগত আলোই বাদ পড়ে। খনির বুকের ঊর্ধ্বে যে বায়ুস্তর তার কণিকাগুলি আলো বিচ্ছুরিত করতে থাকবেই আর তার ফলে তারা দেখায় বাধা দেবে।

এখানে গুরুত্ব হল এইটুকুরই যে কুয়োর দেয়ালগুলো চোখকে উজ্জ্বল রোদ থেকে আড়াল করে। তার ফলে কেবল উজ্জ্বল গ্রহগুলি দেখারই সুবিধা হয়, তারা নয়।

(৫ কিঃমিটার উঁচু) বেলা দুটোয় প্রথম মাত্রার তারাদের পরিষ্কার দেখা যায়। আকাশের গায়ে ঘন নীল রং ফুটে ওঠে।

দূরবীন দিয়ে যে দিনের বেলা তারা দেখা যায় তার কারণ এ নয় যে তাদের 'একটা নলের তল থেকে' দেখা হচ্ছে, অনেকে তাই মনে করেন। তার কারণ হল লেন্সের দ্বারা আলোর প্রতিসরণে বা আয়নায় তার প্রতিফলনে আকাশের পর্যবেক্ষণাধীন অংশটির ঔজ্জ্বল্য কমে যায় আর সেই সঙ্গেই আলোক বিন্দুরূপ তারাদের ঔজ্জ্বল্যও বেড়ে যায়। ৭ সেঃমিঃর দূরবীন দিয়ে আমরা প্রথম মাত্রা এমন কি দ্বিতীয় মাত্রার তারাদেরও দিনের বেলা দেখতে পারি। এ কথা কুয়ো, খনি বা চিমনীর বেলায় খাটে না।

শুক্র, বৃহস্পতি বা প্রতিপক্ষতার সময় মঙ্গলের মতো উজ্জ্বল গ্রহ কিন্তু আবার একেবারে অন্য কাণ্ড ঘটায়। এরা তারাদের চেয়ে অনেক বেশি জোরে জ্বলে তাই উপযুক্ত অবস্থায় তাদের দিনের বেলাতেও দেখা যেতে পারে ('দিবালোকে গ্রহেরা' ৯৯ পৃঃ দ্রঃ)।

নাক্ষত্র মাত্রা কী ব্যাপার?

জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা আছে এমন অনভিজ্ঞ লোকও জানেন যে কোন তারা প্রথম মাত্রার, কোন তারা প্রথম মাত্রার নয়। এই কথাগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত। কিন্তু প্রথম মাত্রার তারার চেয়েও উজ্জ্বল তারা বা শূন্য, এমন কি ঋণ মাত্রার তারার কথা তিনি হয়ত শোনেনওনি। তাঁর কাছে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ককে ঋণ মাত্রার তারা, সূর্যকে 'বিয়োগ ২৭তম মাত্রার তারা' বলে নির্দিষ্ট করা অসংগত মনে হবে। কেউ কেউ এতে ঋণ সংখ্যা (negative number) মতবাদের বিকৃতিও দেখেন। কিন্তু তবু আসলে এ হল ঋণ সংখ্যা তত্ত্ব অনুসরণের চমৎকার নিদর্শন।

প্রথমে মাত্রা দ্বারা নাক্ষত্র শ্রেণীভুক্তি বিষয়ে কয়েকটি তথ্য দেওয়া যাক। বলাই বাহুল্য এ ক্ষেত্রে 'মাত্রা' কথাটি তারাদের জ্যামিতিক আয়তন নয়, তাদের দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য বোঝায়। প্রাচীনেরা উজ্জ্বলতম তারাদের — মানে সন্ধ্যাকাশে যাদের সবপ্রথম দেখা যায় — তাদের প্রথম মাত্রার তারার শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তারপর এসেছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর সবশেষে ষষ্ঠ মাত্রার তারা — সে তারারা খোলা চোখে দেখার সীমানার শেষ প্রান্তে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা তারাদের এই আত্মনির্ভর (subjective) শ্রেণীভুক্তিতে পরবর্তী কালের জ্যোতির্বিদরা সন্তুষ্ট হন না। ঔজ্জ্বল্য শ্রেণীভুক্তির আরো দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা হয়। দেখা গেল, গড়ে উজ্জ্বলতম তারারা (সবাই তারা সমান উজ্জ্বল নয়) খোলা চোখে দেখার সীমানার শেষ প্রান্তবর্তী ক্ষীণতম তারাদের চেয়ে একশ গুণ উজ্জ্বল।

কাছাকাছি মাত্রার দুটি তারার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত যাতে স্থির থাকে তার জন্য নাক্ষত্র ঔজ্জ্বল্যের একটা মান তৈরী হয়। 'আলোক তীব্রতার অনুপাত'এর চিহ্ন যদি হয় n তাহলে দেখি

২য়	মাত্রার	তারারা	১ম	মাত্রার	তারাদের	চেয়ে	n গুণ ক্ষীণতর
৩য়	,,	,,	২য়	,,	,,	,,	n ,, ,,
৪র্থ	,,	,,	৩য়	,,	,,	,,	n ,, ,, ইঃ

১ম মাত্রার তারাদের সঙ্গে অন্য সব মাত্রার তারাদের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় দেখি:

৩য়	মাত্রার	তারারা	১ম	মাত্রার	তারাদের	চেয়ে	$n^২$ গুণ	ক্ষীণতর
৪র্থ	,,	,,	১ম	,,		,,	$n^৩$,,	,,
৫ম	,,	,,	১ম	,,	,,		$n^৪$,,	,,
৬ষ্ঠ	,,	,,	১ম	,,	,,	,,	$n^৫$,,	,,

পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে $n^৫ = ১০০$। লগারিদ্‌মের সাহায্যে আলোক তীব্রতা অনুপাত n'এর গুণ বের করা খুবই সহজ:

$$n = \sqrt[৫]{১০০} = ২\cdot৫^*।$$

তার মানে প্রতি মাত্রার তারারা তাদের পূর্ববর্তী মাত্রার তারাদের চেয়ে ২·৫ গুণ ক্ষীণতর।

নাক্ষত্র বীজগণিত

উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদল সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য। আগেই দেখেছি তাদের ঔজ্জ্বল্য সমান নয়। কোনটা গড় উজ্জ্বলতার চেয়ে বহুগুণ বেশি উজ্জ্বল, অন্যগুলো ক্ষীণতর (গড় উজ্জ্বলতা হল খোলা চোখে দৃষ্ট তারাদের সীমানার প্রান্তবর্তী তারাদের চেয়ে একশ গুণ বেশি উজ্জ্বলতা)।

গড় ১ম মাত্রার তারাদের চেয়ে ২·৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল তারাদের ঔজ্জ্বল্যকে এখন চিহ্নিত করা যাক। ১এর আগে কোন সংখ্যা? শূন্য। তাই এই তারাদের 'শূন্য' মাত্রার তারা বলা হয়। কিন্তু যে তারারা ১ম মাত্রার তারার চেয়ে ২·৫ গুণ নয়, মাত্র ১·৫ গুণ বা দ্বিগুণ উজ্জ্বল তাদের কোথায় বসাব? তারা ১ আর শূন্যের মাঝখানে বসবে, তাই তাদের নাক্ষত্র মাত্রা জানান হয় ধন (positive) দশমিক ভগ্নাংশের সাহায্যে। যেমন '০·৯ মাত্রা' বা '০·৬ মাত্রার' তারা ইত্যাদি। এই তারারা ১ম মাত্রার তারাদের চেয়ে **বেশি উজ্জ্বল।**

এইবার বোঝা যাচ্ছে তারাদের ঔজ্জ্বল্য নির্দেশে কেন ঋণ সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এখন

---

* আরো ঠিক হল ২·৫১২।

শূন্য মাত্রার আলোক তীব্রতাকেও **ছাড়ায়** এমন তারা আছে বলে তাদের ঔজ্জ্বল্য স্বভাবতই শূন্যের ও-দিকের, তার মানে, ঋণ সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে। তাই ঔজ্জ্বল্যের এই সব সংকেত পাওয়া যায় —১, —২, —১·৬, —০·৯ ইত্যাদি।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক কাজে তারার 'মাত্রা' নির্ধারিত হয় ফোটোমিটার যন্ত্র দ্বারা। একটি জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে যার আলোক তীব্রতা পরিচিত এমন একটি তারার ঔজ্জ্বল্য তুলনা করা হয়, কিম্বা ঐ যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট একটা 'কৃত্রিম তারার' সঙ্গে।

আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের নাক্ষত্র মাত্রা হল –১·৬। কানোপাসের (কেবল দক্ষিণ অক্ষাংশে দেখা যায়) নাক্ষত্র মাত্রা হল –০·৯। উত্তর গোলার্ধের উজ্জ্বলতম তারা হল অভিজিৎ (০·১), কাপেল্লা আর স্বাতী (০·২), রাইজেল (০·৩), প্রোসিওন (০·৫) আর শ্রবণা (আলতাইর) (০·৯)। (মনে রাখতে হবে, ০·৫ মাত্রার তারারা ০·৯ মাত্রার তারাদের চেয়ে **উজ্জ্বলতর** ইত্যাদি)। উজ্জ্বলতম তারা আর তাদের মাত্রার একটা তালিকা দেওয়া হল (নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম রইল বন্ধনীতে):

লুব্ধক	(α Canis Majoris)	—১·৬	আর্দ্রা	(α Orionis)	০·৯
কানোপাস	(α Carinae)	—০·৯	শ্রবণা	(α Aquilae)	০·৯
α সেণ্টরি		০·১	α দক্ষিণ ক্রস	(α Crusis)	১·১
অভিজিৎ	(α Lyrae)	০·১	রোহিণী	(α Tauri)	১·১
কাপেল্লা	(α Aurigae)	০·২	পুনর্বসু	(β Geminorum)	১·২
স্বাতী	(α Boötis)	০·২	চিত্রা	(α Virginis)	১·২
রাইজেল	(β Orionis)	০·৩	জ্যেষ্ঠা	(α Scorpionis)	১·২
প্রোসিওন	(α Canis Minoris)	০·৫	ফোমালহোট	(α Piscis Australis)	১·৩
এ্যাকের্নার	(α Eridani)	০·৬	ডেনেব	(α Cygni)	১·৩
β সেণ্টরি		০·৯	মঘা	(α Leonis)	১·৩

তালিকাটি দেখলেই চোখে পড়ে তাতে **১ম** মাত্রার কোন তারা নেই। ০·৯ মাত্রার তারা থেকে সুরু করে ১·১, ১·২ মাত্রা প্রভৃতি আছে। **১ম** মাত্রাটা বাদ পড়েছে। এ থেকে বোঝা যায় **১ম** মাত্রার তারার কোন অস্তিত্বই নেই। ওটা কেবল ঔজ্জ্বল্যের একটা চলতি মান।

নাক্ষত্র মাত্রা তারাদের ভৌতিক ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে করাটা ঠিক নয়। আমাদের দৃষ্টি থেকেই তাদের জন্ম। সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যা প্রযোজ্য সেই 'ভেবার-ফেখ্‌নার মনঃ-শারীরবৃত্তিক নিয়ম' থেকেই তা আসে। দৃষ্টির বেলায় এই নিয়ম দাঁড়ায়: ভাস্বরতা

যখন বদলায় জ্যামিতিক প্রগতিতে (progression), আলোক তীব্রতার অনুভূতি তখন বদলায় সমান্তর প্রগতিতে (arithmetical progression)।

ঔজ্জ্বল্যের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। এবার কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ হিসাব কষা যাক। দেখা যাক ৩য় মাত্রার কটি তারা একসঙ্গে একটি ১ম মাত্রার তারার সমান জ্বলবে। আমরা জানি ৩য় মাত্রার তারারা ১ম মাত্রার তারাদের চেয়ে ২·৫২ বা ৬·৩ গুণ ক্ষীণতর। কাজেই একটি ১ম মাত্রা তারার জায়গায় চাই ৬·৩টি ৩য় মাত্রার তারা। সেই ভাবেই ১৫ ৮টি ৪র্থ মাত্রার তারা চাই ইত্যাদি। হিসেবের ফল নিচের তালিকায় দেওয়া হল।*

১ম মাত্রার একটি তারার জায়গায় অন্য মাত্রার কতগুলো তারা চাই তা জানান হল নিচে:

২য়	২·৫	৭ম	২৫০
৩য়	৬·৩	১০ম	৪,০০০
৪র্থ	১৬	১১শ	১০,০০০
৫ম	৪০	১৬শ	১০,০০,০০০
৬ষ্ঠ	১০০		

৭ম মাত্রায় আমরা সীমানা পেরিয়ে খোলা চোখের বাইরের নক্ষত্র জগতে এসে পড়েছি। ১৬শ মাত্রার তারাদের কেবল অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখা যায়। খোলা চোখে দেখতে হলে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ১০,০০০ গুণ বাড়া দরকার। তাহলে এখন আমরা ৬ষ্ঠ মাত্রার তারাদের যেরকম দেখি তাদেরও সেরকমই দেখতে পাব।

অবশ্য এই তালিকায় 'প্রাক-প্রথম' মাত্রার তারাদের কথা নেই। তাদের কোন কোনটির হিসাব দেওয়া গেল; ০·৫ মাত্রার তারা (প্রোসিওন) ২·৫০·৫ বা ১ম মাত্রা তারার চেয়ে ১·৫ গুণ উজ্জ্বলতর, –০·৯ মাত্রার তারা (কানোপাস) হল ২·৫১·৯ বা ৫·৮ গুণ উজ্জ্বলতর অথচ –১·৬ মাত্রার তারা (লুব্ধক) হল ২·৫২·৬ বা ১১ গুণ উজ্জ্বলতর।

শেষে আরেকটি কৌতূহলজনক হিসাব দিই: খোলা চোখে দৃষ্ট তারারা যত আলো দেয় কতগুলো ১ম মাত্রার তারা সে আলো দিতে পারে?

ধরে নিচ্ছি একটি গোলার্ধে ১০টি ১ম মাত্রার তারা আছে। দেখা গেল পরের পর্যায়ের তারাদের সংখ্যা হল পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রায় তিন গুণ বেশি। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে তারা ২·৫ গুণ কম। কাজেই আমাদের যে সংখ্যার প্রয়োজন তা এই প্রগতির মোট ফলের

---

* এই হিসাব সহজেই হয়, তার কারণ আলোক তীব্রতা অনুপাত লগারিদ্ম হল অত্যন্ত সহজ, ০·৪।

সমান :

$$১০ + \left(১০ \times ৩ \times \frac{১}{২\cdot৫}\right) + \left(১০ \times ৩^{২} \times \frac{১}{২\cdot৫^{২}}\right) + \ldots + \left(১০ \times ৩^{৫} \times \frac{১}{২\cdot৫^{৫}}\right)।$$

মানে

$$\frac{১০ \times \left(\frac{৩}{২\cdot৫}\right)^{৬} - ১০}{\frac{৩}{২\cdot৫} - ১} = ৯৫$$

সুতরাং একটি গোলার্ধের খোলা চোখে দেখা সব তারার মোট ঔজ্জ্বল্য হল প্রায় ১০০টি ১ম মাত্রা তারা বা একটি –৪র্থ মাত্রা তারার সমান।

এরপর যদি শুধু খোলা চোখে নয়, আধুনিক দূরবীনে দেখা তারাদের নিয়ে হিসাব করি দেখব তাদের ঔজ্জ্বল্য হল ১,১০০টি ১ম মাত্রা তারা বা একটি –৬·৬ মাত্রা তারার সমান।

চোখ আর দূরবীন

দূরবীনে তারা দেখার সঙ্গে খালি চোখে তারা দেখার তুলনা করা যাক।

রাত্রে দেখার সময় মানুষের তারারন্ধ্রের ব্যাস হল গড়ে ৭ মিঃমিঃ। একটি ৫ সেঃমিঃ দূরবীন $\left(\frac{৫০}{৭}\right)^{২}$ বা মানুষের তারারন্ধ্রের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি আলো ঢুকতে দেয়। একটা ৫০ সেঃমিঃ দূরবীন মানুষের তারারন্ধ্রের চেয়ে ৫,০০০ গুণ বেশি আলো ঢুকতে দেয়। তারাদের ঔজ্জ্বল্য দূরবীন অতটা পরিমাণই বাড়ায়। (এ কেবল **তারাদের** বেলাতেই খাটে। গ্রহদের বেলায়, যাদের চক্র দেখা যায়, খাটে না। গ্রহ রূপের ঔজ্জ্বল্য হিসাব করতে হলে দূরবীনের বর্ধন ক্ষমতাটা হিসাবে ধরা প্রয়োজন।)

এটা জানতে পারলে কোন এক মাত্রার তারা দেখতে হলে কত ব্যাসের দূরবীন লেন্স প্রয়োজন তা বের করা যাবে। আমাদের আরো জানতে হবে নির্দিষ্ট লেনসের একটি দূরবীন দিয়ে কোন মাত্রার তারা দেখা সম্ভব। ধরা যাক আমরা জানি যে একটি ৬৪ সেঃমিঃ দূরবীন ১৫শ মাত্রার তারা অবধি সব মাত্রার তারাকে ধরতে পারে। পরের পর্যায় ১৬শ মাত্রার তারা দেখতে হলে কতটা ব্যাসের লেন্স দরকার হবে?

$$\frac{x^{২}}{৬৪^{২}} = ২\cdot৫$$

এই অনুপাতে x হল লেন্সের অজ্ঞাত ব্যাস। আমরা পাচ্ছি

$$x = ৬৪\sqrt{২\cdot৫} \approx ১০০ \text{ সেঃমিঃ।}$$

কাজেই আমাদের দরকার এক মিটার লেন্সের একটি দূরবীন। সাধারণত পরবর্তী নাক্ষত্র মাত্রা ধরার জন্য দূরবীনের বিবর্ধনশক্তি বাড়াতে হলে লেন্সের ব্যাসকে $\sqrt{২·৫}$ বা ১·৬ গুণ বাড়াতে হবে।

সূর্য আর চাঁদের নাক্ষত্র মাত্রা

জ্যোতিষ্কদের বেলাতেও আমাদের বীজগাণিতিক যাত্রা চালান যাক। তারার ঔজ্জ্বল্য মাপার মানকে আমরা স্থির তারা ছাড়াও অন্য জ্যোতিষ্কদের ক্ষেত্রে লাগাতে পারি — গ্রহ সূর্য আর চাঁদের বেলাতেও। গ্রহদের ঔজ্জ্বল্যের কথা পরে বিশেষভাবে বলব। এখন বলব সূর্য আর চাঁদের নাক্ষত্র মাত্রার কথা। সূর্যের নাক্ষত্র মাত্রা হল এই সংখ্যাটি – ২৬·৮, পূর্ণ* চন্দ্রের –১২·৬। ধরে নিচ্ছি আগের পাতাগুলো পড়ার পর পাঠকরা নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন দুটো সংখ্যাই কেন ঋণ সংখ্যা। আসলে অবাক করবে সূর্য আর চাঁদের মাত্রার আপাত কম পার্থক্য। বলা যেতে পারে প্রথমটি 'পরেরটির দ্বিগুণ মাত্র'।

একথা ভুললে চলবে না যে নাক্ষত্র মাত্রা আসলে হল ২·৫এর উপর নির্ভরশীল এক ধরনের লগারিদ্ম। সংখ্যার তুলনার বেলায় একটির লগারিদ্মকে অন্যটির দ্বারা ভাগ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি নাক্ষত্র মাত্রার তুলনার বেলায়ও একটিকে আরেকটি দিয়ে ভাগ করা যায় না। সঠিক তুলনার ফল পাওয়া যাবে নিচের হিসাবটিতে।

সূর্য, তার নাক্ষত্র মাত্রা হল – ২৬·৮, একটি ১ম মাত্রার তারার চেয়ে ২·৫২৭·৮ গুণ উজ্জ্বলতর। চাঁদ সেখানে ২·৫১৩·৬ গুণ বেশি উজ্জ্বল।

কাজেই সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে $\frac{২·৫^{২৭·৮}}{২·৫^{১৩·৬}} \approx ২·৫^{১৪·২}$ গুণ বেশি

লগারিদ্ম তালিকার সাহায্যে গণনা করে আমরা ৪,৪৭,০০০ সংখ্যাটি পাই। সুতরাং সূর্য আর চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের নির্ভুল অনুপাত বলা যায় এই রকম: পরিষ্কার দিনে আমাদের আহ্নিক ভাস্কর পৃথিবীতে মেঘমুক্ত রাত্রের ৪,৪৭,০০০টি পূর্ণচন্দ্রের সমান আলো দেয়।

চাঁদ যে পরিমাণ তাপ দেয় তাকে যদি তার আলোর পরিমাণের আনুপাতিক বলে মনে করি — সেটা হয়তো সত্য অবস্থার কাছাকাছিই যাবে — তাহলে সে সূর্যের চেয়ে ৪,৪৭,০০০ গুণ কম তাপ দেয় বলে মনে করা যেতে পারে। জ্যোতির্বিদরা জানেন যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রান্তসীমায় প্রতিটি বর্গ সেণ্টিমিটার সূর্য থেকে প্রতি মিনিটে দুটি ছোট ক্যালোরী তাপ পায়। সুতরাং, চাঁদ পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারকে মিনিটে এক ক্যালোরীর ২,২৫,০০০ ভাগের বেশি তাপ দেয় না। তার মানে সে তাপ এক

* প্রথম আর শেষ পাদে চাঁদের নাক্ষত্র মাত্রা হল –৯।

মিনিটে এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রীর ২,২৫,০০০ ভাগ গরম করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়ায় চাঁদের আলোর কোন প্রভাবের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।*

পূর্ণিমার আলোয় প্রায়ই মেঘ গলে যায়, এ-রকম একটা ধারণা খুবই প্রচলিত। এ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তার কারণ হল মেঘের রাত্রে মিলিয়ে যাওয়াটা (যার কারণ অন্য) কেবল চাঁদের আলোতেই **লক্ষিত** হয়।

এখন চাঁদকে ছেড়ে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের চেয়ে সূর্য কত গুণ বড় তাই দেখব। আগের পথ অনুসরণ করে আমরা দেখব ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত হবে:

$$\frac{২\cdot৫^{২৭\cdot৮}}{২\cdot৫^{২\cdot৬}} = ২\cdot৫^{২৫\cdot২} = ১০০০,০০,০০,০০০,$$

তার মানে, সূর্য লুব্ধকের চেয়ে ১,০০০ কোটি গুণ বেশি উজ্জ্বল।

এখন আরেকটি কৌতূহলজনক হিসাব। একটা গোলার্ধের আকাশের সমস্ত তারা মিলিতভাবে যত আলো দেয় পূর্ণিমার চাঁদের আলো তার চেয়ে কতগুণ বেশি উজ্জ্বল? আগেই হিসাব করে দেখেছি ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মাত্রার সব তারা ১ম মাত্রার ১০০টি তারার সমান আলো দেয়। সুতরাং আমাদের কাজ হল কেবল ১ম মাত্রার ১০০টি তারার চেয়ে চাঁদ কত গুণ উজ্জ্বল তা বের করা। সেটা হল $\frac{২\cdot৫^{১৩\cdot৬}}{১০০}$ ২,৭০০র সমান।

কাজেই একটি পরিষ্কার নিশ্চন্দ্র রাত্রে তারারা পূর্ণিমার চাঁদের কেবল ১/২,৭০০ ভাগ আলো দেবে বা ২,৭০০ $\times$ ৪,৪৭,০০০ তার মানে মেঘমুক্ত দিনে সূর্যের চেয়ে ১২০,০০,০০,০০০ গুণ কম। এখানে বলি, এক মিটার দূরের একটা সাধারণ আন্তর্জাতিক 'মোমবাতি'র নাক্ষত্র মাত্রা হল $-$ ১৪·২, তার মানে অতটা দূরে তা $২\cdot৫^{১৪\cdot২-১২\cdot৬}$ আলো দেয় বা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে চার গুণ **উজ্জ্বলতর।**

একটি কথা কৌতূহলজনক মনে হবে, বিমানের বেকন আলো যার জোর হল ২০০ কোটি মোমবাতির সমান, তাকে পৃথিবী থেকে চাঁদের সমান দূরে নিয়ে গেলে ৪·৫ মাত্রার তারার মতোই সে চোখে পড়বে, মানে খালি চোখে দেখা যাবে।

তারাদের আর সূর্যের সত্যিকার ঔজ্জ্বল্য

এতক্ষণ যে ঔজ্জ্বল্যের কথা বলা হল তা একান্তই চাক্ষুষ ঔজ্জ্বল্যের কথা। সংখ্যাগুলো জ্যোতিষ্কদের প্রকৃত দূরত্বে যে ঔজ্জ্বল্য তার কথাই বলেছে। কিন্তু আমরা জানি তারারা সবাই সমান দূরে নয়। কাজেই তাদের চাক্ষুষ ঔজ্জ্বল্য একই সঙ্গে তাদের

---

* বইয়ের শেষে আবহাওয়ায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষীয় প্রভাবের কথা বলা হবে (দ্রঃ 'চাঁদ আর আবহাওয়া')।

প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য আর আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের কথা বলে, বা, আরো ঠিকভাবে বললে বলতে হয়, ও দুটোর একটার কথাও বলে না, যতক্ষণ না দুটোকে আলাদা করছি। এখন এটাও জানা প্রয়োজন যে বিভিন্ন তারা সমান দূরে থাকলে তুলনায় তাদের ঔজ্জ্বল্য বা তথাকথিত 'ভাস্বরতা' কী পরিমাণ হত।

এই ভাবে প্রশ্ন তুলে জ্যোতির্বিদরা 'পরম' নাক্ষত্র মাত্রার ধারণার জন্ম দিয়েছেন, তার মানে, আমাদের কাছ থেকে ১০ 'পার্সেক' দূরত্বের একটি তারার মাত্রা। পার্সেক হল তারাদের দূরত্ব বোঝানর জন্য ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক। তার উৎপত্তির কথা পরে বলব। এখনকার মতো এইটুকু বলি এক পার্সেক হল প্রায় ৩০৮০০০০,০০,০০,০০০ কিঃমিটার। তারার দূরত্ব যদি জানি সেই সঙ্গে একথাও যদি খেয়াল রাখি যে ঔজ্জ্বল্য বাড়ে কমে বর্গ দূরত্বের বিপরীত অনুপাতে তাহলে সহজেই পরম নাক্ষত্র মাত্রা বের করা যাবে।*

দুটো হিসাবের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাব, লুব্ধক আর সূর্যের হিসাব। লুব্ধকের **পরম** মাত্রা হল + ১·৩, সূর্যের + ৪·৮। তার মানে ৩০৮ ০০০ ০০,০০,০০,০০০ কিঃমিটার দূর থেকে লুব্ধককে ১·৩ মাত্রার তারার মতো দেখাবে। ৪·৮ মাত্রার সূর্য হবে

$$\frac{২\cdot৫^{৩\cdot৮}}{২\cdot৫^{০\cdot৩}} = ২\cdot৫^{৩\cdot৫} = ২৫ \text{ গুণ}$$

ক্ষীণতর লুব্ধকের তুলনায়, যদিও সূর্যের **দৃষ্টিগত** ঔজ্জ্বল্য লুব্ধকের চেয়ে ১০০০,০০,০০,০০০ গুণ বেশি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সূর্য মোটেই আকাশের উজ্জ্বলতম তারা নয়। কিন্তু তার সঙ্গী তারাদের মধ্যে সূর্যকে বামন বলে মনে করাটাও খুবই অন্যায়। কারণ তার ভাস্বরতা

---

* নিচের এই সূত্রটি (তার উৎপত্তি ভাল করে বোঝা যাবে একটু পরে, পাঠক যখন 'পার্সেক' আর 'লম্বন'এর *(parallax)* সঙ্গে সুপরিচিত হবেন) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে: $২\cdot৫^M = ২\cdot৫^m \left(\frac{\pi}{০\cdot১}\right)^২$। — এখানে M হল তারার পরম মাত্রা, m হল তার দৃষ্টিগত মাত্রা আর π প্রতি সেকেন্ডে তারার লম্বন। হিসেবের পারম্পর্য হল এই:

$$২\cdot৫^M = ২\cdot৫^m \times ১০০\,\pi^২$$

$$M \lg ২\cdot৫ = m \lg ২\cdot৫ + ২ + ২\lg\pi,$$

$$০\cdot৪M = ০\cdot৪m + ২ + ২\lg\pi,$$

সুতরাং

$$M = m + ৫ + ৫\lg\pi।$$

যেমন লুব্ধকের ক্ষেত্রে, $m = -১\cdot৬$ আর $\pi = ০''\cdot৩৮$। কাজেই তার পরম মাত্রা হবে $M = -১\cdot৬ + ৫ + ৫\lg ০\cdot৩৮ = ১\cdot৩$।

সাধারণের ঊর্ধ্বে। নাক্ষত্র পরিসংখ্যান অনুযায়ী সূর্যকে ঘিরে থাকা ১০ পার্সেক পর্যন্ত দূরত্বের গড় ভাস্বরতার তারারা হল ৯ম পরম মাত্রার তারা। সূর্যের পরম মাত্রা ৪·৮, তার মানে

সূর্য হল $\frac{২·৫^{৮}}{২·৫^{৩·৮}} = ২·৫^{৪·২}$ [illegible] গুণ বেশি উজ্জ্বল 'প্রতিবেশী' গড় তারার চেয়ে।

পরম গুণের দিক দিয়ে সূর্য লুব্ধকের চেয়ে ২৫ গুণ ক্ষীণতর হলেও চারপাশের গড় তারার চেয়ে ৫০ গুণ উজ্জ্বলতর।

পরিচিত তারাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল

সবচেয়ে ভাস্বর তারা হল ৮ম মাত্রার একটি তারা। খালি চোখে তাকে দেখা যায় না। তারাটি ডোরাডো নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। লাতিন S অক্ষরটির দ্বারা চিহ্নিত এই তারা। ডোরাডো নক্ষত্রপুঞ্জটি দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে। উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তাকে দেখা যায় না। এই তারাটি হল পাশের নক্ষত্র পরিবার ছোট মাগেল্লানিক মেঘপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের কাছ থেকে লুব্ধকের চেয়ে ১২,০০০ গুণ দূরে। বিরাট দূরত্বের ফলে ৮ম মাত্রার তারা হওয়া সত্ত্বেও তাকে দৃষ্টিগোচর হতে হলে অসাধারণ রকম ভাস্বর হতে হয়। লুব্ধক যদি অত দূরে থাকত তবে তাকে শূন্যে ১৭শ মাত্রার তারার মতো দেখাত, সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনেও তাকে প্রায় দেখাই যেত না।

এই বিশিষ্ট তারাটি তবে কতটা ভাস্বর? হিসাব করে এই ফল পাওয়া গেছে — ৯ম মাত্রা। তার মানে পরম সংখ্যায় তা সূর্যের চেয়ে প্রায় ৪,০০,০০০ গুণ উজ্জ্বলতর! এই ভাস্বরতম তারাটি যদি আমাদের কাছ থেকে লুব্ধকের সমান দূরে থাকত তবে তা তার চেয়ে ৯ মাত্রা বেশি ঔজ্জ্বল্য পেত বা শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদের সমান উজ্জ্বল হত! লুব্ধকের সমান দূর থেকে যে তারা পৃথিবীকে এতটা আলো দিতে পারে তাকে নিশ্চয়ই উজ্জ্বলতম পরিচিত তারা বলা চলে।

অন্য আকাশ আর আমাদের আকাশের গ্রহদের নাক্ষত্র মাত্রা

আগে আমরা 'অন্য আকাশ'এ অন্য গ্রহে যাত্রা করেছি। এবারও তাই করা যাক সেখানকার জ্যোতিষ্কদের ঔজ্জ্বল্যের সঠিক মূল্যায়নের উদ্দেশে। প্রথমে **পৃথিবীর** আকাশে গ্রহদের পূর্ণ জ্যোতির নাক্ষত্র মাত্রার নির্দেশ দেওয়া যাক। এই হল তার তালিকা:

পৃথিবীর আকাশে:

শুক্র	−৪·৩	শনি	−০·৪
মঙ্গল	−২·৮	ইউরেনাস	+৫·৭
বৃহস্পতি	−২·৫	নেপচুন	+৭·৬
বুধ	−১·২		

তালিকায় দেখা যাচ্ছে শুক্র হল বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় দুই নাক্ষত্র মাত্রা, তার মানে, ২·৫২ বা ৬·২৫ গুণ উজ্জ্বলতর আর ২·৫–২·৭ বা ১৩ গুণ উজ্জ্বলতর লুব্ধকের চেয়ে (লুব্ধকের ঔজ্জ্বল্য হল –১·৬ মাত্রা)। আরো দেখা যাচ্ছে ক্ষীণদীপ্ত শনিগ্রহটি লুব্ধক আর কানোপাস ছাড়া অন্য স্থির নক্ষত্রদের বেশি উজ্জ্বল। এতেই বোঝা যায় শুক্র আর বৃহস্পতি গ্রহদুটি কেন এককে সময় দিনের বেলায়ও খালি চোখে দেখা যায়, যদিও তারারা দিনের আলোয় খালি চোখে ধরা পড়ে না।

এখন আরো কয়েকটি তালিকা দিচ্ছি। তাতে শুক্র, মঙ্গল আর বৃহস্পতির আকাশের জ্যোতিষ্কদের ঔজ্জ্বল্য দেখান হয়েছে। কোন বাড়তি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি কারণ 'অন্য আকাশ'এ যা বলা হয়েছে কেবল তাই প্রকাশ করা হয়েছে অংকে।

মঙ্গলের আকাশে

সূর্য	–২৬
ফোবাস	– ৮
ডেইমোস	–৩·৭
শুক্র	–৩·২
বৃহস্পতি	–২·৮
পৃথিবী	–২·৬
বুধ	–০·৮
শনি	–০·৬

শুক্রের আকাশে

সূর্য	–২৭·৫
পৃথিবী	–৬·৬
বুধ	–২·৭
বৃহস্পতি	–২·৪
চাঁদ	–২·৪
শনি	–০·৩

বৃহস্পতির আকাশে

সূর্য	–২৩
১ম উপগ্রহ	–৭·৭
২য় "	–৬·৪
৩য় "	–৫·৬
৪র্থ উপগ্রহ	–৩·৩
৫ম "	–২·৮
শনি	–২
শুক্র	–০·৩

নিজেদের উপগ্রহের আকাশে গ্রহদের ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে সর্বপ্রধান স্থান হল ফোবাসের আকাশে 'পূর্ণ' মঙ্গলের (–২২·৫), তারপর ৫ম উপগ্রহের আকাশে 'পূর্ণ' বৃহস্পতির (–২১) আর মিমাসের আকাশে 'পূর্ণ' শনির (–১০): শনি এখানে সূর্যের চেয়ে পাঁচ গুণ ক্ষীণতর!

শেষে আরেকটি তালিকা। তাতে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহকে কতটা উজ্জ্বল দেখায় তা বলা হয়েছে। উজ্জ্বলতা বেশি থেকে কম — এই ক্রম অনুযায়ী তালিকায় গ্রহদের দেখান হয়েছে।

নাক্ষত্র মাত্রা		নাক্ষত্র মাত্রা	
বুধ থেকে শুক্র	−৭·৭	শুক্র থেকে বুধ	−২·৭
শুক্র থেকে পৃথিবী	−৬·৬	মঙ্গল থেকে পৃথিবী	−২·৬
বুধ থেকে পৃথিবী	−৫	পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি	−২·৫
পৃথিবী থেকে শুক্র	−৪·৩	শুক্র থেকে বৃহস্পতি	−২·৪
মঙ্গল থেকে শুক্র	−৩·২	বুধ থেকে বৃহস্পতি	−২·২
মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি	−২·৮	বৃহস্পতি থেকে শনি	−২
পৃথিবী থেকে মঙ্গল	−২·৮		

দেখা যাচ্ছে প্রধান গ্রহদের আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হল বুধের আকাশে শুক্র, শুক্রের আকাশে পৃথিবী আর বুধের আকাশে পৃথিবী।

তারারা দূরবীনে বিবর্ধিত হয় না কেন?

দূরবীনে প্রথমবার তারা দেখে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ দূরবীন চাঁদ আর গ্রহদের স্পষ্টতই বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু তারাদের বাড়ায় তো নাই, বরং, ছোট করে দেয়, চক্রের বদলে একটা উজ্জ্বল বিন্দুতে পরিণত করে। অন্য জিনিসের সাহায্যে আকাশের দিকে যিনি প্রথম তাকিয়েছিলেন সেই গ্যালিলিওই এটি প্রথম লক্ষ্য করেন। তাঁর তৈরী দূরবীন দিয়ে প্রথম দিকের পর্যবেক্ষণের বিবরণীতে তিনি বলেছেন:

'দূরবীনে গ্রহ আর স্থির নক্ষত্রদের আকারের যে পার্থক্য দেখা যায় সেটা লক্ষণীয়। গ্রহদের দেখায় সুনির্দিষ্ট ছোট বৃত্তের মতো, যেন ছোট্ট মুদ্রা; স্থির নক্ষত্রদের কিন্তু কোন পরিষ্কার ঘের দেখা যায় না... দূরবীন কেবল তাদের ঔজ্জ্বল্যই বাড়ায়, ৫ম আর ৬ষ্ঠ মাত্রার তারাদের উজ্জ্বলতম স্থির নক্ষত্র লুব্ধকের দীপ্তি দেয়।'

দূরবীনদের তারাকে বড় করে দেখানর অক্ষমতার কারণ বলতে হলে চোখের দৃষ্টির শারীরতাত্ত্বিক আর পদার্থবিদ্যাগত কয়েকটি তথ্য মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। যে লোক হেঁটে দূরে সরে যাচ্ছে তাকে দেখার সময় আমাদের অক্ষিপটে তার ছবি ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। একটা দূরত্বে এসে তার মাথা আর পা অক্ষিপটের উপর এত কাছাকাছি এসে যায় যে তার ছাপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের (স্নায়ু প্রান্তের) উপর না পড়ে কেবল একটি উপাদানেই এঁটে যায়। তখন লোকের শরীরটি আকৃতিহীন একটা ফোঁটার মতোই দেখায়; দৃষ্টিকোণ যখন কমে ১′তে দাঁড়ায় তখন অধিকাংশ মানুষের বেলাতেই তাই ঘটে। দূরবীনের উদ্দেশ্য হল দৃষ্টিকোণ বাড়িয়ে দেওয়া বা অন্য কথায়, দৃষ্ট বস্তুর প্রতিটি অংশের ছবিকে দীর্ঘায়িত করা, যাতে অক্ষিপটের একাধিক যুক্ত উপাদানে তা পড়ে। সমান দূরের একটি জিনিস খালি চোখে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে দূরবীন যখন একশ

গুণ বাড়িয়ে দেয় তখনই আমরা বলি এই দূরবীনটি '১০০ গুণ বিবর্ধিত করে'। কিন্তু এতটা বিবর্ধনেও যখন কোন জিনিস ১´রও কম কোণ রচনা করে তখন বুঝতে পারি জিনিসটির পক্ষে দূরবীনটা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

সহজেই হিসাব করে দেখা যায় যে ১,০০০ বিবর্ধনের দূরবীনে চাঁদের বুকের যে অংশটা দেখা যাবে তার ব্যাস হল ১১০ মিটার। সূর্যের বেলায় ৪০ কিঃমিটারের ব্যাস। সবচেয়ে কাছের তারাটির বেলায় ১,২০,০০,০০০ কিঃমিটার ব্যাস।

সূর্যের ব্যাস ৮·৫ গুণ কম। তাই **নিকটতম** তারার দূরত্বে নিয়ে গেলে ১,০০০ বিবর্ধনের দূরবীনেও সূর্যকে একটা ফোঁটার মতো দেখাবে। জোরাল দূরবীনে নিকটতম তারা যদি তার চক্রটি দেখাতে চায় তবে তাকে ৬০০ গুণ বড় হতে হবে। লুব্ধকের দূরত্বে তারাটি সূর্যের চেয়ে ৫,০০০ গুণ বড় হবে। অধিকাংশ তারা আরো দূরের আর তাদের গড় আকার সূর্যের চেয়ে বড় নয়। তাই সবচেয়ে জোরাল দূরবীনেও তাদের ফোঁটার মতোই দেখাবে।

জীন্‌স বলেছেন, 'আকাশের কোন তারাই কৌণিক আয়তনে ১০ কিলোমিটার দূরের পিনের মাথা থেকে বড় নয় আর এত ছোট বস্তুকে চক্রের মতো দেখাতে পারে এমন দূরবীন নেই।' অপরপক্ষে আমাদের সৌরমণ্ডলীর জ্যোতিষ্ক বস্তু দূরবীন দিয়ে দেখার সময় দূরবীনের বিবর্ধনশক্তি যত বড়ো, গ্রহের চক্রও ততই বেড়ে যাবে। কিন্তু আগে দেখেছি
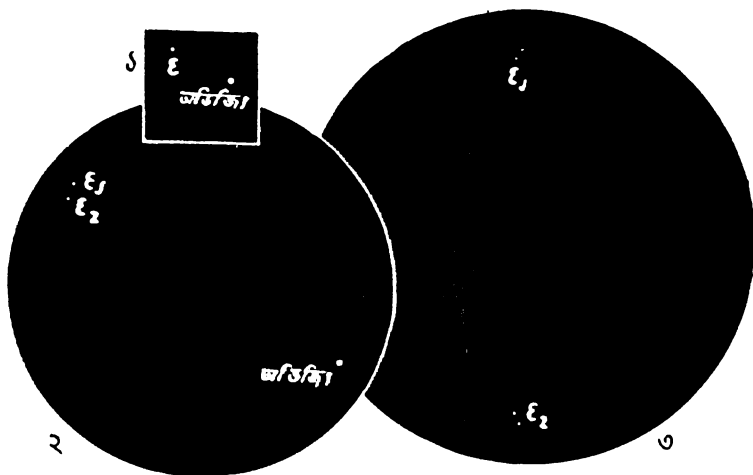
৭৩ নং ছবি: E লাইরা তারা (অভিজিতের কাছে) খালি চোখে যেমন দেখায় (১), বাইনকুলারে যেমন দেখায় (২) আর দূরবীনে যেমন দেখায় (৩)।

এ ক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিদদের অসুবিধায় পড়তে হয়। ছবিটা বাড়লেও তার ঔজ্জ্বল্য কমে যায় (বেশি পরিমাণ জায়গায় আলোক রেখা ছড়িয়ে যায় বলে)। ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হলে খুঁটিয়ে দেখা মুশ্‌কিল হয়। সেইজন্যই গ্রহ আর বিশেষ করে ধূমকেতু দেখার সময় জ্যোতির্বিদরা মাঝারি বিবর্ধনশক্তি সম্পন্ন দূরবীন ব্যবহার করেন।

পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন দূরবীন যদি তারাদের বাড়াতেই না পারে তবে তার দরকারটা কী?

আগে যা বলা হল তারপর এ বিষয়ে বেশি বলার দরকার করে না। তারাদের আপ্যত **আয়তন** বিবর্ধনে অক্ষম হলেও দূরবীন তাদের ঔজ্জ্বল্যের **তীব্রতা** বাড়ায় সুতরাং দৃষ্টিগোচর তারার সংখ্যাও বাড়ায়।

দূরবীনের আরেকটি কীর্তি হল খালি চোখে যে তারাদের এক মনে হয় তাদের **পৃথক** করে দেওয়া। দূরবীন তারার আপাত ব্যাস বাড়াতে না পারলেও তাদের **মাঝখানের আপাত দূরত্ব** বাড়ায়। খালি চোখে যাদের আমরা একটা তারা মনে করি দূরবীন তাদের কখনো দুটি, তিনটি কখনো বা আরো জটিল মণ্ডলী বলেই দেখায় (৭৩ নং ছবি)। দূরত্বের ফলে যাদের খালি চোখে আবছা ফোঁটার মতো দেখায় বা একেবারেই দেখা যায় না সেই সব নক্ষত্রপুঞ্জ দূরবীনের দৃষ্টিতে হাজার হাজার পৃথক তারায় ভেঙে পড়ে।

নক্ষত্র চর্চায় দূরবীনের তৃতীয় কীর্তি হল তার সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা যে রকম নিখুঁতভাবে **কোণ মাপেন** তা বিস্ময়কর, আধুনিক বড় বড় দূরবীনের সাহায্যে যে ফোটো তোলা হয় তাতে জ্যোতির্বিদরা ০″·০১ কোণ পান। এ-রকম কোণের অর্থ হল ৩০০ কিঃমিঃ দূরের একটা পয়সাকে দেখা বা ১০০ মিটার দূর থেকে মানুষের মাথার একটা চুলকে!

তারাদের ব্যাস কী ভাবে মাপা হয়?

এই মাত্র বুঝিয়েছি সবচেয়ে জোরাল দূরবীন দিয়েও স্থির নক্ষত্রের ব্যাস **দেখা** যায় না। এই সেদিন পর্যন্ত তারাদের ব্যাসটা কেবল আন্দাজের ব্যাপার ছিল, মনে করা হত প্রতি তারা আকারে আমাদের সূর্যের সমান, কিন্তু তার প্রমাণের অভাব ছিল। তারাদের ব্যাস মাপার জন্য চলতি দূরবীনের চেয়ে আরো জোরাল দূরবীনের প্রয়োজন বলে তারাদের প্রকৃত ব্যাস নির্ধারণের সমস্যাটা সমাধানের অসাধ্য বলেই মনে হচ্ছিল।

১৯২০ সাল পর্যন্ত এই অবস্থাই ছিল। ১৯২০ সালে নতুন পদ্ধতি আর অনুসন্ধানের যন্ত্র জ্যোতির্বিদদের এ কাজ করার ক্ষমতা দেয়।

এই নতুনতম কীর্তির জন্য জ্যোতির্বিদ্যা তার অনুরক্ত সঙ্গী পদার্থবিদ্যার কাছে ঋণী, যা তাকে একাধিকবার অপরিমেয় সাহায্য দিয়েছে।

আলোক ব্যতিচারের (interference) ভিত্তিতে গঠিত এই পদ্ধতির মূলকথাটা এবার বলব।

যে সূত্রের ভিত্তিতে এই মাপ পদ্ধতি গঠিত তার কথা ভাল করে বলার জন্য আমরা একটা পরীক্ষা করব। তাতে অল্প কয়েকটি সামান্য উপকরণের প্রয়োজন। একটা ৩০ × দূরবীন, তা থেকে ১০ বা ১৫ মিটার দূরে একটা জোরাল আলো, সেটা আবার একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা, পর্দায় অত্যন্ত সরু খাড়া ফাঁক—মিলিমিটারের কয়েক দশমাংশ। লেন্সটাকে একটা অনচ্ছ ঢাকনা দিয়ে ঢাকতে হবে। সেই ঢাকনার গায়ে দুটো গোল এপার্চার, যাদের ব্যাস প্রায় ৩ মিঃমিঃ। লেন্সের কেন্দ্র বরাবর অনুভূমিক রেখায় সুষমভাবে বসান এপার্চার দুটো ১৫ মিঃমিঃ দূরে (৭৪ নং ছবি)। ঢাকনা খুলে দেখলে ফাঁকটা দূরবীনে সরু ফিতের মতো দেখায় যার পাশে অনেক বেশি ক্ষীণ ছোট ছোট রেখা। কিন্তু ঢাকনা পরান অবস্থায় দেখলে মাঝখানের উজ্জ্বল দাগটায় কতগুলো খাড়া খাড়া অন্ধকার ফাঁক দেখা যায়। ঢাকনার দুটো এপার্চারের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আলোর দুটি কিরণের মিথষ্ক্রিয়ার (ব্যতিচার) ফল। একটা এপার্চার বন্ধ করলেই এ অন্ধকার ফাঁক মিলিয়ে যায়।

৭৪ নং ছবি: 'ইন্‌টার্ফেরোমিটার'এর কাজ বোঝান হচ্ছে। এর সাহায্যে তারাদের কৌণিক ব্যাস মাপা হয় (বিস্তৃত বিবরণ বইয়ে আছে)।

এপার্চার দুটোকে যদি এমনভাবে বসান যায় যাতে তাদের দূরত্ব বদলান সম্ভব হয় তাহলে দেখব যত দূরে তারা বসবে অন্ধকার ফাঁকগুলো ততই ক্ষীণ হতে হতে শেষপর্যন্ত একেবারে মিলিয়ে যাবে। এপার্চার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বটা জানলেই আমরা ফাঁকটার কৌণিক প্রস্থ জানতে পারব, তার মানে দর্শক যে কোণ থেকে এই প্রস্থ দেখছেন সেই কোণটি। তারপর যদি ফাঁকটার দূরত্ব জানতে পারি তবে তার প্রকৃত প্রস্থও বের করতে পারব। ফাঁকটার বদলে একটা ছোট্ট গোল ফুটো থাকলেও 'বৃত্তাকার ফাঁকটার' প্রস্থ (তার মানে, বৃত্তের ব্যাস) নির্ধারণের পদ্ধতি একই থাকবে। কেবল প্রাপ্ত কোণটিকে ১·২২ দিয়ে গুণ করলেই হল।

তারাদের ব্যাস মাপার বেলাতেও এই একই পদ্ধতি চলে। কিন্তু তারার কৌণিক ব্যাস এতই ছোট যে অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীনের প্রয়োজন।

'ইন্‌টার্ফেরোমিটার' নামে পরিচিত এই যন্ত্রটি ছাড়াও তারাদের প্রকৃত ব্যাস নির্ধারণের আরেকটা ঘোরাল পথ আছে। তার ভিত্তি হল তারার বর্ণালীর অনুসন্ধান।

জ্যোতির্বিদ তারার বর্ণালী থেকে তার তাপ জেনে নেন। আর তার ফলেই তার বুকের এক বর্গ সেঃমিঃ থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তির পরিমাণ বের করতে পারেন। তারোপর যদি তারার দূরত্ব আর দৃষ্টিগত ঔজ্জ্বল্য জ্যোতির্বিদের জানা থাকে তাহলে তিনি তারার **সারা** বুকের বিকিরণের পরিমাণ জানতে পারবেন। প্রথমটির পরিমাণের সঙ্গে দ্বিতীয়টির পরিমাণের অনুপাত থেকে তারার বুকের আয়তন জানা যায়। সুতরাং তার ব্যাসও। যেমন প্রমাণ হয়েছে যে কাপেল্লার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি। আর্দ্রার ব্যাস ৩৫০ গুণ বেশি, লুব্ধক আর অভিজিতের ব্যাস যথাক্রমে দুই আর আড়াই গুণ বেশি। লুব্ধকের উপগ্রহের ব্যাস হল সূর্যের ব্যাসের ০·০২ গুণের সমান।

নক্ষত্রকুলের দানব

তারাদের ব্যাস মাপার ফল বিস্ময়কর। ব্রহ্মাণ্ডে যে এত বড় বড় তারা আছে সে বিষয়ে জ্যোতির্বিদদের কোন ধারণাই ছিল না। প্রথম যে তারার আয়তন ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় (১৯২০ সালে) সেটি হল উজ্জ্বল আর্দ্রা তারা (α Orionis)। তার ব্যাস মঙ্গলের কক্ষপথের ব্যাসের চেয়ে বড়! আরেকটি বড় তারা হল জ্যেষ্ঠা (Scorpionis নক্ষত্রমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম তারা)। তার ব্যাস পৃথিবীর কক্ষপথের ১·৫ গুণ বড় (৭৫ নং ছবি)। যে
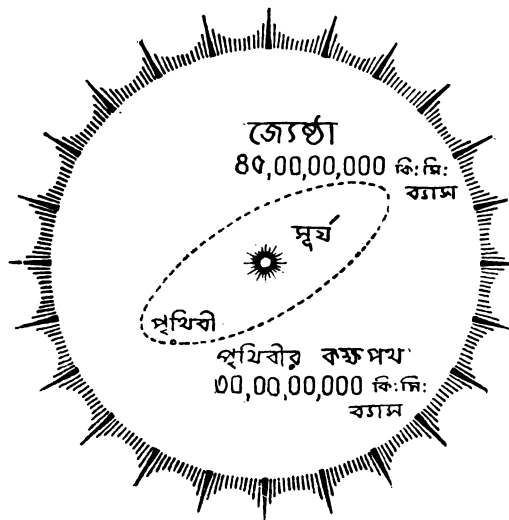
৭৫ নং ছবি: দানব তারা জ্যেষ্ঠা (α Scorpionis) পৃথিবীর কক্ষপথ সমেত আমাদের সূর্যকে ঘিরে ফেলতে পারে।

কটি বিরাট তারা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে Cetus নক্ষত্রমণ্ডলীর তথাকথিত 'অত্যাশ্চর্য' (মিরা) নক্ষত্রটি উল্লেখযোগ্য। তার ব্যাস সূর্যের চেয়ে ৪০০ গুণ বড় (১৩১ পৃঃ ছবি দ্রঃ)।

এই দানবদের পদার্থিক গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। হিসাব করে দেখা গেছে যে এই তারাদের দৈত্যসুলভ আকারের অনুপাতে পদার্থ খুবই কম। সূর্যের চেয়ে তারা মাত্র কয়েকগুণ ভারী। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্দ্রা সূর্যের চেয়ে ৪,০০,০০,০০০ গুণ বড় হলেও তার ঘনত্ব অনুপাতে নগণ্য। সূর্যের পদার্থের ঘনত্বের গড় যদি হয় জলের ঘনত্বের সমান তবে দানব তারাদের পদার্থ হবে অত্যন্ত পাতলা বাতাসের মতো। একজন জ্যোতির্বিদের ভাষায় এই তারারা হল 'বাতাসের চেয়েও অনেক কম ঘনত্বের, একটা বিরাট বেলুনের মতো।'

অপ্রত্যাশিত ফল

উপরোক্ত প্রসঙ্গে একটি কথা কৌতূহলজনক — তারাদের চাক্ষুষ ছবিগুলোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে শূন্যে কতটা জায়গা জুড়বে।

আমরা জানি দূরবীনের চোখে যত তারা ধরা পড়ে তাদের মোট ঔজ্জ্বল্য হল একটি –৬·৬ মাত্রার তারার সমান (আগেকার আলোচনা দ্রঃ)। এ তারার ভাস্বরতা সূর্যের চেয়ে ২০ নাক্ষত্র মাত্রা কম। তার মানে সে ১০ কোটি গুণ কম আলো দেয়। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সাধারণ তারার তাপমাত্রার গড় বলে ধরে নিলে আমাদের কল্পিত তারার আপাত পৃষ্ঠতলকে সূর্যের আপাত পৃষ্ঠতলের চেয়ে অত গুণ কম বলেই ধরে নিতে পারি। বৃত্তের ব্যাস তার এলাকার বর্গ মূলের অনুপাত অনুযায়ী বলে আমাদের তারার আপাত ব্যাস সূর্যের আপাত ব্যাসের চেয়ে ১০,০০০ গুণ কম হবে, তার মানে, ৩০´ : ১০,০০০ ≈ ০″·২।

ফলটা বিস্ময়কর: একটা ০″·২ কৌণিক ব্যাসের চাকা শূন্যে যতটা জায়গা জোড়ে সব তারাদের আপাত এলাকাও ততটা জায়গাই জোড়ে। আকাশ ৪১,২৫৩ বর্গ ডিগ্রী নিয়ে গঠিত। এর থেকে সহজেই বার করা যায় যে দূরবীনের আওতার তারারা গোটা আকাশের কেবল ১/২,০০০ কোটিতম ভাগ জায়গা জোড়ে!

সবচেয়ে ভারী বস্তু

ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে যত বিস্ময় লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান, হয়ত সবসময়ই, পাবে লুব্ধকের নিকটবর্তী ছোট্ট তারাটি। এই তারাটি জলের চেয়ে ৬০,০০০ গুণ ভারী বস্তু দিয়ে গঠিত! এক গ্লাস পারা হাতে নিয়ে তার ওজনে অবাক হবেন — প্রায়

৩ কিলোগ্রাম। কিন্তু যদি এমন এক বস্তুর কথা শোনেন যা এক গ্লাস ভরে নিলে ১২ টন ভারী হবে, তাকে বইতে একটা রেলের মালগাড়ি লেগে যাবে — তখন কী বলবেন? কথাটা শুনতে অসম্ভব, তাই না? কিন্তু এটাই হল জ্যোতির্বিদ্যার নতুনতম আবিষ্কার।

প্রসঙ্গত বলি, এই আবিষ্কারটির একটি দীর্ঘ শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস আছে। অনেক দিন থেকেই দেখা গেছে যে উজ্জ্বল লুব্ধক তার সঙ্গীদের মাঝখান দিয়ে যে পথ ধরে চলে সেটা অন্য অধিকাংশ তারার মতো সোজা পথ নয়। একটা অদ্ভুত বাঁকা চোরা পথ (৭৬ নং ছবি)। তার গতির এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা হিসাবে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বেসেল লুব্ধকের একটি অনুসঙ্গী উপগ্রহ আছে বলে আঁচ করেন, সেই উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের ফলেই লুব্ধকের গতি 'বিক্ষিপ্ত' হচ্ছে। এ কথা বলা হয় ১৮৪৪ সালে, 'কাগজে কলমে' নেপচুন আবিষ্কারের দু'বছর আগে। ১৮৬২ সালে, বেসেল তখন পরলোকগত, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়। লুব্ধকের যে উপগ্রহের কথা আঁচ করা হয়েছিল সেটি দূরবীনে ধরা পড়ে।

৭৬ নং ছবি: ১৭৯৩ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে লুব্ধক যে পথ বেয়ে গেছে।

এই উপগ্রহটি বা তথাকথিত 'সিরিয়াস B' (ছোট লুব্ধক) তার আদি তারাটিকে ৪৯ বছরে একবার পুরো পাক দেয়, সূর্য-পৃথিবীর দূরত্বের ২০ গুণ দূর দিয়ে (প্রায় ইউরেনাস থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান) (৭৭ নং ছবি)। ৮ম বা ৯ম মাত্রার ক্ষীণ তারা হলেও এই তারাটির ভর বেশ বেশি — সূর্যের ভরের প্রায় ০·৮ ভাগ। সূর্য যদি লুব্ধকের মতো দূরে থাকত তাহলে তার ভাস্বরতা হত ১·৮ মাত্রার তারার সমান। লুব্ধকের উপগ্রহের ভর সূর্যের চেয়ে যত গুণ কম তার এলাকাও যদি তত গুণ কম হত তাহলে সে একই তাপে প্রায় একটি দ্বিতীয় মাত্রার তারার ভাস্বরতা পেত, ৮ম বা ৯ম মাত্রার নয়। ঔজ্জ্বল্যের ক্ষীণতার কারণ হিসাবে জ্যোতির্বিদরা প্রথমে ভেবেছিলেন উপগ্রহটির বুকের তাপ খুবই কম, তাকে শক্ত ত্বকে ঢাকা নিরুত্তাপ সূর্য বলে মনে করা হয়েছিল।

কিন্তু সে অনুমান ভুল প্রমাণ হয়। ত্রিশ বছর আগে দেখা যায় যে লুব্ধকের বিনয়ী উপগ্রহটি মোটেই নিভে-আসা তারা নয়। বরং যে তারাদের পৃষ্ঠতলের তাপ খুবই বেশি তাদের দলেই সে পড়ে। তার ঐ তাপ আমাদের সূর্যের চেয়ে বেশি। তার ফলেই সব ব্যাপারটাই একেবারে বদলে যায়। তার ক্ষীণতাটা পুরোপুরিই তার পৃষ্ঠতলের ক্ষুদ্র আয়তনের ফল বলে নির্ধারিত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে সূর্যের চেয়ে সে ৩৬০ গুণ
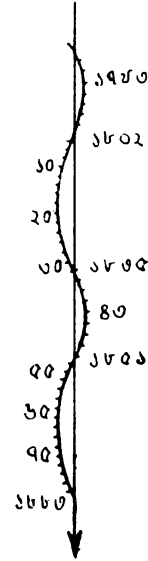
৭৭ নং ছবি: লুব্ধকের নিজের তুলনায় তার উপগ্রহের কক্ষপথ। (এখানে আপাত উপবৃত্তের নাভিতে লুব্ধক কেন নেই তার কারণ হল প্রকৃত উপবৃত্ত তার অবক্ষেপে বিকৃত হয়েছে; এখানে তাকে এক কোণ থেকে দেখছি।)

কম আলো দেয়। সুতরাং তার আয়তন সূর্যের চেয়ে অন্তত ৩৬০ গুণ কম হবে আর তার ব্যাসার্ধ হবে $\sqrt{৩৬০}$ বা ১৯ গুণ কম। কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আয়তনের দিক দিয়ে লুব্ধকের উপগ্রহ সূর্যের ১/৬,৮০০তম ভাগ। ভরের দিক দিয়ে কিন্তু সে সূর্যের প্রায় ০·৮ ভাগ। শুধু এ থেকেই এই তারাটির বস্তুর গুরু ঘনত্ব বোঝা যায়। আরো সঠিক হিসাবের ফলে জানা গেছে এই গ্রহটির ব্যাস হল মাত্র ৪০,০০০ কিঃমিঃ। সুতরাং তার ঘনত্ব পূর্বোক্ত দানবের কাছাকাছি — জলের ঘনত্বের চেয়ে ৬০,০০০ গুণ বেশি (৭৮ নং ছবি)।

'পদার্থবিদরা মন দিয়া শুনুন, আপনাদের রাজ্য আক্রমণের মুখে,' কেপলারের এই উক্তিটি মনে পড়ছে, যদিও তিনি বলেছিলেন অন্য প্রসঙ্গে। সত্যিই কোন পদার্থবিদ কখনো এ জাতীয় ব্যাপার কল্পনা করতে পারেননি। সাধারণ অবস্থায় এমন গভীর ঘনত্ব একেবারেই অকল্পনীয়! শক্ত জিনিসের সাধারণ যে পরমাণু তাদের মাঝখানে ফাঁক এতই কম যে কোন লক্ষণীয় সংনমন (compression) ঘটতে পারে না। কিন্তু যে 'কর্তিত' পরমাণু নিউক্লিয়াসকে পাক দেওয়া ইলেকট্রন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার বেলায় অন্য কাণ্ড ঘটে। ইলেকট্রনের অভাবে তার পারমাণবিক ব্যাস হাজার হাজার গুণ কমে যায়, কিন্তু ভরে বিশেষ কোন বদল ঘটে না। ন্যাড়া নিউক্লিয়াসটি সাধারণ পরমাণুর চেয়ে খুবই ছোট হয়ে পড়ে, একটা দালানের তুলনায় একটা মাছি যতটা ছোট, ততটাই। নক্ষত্র-গোলকের গর্ভে যে প্রচণ্ড চাপ তার ফলে এই হ্রাসপ্রাপ্ত পরমাণু-নিউক্লিয়াসরা সাধারণ পরমাণুর তুলনায় পরস্পরের হাজার হাজার গুণ কাছে আসতে পারে আর অশ্রুতপূর্ব ঘনত্বের বস্তু সম্ভব করতে পারে, লুব্ধকের উপগ্রহে যেমন আছে। আরো জানাই এই ঘনত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে তথাকথিত ভ্যান-মাআন তারা। সে তারা হল ১২শ মাত্রার আর পৃথিবীর চেয়ে বড় নয়। তা এমন বস্তু নিয়ে গঠিত যার ঘনত্ব জলের চেয়ে ৪,০০,০০০ গুণ বেশি।

কিন্তু এটাও শেষ সীমা নয়। তত্ত্বের দিক দিয়ে আরো অনেক বেশি ঘন বস্তু থাকা সম্ভব। পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের ১/১০,০০০ ভাগের বেশি নয়। তাই তার আয়তন পরমাণুর $\frac{১}{১০^{১২}}$ র বেশি হবে না। এক ঘন মিটার ধাতুতে মাত্র $\frac{১}{১,০০০}$

মিঃমি৩ নিউক্লিয়াস থাকে, ধাতুর সমগ্র বস্তুভার এই ক্ষুদ্র আয়তনে সংহত হয়। তাই ১ ঘন সেঃমিঃ নিউক্লিয়াসের ওজন হবে প্রায় ১,০০,০০,০০০ টন (৭৯ নং ছবি)।

যা বলা হল তারপর পূর্বোক্ত ছোট লুব্ধকের চেয়েও ৫০০ গুণ বেশি গড় ঘনত্বের তারার আবিষ্কারটা কিছু অবিশ্বাস্য ঠেকবে না। ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে কাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীতে ১৩শ মাত্রার যে তারাটি আবিষ্কৃত হয় তার কথাই বলছি। পৃথিবীর আকারের ½ ভাগ আর মঙ্গলের চেয়েও বড় নয় এই তারাটির ভর সূর্যের চেয়ে প্রায় তিন

৭৮ নং ছবি: লুব্ধকের উপগ্রহ জলের চেয়ে ৬০,০০০ গুণ বেশি ঘন জিনিস দিয়ে তৈরী। তার কয়েক ঘন সেণ্টিমিটারের ওজন ত্রিশজন লোকের সমান।

গুণ বেশি (ঠিক মাপ হল ২·৮ গুণ)। সাধারণ একক অনুযায়ী তার গড় ঘনত্ব পাওয়া যাবে এই সংখ্যাটিতে ৩,৬০,০০,০০০ গ্রাম/সেঃমিঃ৩। তার মানে ১ সেঃমিঃ৩ এই বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ৩৬ টন! তার ঘনত্ব হল সোনার চেয়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ গুণ বেশি।* ৫ম পরিচ্ছেদে ঐ তারাটির এক ঘন সেণ্টিমিটারের ওজন নিয়ে আলোচনা করব।

---

* এই তারার কেন্দ্রে ঘনত্বের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকম বেশি: ১ ঘন সেঃমিঃএ প্রায় ১০০ কোটি গ্রাম।
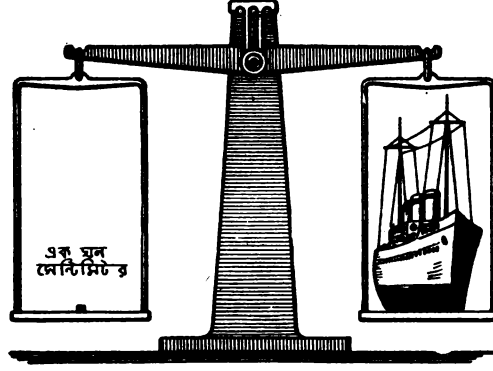
৭৯ নং ছবি: পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের এক ঘন সেণ্টিমিটার যদি আলগাভাবে একসঙ্গে রাখা হয়, তাহলেও তার ওজন হবে আটলাণ্টিক পাড়ির একটি বড় জাহাজের সমান। আঁট করে রাখলে তা এক কোটি টনের সমান হবে!

কয়েক বছর আগেও বৈজ্ঞানিকরা প্ল্যাটিনামের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ঘন বস্তুর কথা ভাবতে পারতেন না।

কিন্তু বেশ বোঝা যায় ব্রহ্মাণ্ডের অতল গর্ভে এ জাতীয় আরো বহু বিস্ময় লুকিয়ে আছে।

তারাদের স্থির নক্ষত্র বলা হয় কেন?

প্রাচীনেরা তারাদের এই নাম দিয়েছিলেন এ কথাটা বলার উদ্দেশে যে তারারা গ্রহদের মতো নয়, তারা আকাশে স্থির থাকে। স্বভাবতই পৃথিবী প্রদক্ষিণে আকাশের দৈনন্দিন গতিতে তারাও যোগ দেয়, কিন্তু এ আপাত গতিতে তাদের **পারস্পরিক** অবস্থানের বদল হয় না। গ্রহরা কিন্তু তারাদের সম্পর্কে তাদের ঠাঁই অনবরতই বদলে চলেছে। তারাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই প্রাচীনকালে তাদের 'ভ্রাম্যমাণ তারা' বলা হত (planet কথাটির আক্ষরিক অর্থ)।

আমরা এখন জানি যে নক্ষত্রজগৎকে লক্ষ লক্ষ অচল সূর্য দিয়ে গড়া বলে বর্ণনা করা একেবারেই ভুল। সূর্যসমেত প্রতি তারাই* পরস্পরের আপেক্ষিকে যে মধ্য গতিবেগে ছোটে, তা হল সেকেণ্ডে ৩০ কিঃমিঃ — আমাদের গ্রহটি তার কক্ষপথে এই বেগেই ছোটে। কাজেই তারারা গ্রহদের চেয়ে কিছু কম সচল নয়। তারার জগতে এককে সময় এমন

* অর্থাৎ 'আমাদের' নক্ষত্রদ্বীপ — ছায়াপথ যাদের নিয়ে গঠিত।

গতিবেগও দেখা যায় যা গ্রহ পরিবারে দুষ্প্রাপ্য। জ্যোতির্বিদরা এমন 'উড়ন্ত' তারাদের কথা জানেন যারা সূর্যের তুলনায় ভীষণ বেগে ওড়ে — সেকেণ্ডে ২৫০-৩০০ কিঃমিঃ।

কিন্তু দৃষ্টিগোচর সমস্ত তারারা যদি প্রবল বেগে পাগলের মতো বছরে কোটি কোটি কিলোমিটার পথ দৌড়ে বেড়ায় তাহলে তাদের এই উন্মত্ত যাত্রা দেখতে পাই না কেন? নক্ষত্র আকাশ এমন একটা মহান নিশ্চলতার ছবি দেয় কেন?

কারণটা সহজ: তারাদের বিরাট দূরত্ব। একটা উঁচু জায়গা থেকে কখনো দূরে দিগন্তের কাছ দিয়ে ট্রেন যেতে দেখেছেন? মনে হয় না কি এক্সপ্রেস ট্রেনও যেন কচ্ছপের মতো খুটখুট করে চলেছে? কাছের দর্শকের কাছে যেটা ভীষণ বেগ দূর থেকে তাকেই কচ্ছপের মতো ধীরমন্থর মনে হয়। তারার গতির বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে। তফাৎ হল
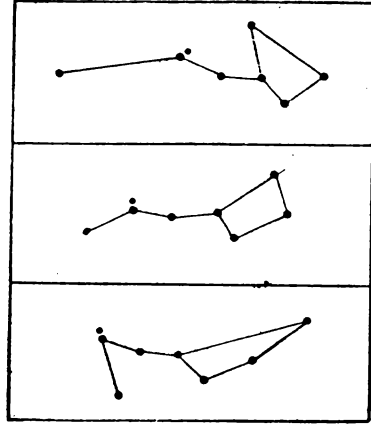
৮০ নং ছবি: মহাকাল যতই এগোয় নক্ষত্রপুঞ্জের চেহারা ধীরে ধীরে ততই বদলায়। মাঝের ছবিটায় সপ্তর্ষির এখনকার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। ওপরে ১,০০,০০০ বছর আগের চেহারা, নিচেরটায় ১,০০,০০০ বছর পরের ভাবী চেহারা।
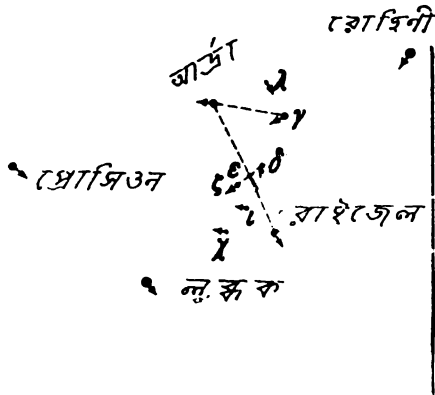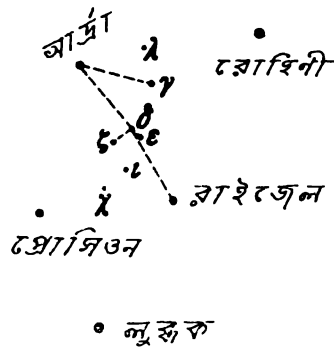
৮১ নং ছবি: (ক) *Orionis* নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বল তারাদের গতির দিক, (খ) এই গতি আজ থেকে ৫০,০০০ বছর পর তাদের চেহারার কী বদল ঘটাবে।
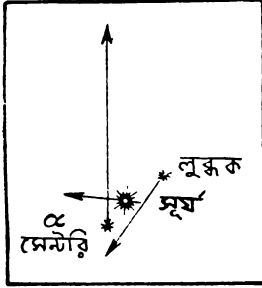
৮২ নং ছবি: α সেণ্টরি, সূর্য, লুব্ধক এই তিনটি প্রতিবেশী তারার গতির দিক।

এইটুকুই যে দর্শক আর সচল জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্ব অনেক অনেক গুণ বেশি। এমন কি উজ্জ্বলতম তারারাও যারা সাধারণত অন্যদের চেয়ে আমাদের অনেক কাছে — কাপতেইনের মতে মাত্র ৮ কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে, তারাও বছরে ১০০ কোটি কিলোমিটার সরে যায়, বা আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের ৮ লক্ষ গুণ কম। এই ঠাঁইবদলটা পৃথিবী থেকে দেখতে হলে 0″·২৫ কোণ ধরতে পারা চাই — এরকম কোণ সবচেয়ে সূক্ষ্ম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উপকরণেও পাওয়া যাবে না। খালি চোখে তা একেবারেই দেখা যাবে না, তা সে বহু শতাব্দী ধরে চললেও না। সূক্ষ্মতম যন্ত্র নিয়ে কষ্ঠসাধ্য মাপজোঁকের ফলেই কেবল অনেকগুলো তারার গতি জানতে পারা গেছে (৮০, ৮১, ৮২ নং ছবি)।

তাই খালি চোখে দেখার বেলায় প্রচণ্ড দ্রুতগতি সত্ত্বেও তারাদের 'স্থির নক্ষত্র' নামটা

৮৩ নং ছবি: নক্ষত্র গতি মাত্রা। দুটি ব্লককে বল, একটি লেনিনগ্রাদে অন্যটি তম্স্কে এক শতাব্দীতে ১ কিঃমিঃ বেগে পরস্পরের দিকে আসছে — এই হল ক্ষুদ্রাকারে পরস্পরের দিকে দুটি তারার গতি। তাতেই বোঝা যাচ্ছে দুটি তারায় সংঘর্ষের সম্ভাবনা কত কম।

যথার্থ। যা বলা হল তা থেকে ভীষণ গতিবেগ সত্ত্বেও তারাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনাটা যে কতই কম, পাঠকরা তা বুঝতে পারবেন (৮৩ নং ছবি)।

নাক্ষত্র দূরত্বের মাপ

দৈর্ঘ্য মাপার জন্য আমাদের হাতে সবচেয়ে বড় যে মাত্রা বা একক রয়েছে, কিলোমিটার, নৌপথের মাইল (১,৮৫২ মিটার) আর ভৌগোলিক মাইল (নৌপথের চার মাইল) তা পৃথিবীর মাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের বেলায় মোটেই নয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য মিলিমিটার দিয়ে মাপতে যাওয়াটা যেমন অসুবিধের জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্ব মাপার বেলায় এই সব মাপ সেরকমই অকেজো। বৃহস্পতি থেকে সূর্য ৭৮,০০,০০,০০০ কিলোমিটার দূরে। লেনিনগ্রাদ-মস্কো রেলপথে মিলিমিটার মাপলে এই সংখ্যাটা পাই ৬৪,০০,০০,০০০।

শূন্যের দীর্ঘ সারিকে বাদ দেওয়ার জন্য জ্যোতির্বিদরা দৈর্ঘ্যের অনেক বড় একক ব্যবহার করেন। সৌরমণ্ডলীর চৌহদ্দির মধ্যে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য তাঁরা পৃথিবী থেকে সূর্যের মধ্য দূরত্ব ১৪,৯৫,০০,০০০ কিঃমিঃকে একক হিসাবে নেন। এই হল তথাকথিত 'জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক'। এই একক অনুযায়ী সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব হল ৫·২, সূর্য থেকে শনির ৯·৫৪ আর সূর্য থেকে বুধের ০·৩৮৭।

কিন্তু আমাদের সূর্য থেকে অন্য সূর্যদের দূরত্ব মাপার বেলায় এই এককও যথেষ্ট নয়। যেমন সবচেয়ে কাছের তারার (সেণ্টরি নক্ষত্রমণ্ডলীর লালচে ১১শ মাত্রার তারা তথাকথিত প্রক্সিমা*) দূরত্ব উক্ত এককে ২,৬০,০০০।

কিন্তু এতো কেবল **নিকটতম** তারার কথা: অন্যরা তো অনেক দূরে। আরো বড় একক নেওয়ার ফলে এই সংখ্যাগুলো মনে রাখা আর তাদের কাজে লাগান অনেক সহজ হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যায় দৈর্ঘ্য মাপার দুটি বিরাট একক আছে: 'আলোক বর্ষ' আর 'পার্সেক', সেটা প্রথমটার চেয়েও বড়।

আলোক বর্ষ হল একটি আলোক রশ্মি এক বছরে শূন্যে যতটা পথ পাড়ি দেয় তাই। এই এককের পরিমাণটার একটা ধারণা দেবার জন্য বলি সূর্যের আলো পৃথিবীতে পেঁছয় আট মিনিটে। এক বছর আট মিনিটের চেয়ে যতগুণ বেশি একটি 'আলোক বর্ষ' পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের চেয়ে ততগুণই বেশি। কিলোমিটারে এই একক হবে ৯৪৬০০০,০০,০০,০০০। তার মানে আলোক বর্ষ হল প্রায় ৯½ মহাপদ্ম (বিলিওন) কিঃমিঃর সমান।

তারার দূরত্ব মাপার দ্বিতীয় যে এককটি জ্যোতির্বিদদের পছন্দ, **পার্সেক,** তার উৎপত্তিটা আরো জটিল। এক কৌণিক সেকেণ্ড — এই কোণ থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস দেখতে হলে যতটা দূরত্ব পেরতে হয় পার্সেক হল সেই দূরত্ব। একটি তারা থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধব্যাস যে কোণে দেখা যায়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাকে তারাটির 'বার্ষিক লম্বন' বলা হয়। 'পার্সেক' *(parsec)* কথাটা এসেছে parallax (লম্বন) কথাটির সঙ্গে 'second' কথাটি যোগ করে। পূর্বোক্ত তারা α সেণ্টরির লম্বন হল ০·৭৬ সেকেণ্ড। সহজেই দেখা যায় এই তারার দূরত্ব হল ১·৩১ পার্সেক। ১ পার্সেক যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ২,০৬,২৬৫ গুণের সমান তা বের করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। পার্সেকের সঙ্গে অন্য দৈর্ঘ্যমাপক এককের হার হল:

১ পার্সেক = ৩·২৬ আলোক বর্ষ = ৩০৮০০০০,০০,০০,০০০ কিঃমিঃ।

কয়েকটি উজ্জ্বল তারার দূরত্ব নিচে পার্সেক আর আলোক বর্ষের হিসাবে দেওয়া হল:

* উজ্জ্বল α সেণ্টরি তারাটি প্রায় তার পরেই।

	পার্সেক	আলোক বর্ষ
α সেণ্টরি	১·৩১	৪·৩
লুব্ধক	২·৬৭	৮·৭
প্রোসিওন	৩·৩৯	১১·০
শ্রবণা	৪·৬৭	১৫·২

এরা তুলনায় নিকটতর তারা। এরা কতটা 'কাছে' তা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে প্রথম স্তম্ভের প্রতিটি সংখ্যাকে ৩০ মহাপদ্ম (এক মহাপদ্ম হল শত হাজার কোটি) দিয়ে গুণ করে যত কিলোমিটার পাওয়া যাবে তাই হল তাদের দূরত্ব। কিন্তু নাক্ষত্র জ্যোতির্বিদ্যায় আলোক বর্ষ আর পার্সেকটাই বৃহত্তম একক নয়। নক্ষত্রপুঞ্জ, তার মানে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যে 'ব্রহ্মাণ্ড' যেখানে কোটি কোটি তারার বাস, তাদের দূরত্ব আর আয়তন মাপার সময় বৃহত্তর এককের প্রয়োজন। এ পরিমাপ গড়া হয়েছে পার্সেক থেকে। মিটার থেকে যেভাবে কিলোমিটারের উৎপত্তি সেইভাবেই। এইভাবে পাওয়া গেল **'কিলোপার্সেক'** যা ১,০০০ পার্সেকের সমান বা ৩০,৮০০ মহাপদ্মক কিঃমিঃ। এই এককে ছায়াপথের ব্যাস পাওয়া যাবে ৩০ সংখ্যাটি দিয়ে। পৃথিবী থেকে এন্ড্রোমিডা নীহারিকাপুঞ্জের দূরত্ব পাওয়া যাবে প্রায় ৩০০ সংখ্যাটি দিয়ে।

কিন্তু কিছুপরেই কিলোপার্সেকেও আর কুলোয় না। জ্যোতির্বিদরা তখন **'মেগাপার্সেক'** প্রচলিত করতে বাধ্য হন। এক মেগাপার্সেক হল ১০ লক্ষ পার্সেকের সমান।

দৈর্ঘ্যের নাক্ষত্র এককের একটি তালিকা দেওয়া গেল:

১ মেগাপার্সেক	=	১০ লক্ষ পার্সেক,
১ কিলোপার্সেক	=	১ হাজার " ,
১ পার্সেক	=	২,০৬,২৬৫ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক,
১ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক	=	১৪,৯৫,০০,০০০ কিঃমিঃ।

মেগাপার্সেক জিনিসটা কল্পনার বাইরে। কিলোমিটারকে যদি মানুষের মাথার চুলের প্রস্থে নিয়ে আসি (০·০৫ মিঃমিঃ) তাহলেও মেগাপার্সেক জিনিসটা মানুষের কল্পনার আয়ত্তে আসবে না। তখন সেটা হবে ১৫,০০০,০০,০০০ কিঃমিটারের সমান। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ১০ গুণ বেশি।

একটা তুলনা দেওয়া যাক। তবেই পাঠক মেগাপার্সেক কত বিরাট ব্যাপার তা বুঝতে পারবেন। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত বিছন মাকড়সা জালের সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন হবে প্রায় ১০ গ্রাম, পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত টানা হলে ৬ কিলোগ্রামের বেশি হবে না। এই একই তন্তুকে সূর্য পর্যন্ত টানলে তার ওজন হবে ২·৩ টন। কিন্তু তাকে মেগাপার্সেক পর্যন্ত টানলে তার ওজন হবে ৫০০০০,০০,০০,০০০ টন!

নিকটতম নক্ষত্র পরিবার

বেশ কিছু কাল আগে, প্রায় এক শতাব্দী আগে, জানা যায় নিকটতম নক্ষত্র পরিবার হল দক্ষিণ সেণ্টরাস নক্ষত্রমণ্ডলীর ১ম মাত্রার জুড়ি-নক্ষত্র। সম্প্রতি এই নক্ষত্র পরিবার সম্বন্ধে কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া গেছে। α সেণ্টরির কাছে একটি ছোট ১১শ মাত্রার তারা পাওয়া গেছে। তার ফলে α সেণ্টরির দুটি তারাকে নিয়ে একটি তিন তারার পরিবার গড়ে উঠেছে। তৃতীয় তারাটি ২°রও বেশি ব্যবধানে থাকলেও আসলে সে প্রকৃতিগতভাবে α সেণ্টরি পরিবারেরই সদস্য তা প্রমাণিত হয় তার গতি নির্ধারণের ফলে। তিনটি তারাই এক বেগে একই দিকে চলে। তৃতীয় তারাটির বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে সে অন্য দুটির তুলনায় আমাদের নিকটতর। কাজেই তাকে, এখন পর্যন্ত যে তারাদের দূরত্ব নির্ধারণ করা গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের বলে মানতে হবে। সেই কারণেই তার নাম 'নিকটতম', লাতিনে 'প্রক্সিমা'। এই তারাটি α সেণ্টরি তারাদের চেয়ে (α সেণ্টরি A, α সেণ্টরি B) আমাদের ৩,৯৬০ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক নিকটতর। এই হল তাদের লম্বন:

α সেণ্টরি (A ও B) . . . . ০·৭৫১
প্রক্সিমা সেণ্টরি . . . . ০·৭৬২

A আর B তারাদুটি কেবল ৩৪ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক তফাতে বলে সমগ্র পরিবারটির চেহারাটা অদ্ভুত, ৮৪ নং ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে। ইউরেনাস আর সূর্যের মধ্যে যে ব্যবধান A আর B'র ব্যবধান তার চেয়ে একটু বেশি। প্রক্সিমা তাদের কাছ থেকে ৫৯ 'আলোক দিন' দূরে। এই তারাগুলো ধীরে ধীরে জায়গা বদল করে। A আর B তারাদুটির তাদের সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রকে একবার পাক দেয় ৭৯ বছরে। প্রক্সিমার এই আবর্তনে ১,০০,০০০ বছরেরও বেশি সময় লাগে। কাজেই সে যে শীগ্‌গিরি α সেণ্টরি পরিবারের আরেকজনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে এমন ভয়ের কোন কারণ নেই।

৮৪ নং ছবি: সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র পরিবার — α সেণ্টরি — A, B আর প্রক্সিমা সেণ্টরি সমেত।

এই পরিবারের তারাদের ভৌত ধর্মের বিষয়ে কী জানা যায়? ঔজ্জ্বল্য, ভর আর ব্যাসের দিক দিয়ে α সেণ্টরি A সূর্যের চেয়ে একটু এগিয়ে (৮৫ নং ছবি)। α সেণ্টরি B'র ভর সূর্যের চেয়ে একটু কম, তার ব্যাস ১/৫ ভাগ বড়। ঔজ্জ্বল্যে কিন্তু সে সূর্যের এক ভাগের তিন ভাগ। তাই তার বুকের তাপও কম, ৪,৪০০° সেঃ, সূর্যের হল ৬,০০০° সেঃ।

প্রক্সিমা তো আরো 'শীতল'। তার বুকের তাপ হল ৩,০০০° সেঃ, রং লালচে। তার ব্যাস সূর্যের চেয়ে ১৪ গুণ কম। ভরের দিক দিয়ে সে শত শত গুণ বেশি হলেও আকারে বৃহস্পতি আর শনির চেয়ে ছোট। α সেণ্টরি A থেকে তার জুড়ি B'কে প্রায় ইউরেনাসের আকাশে সূর্যের সমান দেখাবে। প্রক্সিমাকেও আমরা দেখতে পাব, কিন্তু খুব ছোট্ট ক্ষীণ তারার মতো। কারণ এই তারা থেকে সে যতটা দূরে তা সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের ২৫০ গুণ বেশি, সূর্য থেকে শনির দূরত্বের চেয়ে ১,০০০ গুণ।

α সেণ্টরি ত্রয়ীর পর সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী হল ওফিউকাস নক্ষত্রমণ্ডলীর ৯.৭ম মাত্রার একটি তারা যা 'উড়ন্ত তারা' বলে পরিচিত। অত্যন্ত দ্রুত আপাত গতির ফলেই এই নামকরণ। α সেণ্টরি পরিবারের তুলনায় সে আমাদের কাছ থেকে ১½ গুণ দূরে। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের আকাশে এটিই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সে চলে সূর্যের গতির

৮৫ নং ছবি. α সেণ্টরি তারাদের মান আর তার সঙ্গে সূর্যের তুলনা।
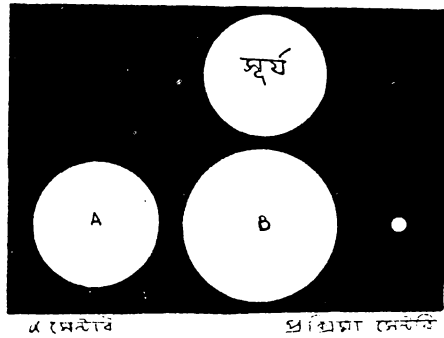
স্পর্শকে আর এত জোরে যে দশ হাজার বছরেরও কম সময়ে সে দ্বিগুণ কাছে এসে α সেণ্টরি ত্রয়ীর চেয়ে নিকটতর হবে।

ব্রহ্মাণ্ডের মান

গ্রহদের বিষয়ে পরিচ্ছেদে যে সব কথা বলে সৌরমণ্ডলীর একটি ছোট মডেল গড়েছিলাম এখন আবার সেই মডেলটিতে ফিরে গিয়ে তাকে বাড়িয়ে নেব তারার জগৎটাকেও ধরিয়ে। তার ফলে কী পাব?

মনে আছে হয়ত আমাদের মডেলে সূর্য হল ১০ সেঃমিটারের একটা বল আর সমগ্র গ্রহ পরিবারটা হল ৮০০ মিটারের একটা বৃত্ত। এই সমান মান বজায় রেখে তারাদের সূর্য থেকে কতটা দূরে বসাব? সহজ হিসাবের ফলে জানা যায়. আমাদের নিকটতম তারা

প্রক্সিমা সেণ্টরিকে বসাতে হবে ২,৭০০ কিঃমিঃ, লুব্ধককে ৫,৫০০ কিঃমিঃ আর শ্রবণাকে ৯,৭০০ কিঃমিঃ দূরে। এমন কি আমাদের মডেলেও এই 'নিকটতম' তারাগুলো ইউরোপে আঁটবে না। আরো দূরের তারারা কিলোমিটারের চেয়ে বড় একক নেবে — ১,০০০ কিঃমিঃ বা মেগামিটার (মেঃমিঃ)। পৃথিবীর পরিধিতে এ-রকম ৪০টি একক আঁটে। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে ৩৮০টি। আমাদের মডেলে অভিজিৎ থাকবে ১৭ মেঃমিঃ দূরে, স্বাতী ২৩ মেঃমিঃ, কাপেল্লা ২৮ মেঃমিঃ, রেগুলাস ৫৩ মেঃমিঃ দূরে থাকবে, দেনেব (α Cygni) ৩৫০ মেঃমিটারেরও বেশি দূরে।

শেষ সংখ্যা ৩৫০ মেঃমিঃকে কিলোমিটারে দেখালে হবে ৩,৫০,০০০ বা চাঁদের দূরত্বের চেয়ে একটু কম। কাজেই আমাদের **ছোট্ট** মডেল, আমাদের পৃথিবী যেখানে পিনের মাথা আর সূর্য একটা ক্রোকে বল, তা একটা মহাজাগতিক আয়তন নেবে!

কিন্তু আমাদের মডেল এখনো সম্পূর্ণ নয়। সেখানে ছায়াপথের প্রান্তবর্তী তারারা ৩০,০০০ মেঃমিঃ দূরে থাকবে, চাঁদের চেয়ে ১০০ গুণ দূরে। কিন্তু ছায়াপথই তো আর গোটা ব্রহ্মাণ্ড নয়। তার ওপারে বহুদূরে আরো নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। যেমন এন্ড্রোমিডা নীহারিকাপুঞ্জের খালি চোখে দৃষ্ট তারা পরিবার। বা খালি চোখে দৃষ্ট মাগেল্লানিক মেঘপুঞ্জ। আমাদের মডেলে ছোট মাগেল্লানিক মেঘ হবে ৪,০০০ মেঃমিঃ ব্যাসের একটি জিনিস, বড় মাগেল্লানিক মেঘ হবে ৫,৫০০ মেঃমিঃ ব্যাসের একটি জিনিস। দুটোই মডেলে ছায়াপথ থেকে ৭০,০০০ মেঃমিঃ দূরে থাকবে। এন্ড্রোমিডা নীহারিকাপুঞ্জের মডেলটির ব্যাস হবে ৬০,০০০ মেঃমিঃ। মডেলে ছায়াপথ থেকে তা ৫,০০,০০০ মেঃমিঃ দূরে বসবে। প্রায় বৃহস্পতি থেকে সূর্যের প্রকৃত দূরত্বের সমান!

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা যে দূরতম জ্যোতিষ্কদের সন্ধান পেয়েছে তারা হল ছায়াপথের চৌহদ্দির বহুদূরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জগুলি। সূর্য থেকে তারা ১০০,০০,০০,০০০ আলোক বর্ষ দূরে। পাঠক যদি চান তো আমাদের মডেলে এই দূরত্ব দেখাবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সফল হলে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার দৃষ্টি ক্ষমতার আওতায় ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশটি ধরা পড়ে তার আয়তন সম্বন্ধে একটা ধারণা তাঁর হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাধ্যাকর্ষণ

সোজা উপরে কামান দাগা

বিষুবরেখায় বসান একটা কামান খাড়া উপরে দাগলে পর গোলাটা কোথায় যাবে (৮৬ নং ছবি)? ২০ বছর আগে এই সমস্যা একটি পত্রিকায় আলোচিত হয়। তাতে বলা হয়, একটা কামানের গোলা ছোঁড়ার সময় সেকেন্ডে ৮,০০০ মিঃ গতিবেগ নিয়ে বেরলে ৭০ মিনিটে ৬,৪০০ কিঃমিঃ উঁচুতে উঠবে (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ)। পত্রিকায় বলা হয়:

'কামানের গোলাকে বিষুবরেখায় খাড়া উপরে ছুঁড়লে, নল ছেড়ে তা বাড়তি বিষুবরেখার অন্তর্গত জায়গার পূবমুখী বৃত্তাকার গতিবেগও পাবে (সেকেন্ডে ৪৬৫ মিঃ)। ঐ গতিবেগেই গোলাটা বিষুবরেখার সমান্তরালে ছুটবে। ছোঁড়ার মুহূর্তে নলের ঠিক ৬,৪০০ কিঃমিঃ উপরে যে বিন্দুটি সেটি দ্বিব্যাসার্ধের বৃত্ত ধরে দ্বিগুণ গতিবেগে সরে যাবে। তাই সে পূবমুখী যাত্রায় গোলাটার আগে থাকবে। গোলাটা তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়ে ছোঁড়ার বিন্দুটির সরাসরি ঊর্ধ্বে থাকবে না, কিছুটা দূরে পশ্চিমে থাকবে। গোলাটা পৃথিবীতে পড়ার সময় ঠিক ঐ কাণ্ডই আবার ঘটবে। ৭০ মিনিটের উত্থান আর পতনে গোলাটা ৪,০০০ কিঃমিঃ পশ্চিমে পড়বে। সেখানেই তাকে আমরা আশা করব। গোলাটা সোজা নলে ফিরে আসুক এই যদি চাই তবে খাড়া উপরে না ছুঁড়ে একটু বাঁকা কোণ করে, এই ক্ষেত্রে ৫° কোণে, দাগতে হবে।'

ফ্লামারিওন তাঁর 'জ্যোতির্বিদ্যায়' এই সমস্যাটিরই একেবারে অন্য সমাধান দিয়েছেন:

'একটা গোলাকে আকাশে সোজা সুবিন্দুতে ছোঁড়া হলে গোলাটা কামানের নলেই ফিরে আসবে, যদিও তার উত্থান পতনের সময় কামানটা পৃথিবীর সঙ্গে পূবে সরে যাবে। কারণ স্বতঃস্পষ্ট। ঊর্ধ্বগামী গোলাটা পৃথিবীর গতি থেকে যে গতিবেগ পায় তার কিছুই হারায় না। যে দুটো ঠেলা সে পায় তারা পরস্পরকে বাধা দেয় না, এক কিলোমিটার উঠেও গোলাটা একই সঙ্গে ধরা যাক ৬ কিঃমিঃ পূবে যাবে। শূন্যে তার গতি এমন একটি সামান্তরিকের কর্ণ অনুসরণ করবে যার একটি বাহু ১ কিঃমিঃ অন্যটি ৬ কিঃমিঃ লম্বা। মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার যে নিম্নমুখী যাত্রা তা অনুসরণ করবে অপর কর্ণটি (বা একটি বক্ররেখাকে, কারণ তার পতনের বেগ বাড়বে) আর গোলাটা সোজা নলের ভিতর পড়বে।'
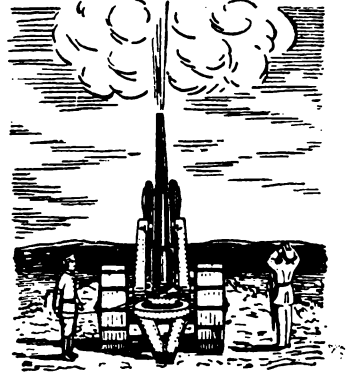
৮৬ নং ছবি: খাড়া উঁচুতে ছোঁড়া গোলার সমস্যা।

ফ্লামারিওন বলছেন, 'কিন্তু এর পরীক্ষাটা কষ্টসাধ্য। কারণ ভালো ক্যালিবার-করা কামান দুর্লভ জিনিস আর তা দিয়ে খাড়া উপরমুখে তাগ করাও কঠিন। ১৭শ শতাব্দীতে মার্সেঁ আর পুতি এই পরীক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা নিক্ষিপ্ত গোলাটা ফিরেও পাননি। ভারিনিয়োঁ'র 'মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে আরো কিছু ভাবনা চিন্তা' (১৬৯০) বইটির নামপত্রে একটি প্রয়োজনীয় ছবি আছে (আমাদের এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় সেটি ছাপা হয়েছে)। তাতে দেখা যাচ্ছে দুজন দর্শক, একজন সন্ন্যাসী অন্যজন সৈনিক, সুবিন্দুর দিকে তাগ করা একটা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে গোলার যাত্রার দিকে চেয়ে আছেন। ছবিতে ফরাসী ভাষায় লেখা রয়েছে: "ফিরবে কি?" সন্ন্যাসীটি মার্সেঁ, সৈনিকটি পুতি। এই বিপজ্জনক পরীক্ষা তাঁরা একাধিকবার চালান। কিন্তু লক্ষ্যভেদে দক্ষতার অভাবের ফলে গোলাটাকে তাঁরা নিজেদের মাথায় ফেলতে পারেননি। তাই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গোলাটা আকাশেই কোথাও রয়ে গেছে। ভারিনিয়োঁ স্তম্ভিত হয়ে বলে ওঠেন: "আমাদের মাথার উপরে কামানের গোলা ঝুলছে! কী তাজ্জব ব্যাপার!" স্ট্রাস্‌বুর্গে এই পরীক্ষাটিই আবার করা হলে দেখা যায় গোলাটা কামান থেকে কয়েক শ' মিটার দূরে পড়েছে। বোঝাই যায় কামানটা ঠিকভাবে খাড়া উপরে তাগ করা হয়নি।'

দেখাই যাচ্ছে দুটো সিদ্ধান্তে তীব্র বিরোধ। একটা বলছে গোলাটা কামানের অনেক পশ্চিমে পড়বে, অন্যটা বলছে গোলাটা ছোঁড়ার জায়গাতেই ফিরে আসবে। কোনটা ঠিক?

ঠিক বলতে গেলে দুটোই ভুল। যদিও ফ্লামারিওনের কথাটা সত্যের অনেক কাছাকাছি। গোলাটা কামানের **পশ্চিমেই** পড়বে, কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্তে যতটা দূরে বলা হয়েছে ততটা দূরে নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টার কথা মতো কামানের নলেও নয়।

দুঃখের সঙ্গে জানাই, সেটা সমাধান করে দেখানোর কাজটা প্রাথমিক গণিতের আওতার বাইরে।* তাই আমরা কেবল শেষ ফল নিয়েই আলোচনা করব।

গোলাটার গোড়ার গতিবেগের চিহ্ন হল v, পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের কৌণিক গতিবেগ হল w আর মাধ্যাকর্ষণ-জাত ত্বরায়ন হল g, দূরত্বের জন্য রইল x — কামানের পশ্চিমে যেখানে গোলাটা পড়ছে, $x = \frac{৪}{৩} w \frac{v^৩}{g^২}$ বিষুবরেখাকে বোঝাচ্ছে, আর $x = \frac{৪}{৩} w \frac{v^৩}{g^২} \cos\varphi$ φ অক্ষাংশকে।

প্রথম লেখকের উত্থাপিত সমস্যায় আমরা জানি, $w = \frac{২\pi}{৮৬,১৬৪}$, v = সেকেণ্ডে ৮,০০০ মিঃ আর g = ৯·৮ মিঃ/সেকেণ্ড২।

তাই দেখি x = ৫২০ কিঃমিঃ। সুতরাং গোলাটা কামানের ৫২০ কিঃমিঃ পশ্চিমে পড়বে (প্রথম লেখকের কথানুযায়ী ৪,০০০ কিঃমিঃ দূরে নয়)।

ফ্লামারিওনের বেলায় এই সূত্র কী জবাব দেবে? কামানটা বিষুবরেখায় বসিয়ে দাগা হয়নি, হয়েছিল প্যারিসের কাছে ৪৮ অক্ষাংশে। প্রাচীন কামান থেকে ছোঁড়া গোলাটার প্রাথমিক গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩০০ মিঃ বলে ধরে নিচ্ছি। আমরা জানি $w = \frac{২\pi}{৮৬,১৬৪}$, v = সেকেণ্ডে ৩০০ মিঃ, g = ৯·৮ মিঃ/সেকেণ্ড২ আর φ = ৪৮°, তাই দেখি x = ১৮ মিঃ। গোলাটা ফরাসী জ্যোতির্বিদের কথা মতো নলে পড়বে না। পড়বে কামানটার ১৮ মিঃ পশ্চিমে। অবশ্য আমরা বায়ু স্রোতের ফলে যে বিচ্যুতি ঘটতে পারে তার কথা ধরিনি যদিও তা ফলের বেশ ভাল রকম বদল ঘটাতে পারে।

অতি উচ্চতায় ওজন

উপরোক্ত হিসাবে এমন একটা জিনিস বিবেচনা করা হয়েছে যার কথা এখন পর্যন্ত বলা হয়নি। পৃথিবী থেকে যত দূরে যাবে মাধ্যাকর্ষণ ততই কমে আসবে — এই সূত্রের কথাই বলছি। ওজন হল বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের ফল। দুটো জিনিসের মধ্যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক টানও দ্রুত কমে আসবে। নিউটনী বিধান অনুযায়ী

* বিশেষভাবে আর বেশ খুঁটিয়ে হিসাব করার প্রয়োজন হবে। বিশেষজ্ঞরা আমার অনুরোধে তা করেছেন, কিন্তু তার সব খুঁটিনাটি অনেকটা জায়গা জুড়বে।

মাধ্যাকর্ষণ **বর্গ** দূরত্বের বিপরীত হারে চলে; এখানে দূরত্ব হল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে। কারণ পৃথিবী সব কিছুকেই টানে, যেন তার সমস্ত বস্তুভার কেন্দ্রেই সংহত হয়েছে। তাই ৬,৪০০ কিঃমিঃ উচ্চতায় — যা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসার্ধের দূরত্বের দ্বিগুণ দূরে — পৃথিবীর বুকের মাধ্যাকর্ষণ একচতুর্থাংশে ঠেকে।

একটা কামানের গোলা যখন উপরে ছোঁড়া হয় তখন সে যতটা উঁচুতে যায় তা যেতে পারত না, যদি উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের জোর কমে না আসত। আমরা ধরে নিচ্ছি খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটা গোলা যার প্রাথমিক গতিবেগ সেকেণ্ডে ৮,০০০ মিঃ, সে ৬,৪০০ কিঃমিঃ উঁচুতে পৌঁছবে। কিন্তু উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের কমতিটা বিবেচনা না করে সাধারণভাবে পরিচিত সূত্র অনুযায়ী তার উচ্চতার সীমা বের করতে গিয়ে এমন একটা উচ্চতা পাব যা আসল উচ্চতার অর্ধেক মাত্র। এই হল হিসাবটা। v গতিবেগ আর g মাধ্যাকর্ষণ-জাত ত্বরায়ন সহযোগে একটি জিনিস খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত হলে যে h উচ্চতায় পৌঁছবে তা মাপার একটা সূত্র পদার্থবিদ্যা আর বলবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে পাওয়া যায়। সূত্রটা হল এই:

$$h = \frac{v^{২}}{২g}।$$

v যদি হয় সেকেণ্ডে ৮,০০০ মিঃ আর g = ৯·৮ মিঃ/সেকেণ্ড২, h তবে হবে

$$\frac{৮.০০০^{২}}{২ \times ৯\cdot৮} = ৩২,৬৫,০০০ \text{ মিঃ} = ৩,২৬৫ \text{ কিঃমিঃ}।$$

পূর্বোক্ত উচ্চতার প্রায় অর্ধেক। আগেই বলেছি এই পার্থক্যের কারণ হল পাঠ্যবইয়ের সূত্র প্রয়োগ করে উচ্চতার ফলে মাধ্যাকর্ষণের যে কমতি ঘটে সেটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। গোলার উপর পৃথিবীর টান কমে এলে নির্দিষ্ট গতিবেগে গোলাটা যে আরো উপরে উঠে যাবে সে তো অত্যন্ত সহজ কথা।

অবশ্য খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর উচ্চতার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের সূত্রটিকে ভুল বলে মনে করলে চলবে না। যে উদ্দেশে তারা রচিত তার পক্ষে তারা নিখুঁৎ। কেবল সেই উদ্দেশের চৌহদ্দি পেরলেই তারা আর নির্ভরযোগ্য থাকে না। এই সূত্রগুলি রচিত হয়েছে নিম্ন উচ্চতার জন্য, যেখানে মাধ্যাকর্ষণের কমতির হার এতই নিচু যে তাকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। যেমন যে গোলাটা সেকেণ্ডে ৩০০ মিঃ প্রাথমিক গতিবেগে উপরে নিক্ষিপ্ত হল তার বেলায় মাধ্যাকর্ষণের কমতিটা নগণ্য।

একটি কৌতূহলজনক প্রশ্ন আছে: আধুনিক বিমান যে উঁচুতে ওঠে সেখানে কি মাধ্যাকর্ষণের কমতিটা অনুভব করা যায়? ঐ উচ্চতায় ওজনের কমতি কি বোঝা যায়? ১৯৩৬ সালে বৈমানিক ভ্লাদিমির ককিনাকি নানা রকম ওজন নিয়ে অতি উচ্চতায়

উঠেছিলেন — আধ টন নিয়ে ১১,৪৫৮ মিটার, ১ টন নিয়ে ১২,১০০ মিঃ, ২ টন নিয়ে ১১,২৯৫ মিঃ। প্রশ্নটা হল: উক্ত উচ্চতায় এই মালগুলো তাদের মূল ওজন বজায় রেখেছিল কি, নাকি তাদের ওজন স্পষ্টতই কমে গিয়েছিল? প্রথম নজরে মনে হয় আমাদের পৃথিবীর মতো বিরাট গ্রহে ১০ কিলোমিটার উঁচুতে উঠলে ওজনের বিশেষ কিছু কমতি ঘটবে না। তার বুকে মালটা গ্রহের কেন্দ্র থেকে ৬,৪০০ কিঃমিঃ দূরে ছিল। ১২ কিঃমিঃ উত্থানের ফলে দূরত্ব বেড়ে হল ৬,৪১২ কিঃমিঃ। যেটুকু বাড়তি যোগ হল সেটা এতই নগণ্য যে মনে হয় ওজনের কমতিটা বোঝা যাবে না। হিসাবের ফল কিন্তু বিপরীত। ওজনের কমতি বেশ অনুভব করা যায়।

একটা বিশেষ ঘটনা নিয়ে হিসাব করা যাক, যেমন কাকিনাকির ২,০০০ কিলোগ্রাম নিয়ে ১১,২৯৫ মিঃ উচ্চতায় যাত্রা। বিমানটি মাটি ছাড়ার সময় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে ছিল এই উচ্চতায় তার $\frac{৬,৪১১\cdot৩}{৬,৪০০}$ গুণ বেশি দূরে এসেছিল।

এখানে মাধ্যাকর্ষণ হল $\left(\frac{৬,৪১১\cdot৩}{৬,৪০০}\right)^২$, তার মানে $\left(১+\frac{১১\cdot৩}{৬,৪০০}\right)^২$ গুণ কম।

তাই এই উচ্চতায় ঐ মালের ওজন হবে

$$২,০০০ : \left(১+\frac{১১\cdot৩}{৬,৪০০}\right)^২ \text{ কিলোগ্রাম।}$$

সবটা কষে (তার জন্য একটা মোটামুটি হিসাবই যথেষ্ট*) দেখব উচ্চতার সীমায় ২,০০০ কিলোগ্রাম মালের ওজন হবে মাত্র ১,৯৯৩ কিলোগ্রাম, ৭ কিলোগ্রাম কম, কমতিটা বেশ অনুভবযোগ্য। এই উচ্চতায় এক কিলোগ্রাম হবে স্প্রিংয়ের ওজনযন্ত্রের ৯৯৬·৫ গ্রাম, ৩·৫ গ্রাম কম পড়বে।

কম্পাস নিয়ে গ্রহ পথে

কেপলারের প্রতিভা প্রকৃতির কাছ থেকে বহুপরিশ্রমের ফলে গ্রহদের গতির যে তিনটি বিধান বার করেছিল তাদের প্রথমটি বোধহয় অনেকের কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য। এই নিয়মে বলা হয় গ্রহরা চলে উপবৃত্তের পথে। উপবৃত্তে কেন? সূর্যের টান যখন

---

* আমরা স্থূল সাম্যকে কাজে লাগাতে পারি

$$(১+a)^২ = ১+২a \text{ আর } ১:(১+a)=১—a,$$

a এখানে একটা ক্ষুদ্র পরিমাণ। তাই

$$২,০০০ : \left(১+\frac{১১\cdot৩}{৬,৪০০}\right)^২ = ২,০০০ : \left(১+\frac{১১\cdot৩}{৩,২০০}\right) = ২,০০০ — \frac{১১\cdot৩}{১\cdot৬} = ২,০০০—৭।$$

সর্বদিকেই সমান তার উপর আবার সে টান যখন দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদিকেই সমানভাবে কমে যায়, তখন গ্রহদের সূর্যকে বৃত্তপথে পাক দেওয়া উচিত। একটা আবদ্ধ লম্বাটে পথ ধরে তার যাত্রা উচিত না, যেখানে সূর্য মোটেই কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকে না। গণিত এই ধাঁধার ব্যাখ্যা দেয়। সব সখের জ্যোতির্বিদরা ক্যাল্‌কুলাসে দক্ষ নন বলে কেপলার নিয়মের নির্ভুলতা বোঝার কাজে আমি তাদের সাহায্য করব।
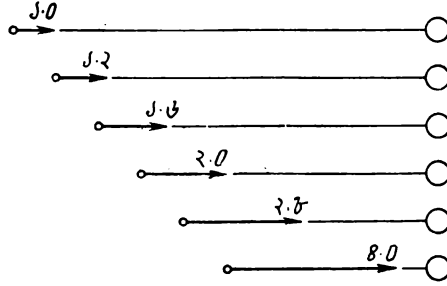
৮৭ নং ছবি: গ্রহ সূর্যের যতই কাছে আসবে ততই সূর্যের অভিকর্ষের জোর বাড়বে।

একটা কাগজে কম্‌পাস আর স্কেলরুলার দিয়ে গ্রহপথের চার্ট আঁকা যাক। তাহলেই সে-পথের ঘেরগুলো যে কেপলার বিধান মেনে চলে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাব।

মাধ্যাকর্ষণই গ্রহদের গতির পরিচালক। সেটা আরো খতিয়ে দেখা থাক। ৮৭ নং ছবির ডাইনে যে বৃত্তটা রয়েছে সেটা হল একটা কল্পিত সূর্য; বাঁয়ে রয়েছে একটা কল্পিত গ্রহ। ধরা যাক এদের মাঝখানে ১০,০০,০০০ কিঃমিটারের দূরত্ব। আমাদের ছবিতে তা হল ৫ সেঃমিঃ। ১ সেঃমিটারে ২,০০,০০০ কিঃমিঃ এই হল মান।

০·৫ সেঃমিটারের তীরটা হল সূর্য গ্রহকে যে শক্তিতে টানে তা (৮৭ নং ছবি)। ধরা যাক এই টানের ফলে আমাদের গ্রহ সূর্যের কাছে চলে গেল। এখন তার সঙ্গে সূর্যের দূরত্ব হল ৯,০০,০০০ কিঃমিঃ, আমাদের ছবিতে ৪·৫ সেঃমিঃ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহের উপর সূর্যের টান (১০/৯)২ গুণ বা ১·২ গুণ বাড়া উচিত ছিল। প্রথমে যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দেখানর জন্য ১ এককের একটা তীর নিয়ে থাকি এখন তাহলে ১·২ এককের তীর নিতে হবে। দূরত্ব যদি ৮,০০,০০০ কিঃমিটারে কমে আসে — আমাদের ছবিতে ৪ সেঃমিঃ — টানের শক্তি বাড়বে (৫/৪)২ বা ১·৬ গুণ, ১·৬ এককের তীর দিয়ে তা দেখান হবে। সূর্য থেকে যথাক্রমে ৭, ৬ আর ৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে টানের শক্তি যথাক্রমে ২, ২·৮ আর ৪ একক দৈর্ঘ্যের তীর দিয়ে বোঝান হচ্ছে।

এই তীরগুলোর সাহায্যে শুধু টানের শক্তি নয়, সময়ের একটি এককে জিনিসটির ঠাঁই বদলের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে (এক্ষেত্রে ঠাঁই বদলটা ত্বরায়ন, সুতরাং শক্তির হার অনুপাতে ঘটবে)। এই ছবিটাকে আমরা পরে অন্য ছবিতে গ্রহদের ঠাঁই বদলের তৈরী মান হিসাবে কাজে লাগাব।

৮৮ নং ছবি: সূর্য (S) কী ভাবে গ্রহের পথ (WKPR) বেঁকিয়ে দেয়।

এখন সূর্য প্রদক্ষিণকারী একটি গ্রহের পথটার চার্ট বানান যাক। ধরা যাক উপরোক্ত ভর বিশিষ্ট একটা গ্রহ, WK — এই মুখে দৈর্ঘ্যের দুটি এককের গতিতে ছুটে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য থেকে ৮,০০,০০০ কিঃমিঃ দূরে K বিন্দুতে এসে পেঁছিল (৮৮ নং ছবি)। এত দূরে সূর্যের টান সময়ের একটি এককে গ্রহটাকে তার দিকে দৈর্ঘ্যের ১·৬ একক টেনে আনবে। ঐ একই সময়ে গ্রহটা তার মূল পথ WK'তে ২ একক যাবে। তার ফলে গ্রহটা এগবে KP রেখা ধরে — K১ আর K২ এই দুটি চালের ফলে যে সামান্তরিক তৈরী হয়েছে তার কর্ণ। এই কর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩ এককের সমান (৮৮ নং ছবি)।

P বিন্দুতে এসে গ্রহটা ৩ একক বেগে KP — এই মুখে আরো এগতে চায়। কিন্তু SP=৫·৮ — এই দূরত্ব থেকে সূর্যের টানের প্রভাবে তা P৪=৩ পথ ধরে SP — এই মুখে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তার ফলে সে সামান্তরিকের PR কর্ণটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে।

এই ছবিতে বাকি পথটার চার্ট দেখানর কোনই দরকার নেই, মানটা খুবই বড়। স্বভাবতই মানটা যত ছোট হবে গ্রহের পথ ততই বেশি করে দেখাতে পারব আর কোণগুলির সূক্ষ্মতায় গ্রহের প্রকৃত পথের সঙ্গে চার্টের মিলের যে বিকৃতি ঘটে তাও কমবে। ৮৯ নং ছবি ঐ একই ছবি দেখাচ্ছে তবে আগের গ্রহের সমান ভরবিশিষ্ট যে

কোন জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সূর্যের কল্পিত সাক্ষাৎকারের মানটাকে আরো ছোট করে। এতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সূর্য কী ভাবে নবাগতকে তার মূল পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তাকে P — I — II — III — IV — V — VI এই বক্র পথ নিতে বাধ্য করে। কোণগুলো এখানে অত তীব্র নয়, আমরা সহজেই সমান বক্ররেখা দিয়ে গ্রহের অবস্থানগুলোকে যুক্ত করতে পারি।

৮৯ নং ছবি: সূর্য গ্রহকে (P) তার মূল সরল রেখার পথ থেকে বিচ্যুত করে তাকে বাঁকা পথে চলতে বাধ্য করে।

এই বক্র পথটা কী? তার উত্তর পাব জ্যামিতি থেকে। একটা ট্রেসিং কাগজ ছবিটার উপরে বসিয়ে (৮৯ নং ছবি) গ্রহের পথের যে কোন ছটা বিন্দু আন্দাজে বেছে নিয়ে নকল করুন। বিন্দুগুলোকে যে কোন পর্যায়ে নম্বর দিন (৯০ নং ছবি) আর তাদের সেই পর্যায়ানুযায়ী সরল রেখা টেনে যুক্ত করুন। তার ফলে গ্রহের পথে একটা ষট্‌কোণ পাওয়া যাবে যার ভুজগুলো অংশত ছেদ করা। এখন ১ — ২ রেখাটা যেখানে I বিন্দুতে ৪ — ৫ রেখাটাকে কাটে সেই পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলুন। এই ভাবেই ২ — ৩ আর ৫ — ৬ সরল রেখাদুটো পরস্পরকে যেখানে কাটছে সেখানে II বিন্দুটি পাবেন, III বিন্দুকে পাবেন ৩ — ৪ আর ১ — ৬ রেখাদুটি পরস্পরকে যেখানে কাটছে সেখানে। পরীক্ষাধীন বক্ররেখাটা যদি হয় তথাকথিত 'কোনিক সেকশন' তার মানে, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত

তাহলে I, II, III বিন্দুগুলো একই সরল রেখায় থাকবে। এই জ্যামিতিক উপপাদ্যটিই (মাধ্যমিক ইস্কুলে সেটি পড়া হয় না) 'পাস্কালের ষট্কোণ' নামে পরিচিত।
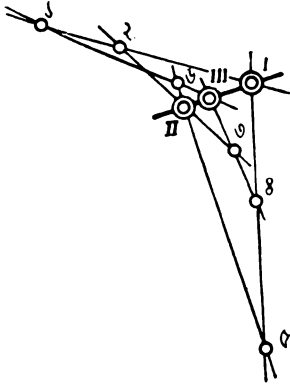
৯০ নং ছবি: সূর্যের চারপাশে গ্রহদের শঙ্কুচ্ছেদ ধরে গতির জ্যামিতিক প্রমাণ (বইয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন)।

যত্ন করে আঁকা ছবিতে ছেদের নির্দিষ্ট বিন্দুগুলি একটি সরল রেখায় পড়বে। এতে প্রমাণ হয় আমাদের বক্র রেখাটি হয় উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত নয় পরাবৃত্ত। প্রথমটি ৮৯ নং ছবির বেলায় প্রযোজ্য নয় কারণ বক্ররেখাটি বন্ধ নয়, কাজেই গ্রহটি হয় অধিবৃত্ত নয় পরাবৃত্ত ধরে চলেছে। মূল গতিবেগ আর টানের শক্তির অনুপাত এমনই যে সূর্য গ্রহটিকে শুধু তার সোজা পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। গ্রহকে সূর্য তার চারদিকে ঘোরাতে, বা জ্যোতির্বিদদের ভাষায় 'অধিকার' করতে অক্ষম।

এবার গ্রহগতির দ্বিতীয় নিয়মটা বোঝান যাক। তথাকথিত এলাকার নিয়ম। ৪৪ পৃষ্ঠায় ২১ নং ছবিটা দেখুন। ১২টা বিন্দু তাকে ১২টা অংশে ভাগ করেছে। যদিও তারা সমান দীর্ঘ নয়, তবু গ্রহরা তাদের পার হতে সমান সময় নেয়। সূর্যের সঙ্গে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বিন্দুগুলিকে যুক্ত করে আমরা ১২টা ছবি পাই। বিন্দুগুলিকে জ্যা দিয়ে যুক্ত করলে তারা ত্রিভুজের কাছাকাছি আসবে। তাদের ভিৎ, উচ্চতা মেপে এলাকা হিসাব করা যায়। দেখব প্রতিটি ত্রিভুজ এলাকায় সমান। তার মানে আমরা কেপলারের দ্বিতীয় নিয়মের সমীপবর্তী হই:

গ্রহদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ-ভেক্টর সমান সময়ে সমান এলাকা পার হয়।

এই ভাবে কম্পাস আমাদের গ্রহগতির দুটো নিয়ম বুঝতে সাহায্য করে। তৃতীয় নিয়মটা বোঝাতে হলে কম্পাস রেখে কাগজ কলম নিয়ে কিছু অংক কষতে হবে।

গ্রহরা যখন সূর্যে পড়ে

সূর্য প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবী যদি হঠাৎ কোথাও বাধা পায় তখন কী হবে ভেবে দেখেছেন কি? প্রথমেই, স্বভাবত, সচল বস্তু বলে তার মধ্যে যে বিরাট শক্তি জমে রয়েছে সেটা তাপে পরিণত হয়ে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তুলবে। পৃথিবী তার কক্ষপথে বুলেটের চেয়ে বহুগুণ জোরে ছোটে বলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তার গতির শক্তি তাপে পরিণত হয়ে এক তুমুল অগ্নিকাণ্ড সুরু হবে। সেই আগুন সঙ্গে সঙ্গেই জগৎটাকে জ্বলন্ত গ্যাসের বিপুল মেঘে পরিণত করবে...

হঠাৎ থামার এ-রকম ফল যদি নাও হয় তবুও পৃথিবী আগুনে পুড়ে যাবে। সূর্যের টান পৃথিবীকে সোজাসুজি তার অগ্নি আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলবে।

এই করাল পতন সুরু হবে খুবই ধীরে, কচ্ছপের গতিতে। প্রথম সেকেণ্ডে পৃথিবী সূর্যের দিকে এগবে মাত্র ৩ মিঃমিঃ। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডেই তার গতিবেগ বাড়বে। শেষ সেকেণ্ডে তা ৬০০ কিঃমিটারে পেণছবে। এই ভীষণ গতিতে পৃথিবী সূর্যের জ্বলন্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এই বিপর্যয় ঘটতে কত সময় লাগবে? আমাদের মরণোন্মুখ জগৎ কতক্ষণ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হবে? সময়টা জানতে পারব কেপলারের **তৃতীয়** নিয়মের সাহায্যে। সে শুধু গ্রহদের গতিই নয়, ধূমকেতু আর সাধারণভাবে মহাকর্ষের কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাবে যে সব জ্যোতিষ্ক মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায় তাদের সবার গতির বেলাতেই প্রযোজ্য। গ্রহের কক্ষাবর্তনকে (তার 'বছর') সূর্য থেকে তার দূরত্বের সঙ্গে যুক্ত করে এই নিয়ম। তাতে বলা হয়েছে:

সূর্যের চারদিকে গ্রহদের কক্ষাবর্তন পর্বের বর্গ তাদের কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধের ঘনকের অনুপাতের সমান।

এই ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর সূর্যমুখী যাত্রার সঙ্গে কল্পিত ধূমকেতুর তুলনা করতে পারি; সে ধূমকেতু অত্যন্ত বর্ধিত চ্যাপ্টা উপবৃত্তের পথে চলে, তার দূরতম বিন্দুগুলি পৃথিবীর কক্ষপথে আর সূর্যের কেন্দ্রে অবস্থিত। ও-রকম ধূমকেতুর কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধ আপাতভাবে পৃথিবীর কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধের অর্ধেক হবে। আমাদের কল্পিত ধূমকেতুর আবর্তন পর্বটা এখন বের করা যাক।

কেপলারের তৃতীয় নিয়মের ভিত্তিতে আমরা এই অনুপাতটি পাই:

$$\frac{(\text{পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের পর্ব})^২}{(\text{ধূমকেতুর কক্ষাবর্তনের পর্ব})^২} = \frac{(\text{পৃথিবীর কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধ})^৩}{(\text{ধূমকেতুর কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধ})^৩}।$$

পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের পর্ব হল ৩৬৫ দিন। তার কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধটাকে যদি বলি ১, তাহলে ধূমকেতুর কক্ষপথের প্রধান অক্ষার্ধ হবে ০·৫। আমরা তবে এই অনুপাত পাব:

$$\frac{৩৬৫^২}{(\text{ধূমকেতুর কক্ষাবর্তনের পর্ব})^২} = \frac{১}{(০·৫)^৩},$$

কাজেই $(\text{ধূমকেতুর কক্ষাবর্তনের পর্ব})^২ = ৩৬৫^২ \times \frac{১}{৮}।$

সুতরাং

$$\text{ধূমকেতুর কক্ষাবর্তনের পর্ব} = ৩৬৫ \times \frac{১}{\sqrt{৮}} = \frac{৩৬৫}{\sqrt{৮}}।$$

আমাদের কৌতূহল কল্পিত ধূমকেতুর কক্ষাবর্তনের পূর্ণ পর্ব নিয়ে নয়, তার অর্ধপর্ব নিয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে সূর্যে যাবার এক দফার পথে তার যাত্রাকাল। পৃথিবীর সূর্যে পড়তে অতটা সময়ই লাগবে। হিসাব করে দেখা যাক:

$$\frac{৩৬৫}{\sqrt{৮}} : ২ = \frac{৩৬৫}{২\sqrt{৮}} = \frac{৩৬৫}{\sqrt{৩২}} = \frac{৩৬৫}{৫\cdot৬৫}।$$

সুতরাং পৃথিবীর সূর্যে পড়তে কত সময় লাগবে তা জানতে পারব বছরকে $\sqrt{৩২}$ দিয়ে বা ৫·৬৫ দিয়ে ভাগ করলে। পূর্ণ সংখ্যায় ৬৫ দিন।

কাজেই দেখা গেল কক্ষযাত্রায় হঠাৎ থেমে যাবার পর সূর্যে পড়তে পৃথিবীর দু মাস লাগবে।

সহজেই দেখা যায় যে কেপলারের তৃতীয় নিয়মের ভিত্তিতে রচিত এই সূত্র শুধু পৃথিবী নয়, সব গ্রহের বেলাতেই প্রযোজ্য এমন কি সব উপগ্রহের বেলায়ও। তার মানে কোন গ্রহ বা উপগ্রহ তার কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্কের উপর পড়তে কত সময় নেবে তা জানতে হলে কক্ষাবর্তনের পর্বকে $\sqrt{৩২}$ বা ৫·৬৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, যার কক্ষাবর্তন পর্ব হল ৮৮ দিন, ১৫½ দিনে সূর্যে পড়বে। নেপচুন, যার একটি ‘বছর’ হল ১৬৫টি পার্থিব বছরের সমান, পড়বে ২৯ বছরে। প্লুটো ৪৪ বছরে।

চাঁদ হঠাৎ থেমে গেলে পর পৃথিবীতে পড়তে কত সময় নেবে? চাঁদের কক্ষাবর্তন পর্ব ২৭·৩ দিনকে ৫·৬ দিয়ে ভাগ করে পাই প্রায় পাঁচ দিন। শুধু চাঁদ নয়, অতদূরে অবস্থিত সবকিছুই পাঁচ দিনে পৃথিবীতে পড়বে, অবশ্য যদি তার সূচনার গতিবেগ হয় শূন্য। পড়ার সময় সে শুধু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বশবর্তী হবে (সহজ করার জন্য সূর্যের প্রভাবটা বাদ দিলাম)। এই একই সূত্রের সাহায্যে আমরা জুল ভার্নের ‘কামান থেকে চাঁদে’ বইয়ের নায়কদের সেখানে যেতে কত সময় লেগেছিল তা জানতে পারব।

ভালকানের হাপর

আমরা যে নিয়মটা বের করেছি সেটাকে পুরাণের রাজ্যের এক অদ্ভুত সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাব। গ্রীক পুরাণে ভালকানের কাহিনীতে কথা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা হয়েছে ভালকান তার হাপর ফেলে দিয়েছিল আর সেটা ন দিনে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পড়েছিল। প্রাচীনদের পক্ষে এই পর্বটা দেবতাদের আবাসভূমির অপরিমেয় উচ্চতা সম্পর্কে তাঁদের যে ধারণা তার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। চেওপ্সের পিরামিডের মাথা থেকে হাপরটার পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগত পাঁচ সেকেন্ড!

প্রাচীন গ্রীকদের ব্রহ্মাণ্ডকে খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগবে না; এই নিদর্শনের সাহায্যে মাপলে দেখা যাবে আধুনিক ধারণার তুলনায় সেটি বেশ ছোট।

আমরা জানি পৃথিবীতে পৌঁছতে চাঁদের পাঁচ দিন লাগবে। উপকথার হাপরটার লেগেছিল ন দিন। কাজেই যে 'আকাশ' থেকে হাপরটা পড়েছিল সেটি চাঁদের কক্ষপথের দূরে। কিন্তু কত দূরে? ৯ দিনকে $\sqrt{৩২}$ দিয়ে গুণ করে পৃথিবীর চারদিকে হাপরটার আবর্তনের সময়টা পাই, মানে সেটি যদি আমাদের গ্রহের উপগ্রহ হত তবেই: ৯×৫·৬=৫১ দিন। এখন চাঁদ আর আমাদের কল্পিত হাপর উপগ্রহের উপর কেপলারের তৃতীয় নিয়ম প্রয়োগ করা যাক, অনুপাতটাও কাগজে কলমে লেখা যাক:

$$\frac{(\text{চাঁদের কক্ষাবর্তনের পর্ব})^{২}}{(\text{হাপরের কক্ষাবর্তনের পর্ব})^{২}} = \frac{(\text{চাঁদের দূরত্ব})^{৩}}{(\text{হাপরের দূরত্ব})^{৩}}।$$

অনুপাতের মূল্যায়নের ফলে দেখা যায়:

$$\frac{২৭\cdot৩^{২}}{৫১^{২}} = \frac{৩,৮০,০০০^{৩}}{(\text{হাপরের দূরত্ব})^{৩}}।$$

পৃথিবী থেকে হাপরটার অজানা দূরত্ব এখন বের করা কিছুই কঠিন নয়: হাপরের দূরত্ব হল:

$$\sqrt[৩]{\frac{৫১^{২}\times৩,৮০,০০০^{৩}}{২৭\cdot৩^{২}}} = ৩,৮০,০০০\sqrt[৩]{\frac{৫১^{২}}{২৭\cdot৩^{২}}}।$$

ফল হল ৫,৮০,০০০ কিঃমিঃ।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার দৃষ্টিতে প্রাচীন গ্রীকদের আকাশের উচ্চতা সম্পর্কে ধারণাটা ছিল ছোট। চাঁদের চেয়ে কেবল ১½ গুণ দূরে। প্রাচীনদের ব্রহ্মাণ্ড যেখানে শেষ হচ্ছে আমাদের মনে প্রায় সেখান থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সূরু।

সৌরমণ্ডলের সীমানা

কেপলারের তৃতীয় নিয়ম আমাদের সৌরমণ্ডলের সীমানার দূরত্ব মাপতেও সাহায্য করে, অবশ্য তার জন্য ধূমকেতুর কক্ষপথের দূরতম বিন্দুগুলিকে (অপসূর) শেষপ্রান্ত বলে ধরতে হবে। আমরা আগেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, তাই এখানে শুধু প্রয়োজনীয় হিসাবেই নিজেদের সীমিত রাখব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত দীর্ঘ কক্ষাবর্তন পর্ব বিশিষ্ট ধূমকেতুর কথা বলেছি। সে পর্ব ৭৭৬ বছর নিয়েও হয়। এই

ধূমকেতুর অপসূরের যে দূরত্ব x সেটা এবার বের করা যাক, সূর্যের নিকটতম বিন্দুর (অনুসূর) দূরত্বটা আমাদের জানা — ১৮,০০,০০০ কিঃমিঃ। পৃথিবীকে দ্বিতীয় বস্তু হিসাবে নিয়ে এই অনুপাতটা পাওয়া যায়:

$$\frac{৭৭৬^২}{১^২} = \frac{\left[\frac{১}{২}\left(x + ১৮,০০,০০০\right)\right]^৩}{১৫,০০,০০,০০০^৩}।$$

তারপর

$$x + ১৮,০০,০০০ = ২ \times ১৫,০০,০০,০০০ \times \sqrt[৩]{৭৭৬^২},$$

সুতরাং

$$x = ২৫৩১,৮০,০০,০০০ \text{ কিঃ মিঃ।}$$

তাই দেখা যাচ্ছে এই ধূমকেতুগুলো সূর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে ১৮২ গুণ বেশি দূর দিয়ে যায়, প্লুটোর চেয়ে ৪·৫ গুণ, প্লুটো জ্ঞাত গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের।

জুল ভার্নের বইয়ের ভুল

'হেক্‌টর সের্ভাদাক' বইয়ে জুল ভার্ন ঘটনাস্থল হিসাবে যে কল্পিত ধূমকেতুটি নিয়েছেন তার নাম হল 'গাল্লিউম'। এই ধূমকেতুটি ঠিক দু বছরে সূর্যকে একবার পুরো পাক দেয়। বইয়ে একথাও বলা হয়েছে যে ধূমকেতুটির অপসূর সূর্যের ৮২ কোটি কিঃমিঃ দূরে। যদিও অনুসূরটা দেওয়া হয়নি তবু দুটি সংখ্যার — যা আমরা গণনা করব — উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে সৌরমণ্ডলে ও-রকম কোন ধূমকেতু হতে পারে না। কেপলারের তৃতীয় নিয়মের সাহায্যে হিসাব করেই তা দেখান যায়।

ধরা যাক অনুসূরের অজ্ঞাত দূরত্ব হল x মিলিয়ন কিঃমিঃ। ধূমকেতুর কক্ষপথের প্রধান অক্ষ তবে হবে x+৮২,০০,০০,০০০ কিঃমিঃ, আর প্রধান অক্ষার্ধ $\frac{x + ৮২০}{২}$ মিলিয়ন কিঃমিঃ। কেপলারের নিয়মের ভিত্তিতে ধূমকেতুর কক্ষাবর্তন পর্ব আর দূরত্বের সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষাবর্তন পর্ব আর দূরত্বের তুলনা করে এই অনুপাত পাই

$$\frac{২^২}{২} = \frac{(x + ৮২০)^৩}{২^৩ \times ১৫০^৩},$$

সুতরাং

$$x = -৩৪৩!$$

সূর্যের সঙ্গে ধূমকেতুর সবচেয়ে কম দূরত্বের হিসাবে যে ঋণ সংখ্যা পাওয়া গেল তা সমস্যাটার মূল বিষয়টা কত অদ্ভুত তার প্রমাণ দেয়। অন্য কথায়, কক্ষাবর্তনের এত ছোট্ট পর্ব — দু বছর — যে ধূমকেতুর সে কখনো জুল ভার্ন তাঁর বইয়ে সূর্য থেকে তার যে দূরত্বের কথা বলেছেন তা পাড়ি দিতে পারে না।

পৃথিবীর ওজন কী ভাবে নেওয়া হয়?

গল্পে আছে, একদা একটি সরলমন ছেলে জ্যোতির্বিদ্যা পড়তে গিয়ে দেখল জ্যোতির্বিদরা তারাদের নাম পর্যন্ত জেনে বসে আছেন। ছেলেটি তাতে একেবারে তাজ্জব বনে যায়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, জ্যোতির্বিদদের সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি হল আমাদের বাসস্থল এই পৃথিবী আর দূরের জ্যোতিষ্কদের **ওজন করা**। পৃথিবী আর আকাশকে সত্যি কী ভাবে ওজন করা হল, কোন দাঁড়িপাল্লায়?

প্রথমে, পৃথিবীর ওজন নেওয়া হল কী ভাবে? 'ভূগোলকের ওজন' বলতে কী বুঝি? আমরা যাকে ওজন বলি সেটা হল ভিতের ওপর বস্তুর চাপ বা নিলম্বনের বিন্দুতে তার টান। পৃথিবীর বেলায় এ দুটোর একটাও খাটে না, কারণ সে কোন কিছুর উপর ভরও করেনি, কোথা থেকে ঝুলছেও না। সুতরাং এদিক থেকে পৃথিবীর কোনো ওজন নেই বলতে হয়। তাই জ্যোতির্বিদরা যখন পৃথিবীকে 'ওজন করলেন' তখন তাঁরা কী বের করলেন? তাঁরা তার **ভর** বের করলেন। আমরা যখন দোকানের কর্মচারীকে এক কিলোগ্রাম
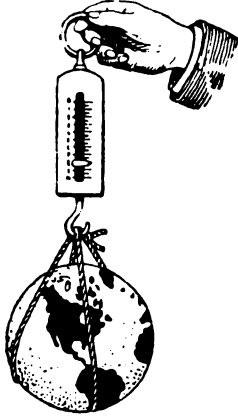
৯১ নং ছবি: পৃথিবীকে ওজন করার তুলোযন্ত্র কোনটা?
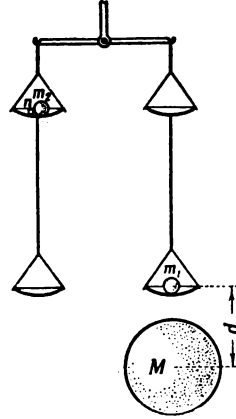
৯২ নং ছবি: পৃথিবীর ভর নির্ধারণের একটি উপায়; ইওলি ভারসাম্য।

চিনি দিতে বলি, তখন পাল্লার ওপর চিনির চাপ বা স্প্রিংয়ের ওজনযন্ত্রের উপর তার টানের কথা.ভাবি না। চিনির ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য। আমরা জানতে চাই তাতে ক' কাপ চিনি দেওয়া চা হবে, অন্য কথায় এক কিলোগ্রামে কতটা পরিমাণ চিনি পাব।

এই পরিমাণ মাপার উপায় কিন্তু কেবল একটাই। জিনিসটিকে পৃথিবী কতটা টানছে সেটা মাপলেই তা পাব। আমরা ধরে নিই সমান পরিমাণ বস্তুর ভর সমান এবং কোন জিনিসের ভরকে বিচার করি তার আকর্ষণ শক্তি দিয়ে, কারণ আকর্ষণ হল ভরের আনুপাতিক।

পৃথিবীর ওজনের বেলায় আমরা বলি **তার ভর** জানতে পারলেই 'ওজনও' জানতে পারব। কাজেই পৃথিবীকে ওজন করাটা তার ভর নির্ধারণ বলেই বুঝতে হবে।

এই সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতির কথা এখানে বলা যাক (ইওলির পদ্ধতি, ১৮৭১)। ৯২ নং ছবিতে একটি অত্যন্ত সংবেদশীল দাঁড়িপাল্লা রয়েছে। তাতে দুটো হাল্কা, উচ্চ ও নিম্ন পাল্লা। তারা ২০ থেকে ২৫ সেঃমিটারের ব্যবধান রেখে দাঁড়িপাল্লার দুটি দাঁড়ি থেকে ঝুলছে। ডানদিকের নিচের পাল্লাটায় একটা গোল বাটখারা রাখা হল, তার ভর হল m_1। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাঁদিকের উপরের পাল্লাটায় m_2 বাটখারাটা রাখা হল। বাটখারাদুটোর ওজন সমান নয়; তারা দুরকমের উচ্চতায় বলে পৃথিবী তাদের বিভিন্ন শক্তিতে টানছে। এখন যদি ডানদিকের নিচের পাল্লাটার তলে M ভরের একটা মস্ত সীসার বল রাখি তাহলে ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটবে। M ভর সীসার বলটা m_1 ভরকে F শক্তিতে টানবে। F শক্তি হল এই দুটি ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আর তাদের দুটি কেন্দ্রের ব্যবধান d দূরত্বের বর্গের বিপরীত আনুপাতিক:

$$F = k\frac{m_1 M}{d^2},$$

k হল অভিকর্ষের তথাকথিত অভিকর্ষ-ধ্রুবক (constant of gravity)।

ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য বাঁদিকে উপরের পাল্লায় n ভরের একটা ছোট্ট বাটখারা বসান গেল। পাল্লাটাকে সে যে শক্তিতে চাপ দেবে তা তার ওজনের সমান হবে. তার মানে, তার উপর পৃথিবীর সমগ্র ভরের টানের শক্তি। এই শক্তি F^1 হল

$$F^1 = k\frac{nm_{\text{♁}}}{R^2},$$

এখন $m_{\text{♁}}$ হল পৃথিবীর ভর, আর R তার ব্যাসার্ধ।

বাঁদিকের উপরের পাল্লার বাটখারায় সীসার বলের সামান্য প্রভাবের কথা ধর্তব্যের মধ্যে না আনলে আমরা বলতে পারি ভারসাম্যের অবস্থাটা হল এই:

$$F = F^1, \quad \text{বা} \quad \frac{m_1 M}{d^2} = \frac{nm_{♁}}{R^2}।$$

এই সমীকরণে পৃথিবীর ভর $m_{♁}$ বাদে বাকি সব প্রতীকগুলিকেই আমরা মাপতে পারি, তাই $m_{♁}$ কত তা বের করা যায়। সদ্য উক্ত পরীক্ষায়

M=৫,৭৭৫·২ কিলোগ্রাম, R=৬,৩৬৬ কিঃমিঃ, d=৫৬·৮৬ সেঃমিঃ,

m_1=৫·০০ কিলোগ্রাম, আর n=৫৮৯ মিলিগ্রাম।

তার ফলে পৃথিবীর ভর হল ৬·১৫ × ১০^২৭ গ্রাম।

ব্যাপক মাপের ভিত্তিতে পৃথিবীর ভরের যে মূল্য পাওয়া যায় তা হল $m_{♁}$ = ৫·৯৭৪ × ১০^২৭ গ্রাম বা প্রায় ৬,০০০ শতপরার্ধ (ট্রিলিয়ন) টন। ভুলের পরিমাণ ০·১%র বেশি নয়।

এই ভাবেই জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীর ভর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা পৃথিবীকে **ওজন** করেছেন, এ কথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক। কারণ আমরা যখন দাঁড়িপাল্লায় কোন কিছুর ওজন নিই আসলে তখন তার **ওজন** বা তার প্রতি পৃথিবীর টানের শক্তি মাপি না, তার **ভরই** নির্ধারণ করি। কেবল এটুকুই দেখে নিই যে তার **ভর** বাটখারার **ভরের** সমান।

পৃথিবীর ভিতরে কী আছে?

লোকশিক্ষার বিজ্ঞান বই আর প্রবন্ধে মাঝেমাঝে যে ভুলটি দেখা যায় তার কথা বলাটা এখানে উচিত। সবকিছু সহজ সরল করার জন্য পৃথিবীকে ওজন করার কাজটার এই বর্ণনা দেওয়া হয়: প্রথমে জ্যোতির্বিদরা আমাদের গ্রহের ১ ঘন সেঃমিটারের মধ্য ওজন মাপলেন, তার মানে, তার আপেক্ষিক ওজন, আর তারপর তার আয়তন জ্যামিতিকভাবে বার করে পৃথিবীর ওজন নিলেন আপেক্ষিক ওজনকে আয়তন দিয়ে গুণ করে। এ পদ্ধতি কিন্তু সম্ভব নয়। পৃথিবীর আপেক্ষিক ওজন সরাসরি মাপা সম্ভব নয়, কারণ অপেক্ষাকৃত পাৎলা বাইরের **ত্বকটাই*** কেবল আমাদের আয়ত্তে, বাকি বিরাট অংশটা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

আমরা জানি সমস্যাটার দিকে এগনো হয়েছে একেবারেই অন্যভাবে। পৃথিবীর ভরটাই তার মধ্য ঘনত্বের আগে নির্ধারিত হয়। তার মধ্য ঘনত্ব হল প্রতি ঘন সেঃমিটারে ৫·৫ গ্রাম। তার **ত্বকের** শিলার মধ্য ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে পৃথিবীর গর্ভে অত্যন্ত ভারী বস্তু আছে। আনুমানিক আপেক্ষিক ওজন (এবং অন্যান্য কারণে) আগে ধারণা ছিল, পৃথিবীর অন্তঃস্থল **লোহায়** তৈরী। সে লোহা

---

* পৃথিবীর ত্বকের খনিজ কেবল ২৫ কিঃমিঃ গভীর পর্যন্ত অনুসন্ধিত হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর আয়তনের ১/৮৩ ভাগে মাত্র খনিজ গবেষণা হয়েছে।

চারপাশের ভরের চাপে ভীষণ জোর সংনমিত। এখন বলা হচ্ছে, সাধারণত পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের গঠনপ্রকৃতিতে ত্বকের সঙ্গে তফাৎ নেই। তবে তাদের ঘনত্ব যে অনেক বেশি তার কারণ প্রচণ্ড চাপ।

সূর্য আর চাঁদের ওজন নেওয়া

হয়তো কথাটা অদ্ভুত লাগবে শুনতে, কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছের চাঁদের তুলনায় দূরের সূর্যের ওজন নির্ধারণ অনেক সহজ। (স্বভাবতই, পৃথিবী সম্বন্ধে 'ওজন' কথাটা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই দুটি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও সেই একই অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এখানে ওজন বলতে বোঝায় **ভর** নির্ধারণ।)

সূর্যের ভর নিম্নলিখিত উপায়ে পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১ সেঃমিঃ দূরত্বে ১ গ্রাম ১ গ্রামকে আকর্ষণ করে $\frac{১}{১,৫০,০০,০০০}$ মিঃগ্রাঃ শক্তিতে। ভর M ও m সম্পন্ন দুটি বস্তু D দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে। এই দুটির পারস্পরিক আকর্ষণ f বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়:

$$f = \frac{১}{১,৫০,০০,০০০} \times \frac{Mm}{D^{২}} \text{ মিঃগ্রাঃ।}$$

Mকে যদি সূর্যের ভর বলে ধরি (গ্রাম হিসাবে), m যদি হয় পৃথিবীর ভর, আর D হয় এ দুটির মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ ১৫,০০,০০,০০০ কিঃমিঃএর সমান, তাহলে মিলিগ্রামে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ হবে:

$$\frac{১}{১,৫০,০০,০০০} \times \frac{Mm}{১৫০০০০০,০০,০০,০০০^{২}} \text{ মিঃগ্রাঃ*।}$$

অন্যদিকে এই শক্তি হল একই কেন্দ্রাভিগ শক্তি, যা আমাদের গ্রহকে তার কক্ষে ধরে রাখে, বলবিদ্যার নিয়মানুসারে $\frac{mv^{২}}{D}$র সমান (মিলিগ্রামে)। এখানে m হল পৃথিবীর ভর (গ্রামে), v — বৃত্তাকার গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ৩০ কিঃমিঃ=সেকেণ্ডে ৩০,০০,০০০ সেঃমিঃ, আর D হল পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। অতএব,

$$\frac{১}{১,৫০,০০,০০০} \times \frac{Mm}{D^{২}} = m \times \frac{৩০,০০,০০০^{২}}{D}\text{।}$$

এই সমীকরণের ফলে আমরা অজ্ঞাত Mকে জানতে পারি (আগেই বলেছি গ্রামে):

$$M = ২ \times ১০^{৩৩} = ২ \times ১০^{২৭} \text{ m।}$$

---

* ডাইনেস বলা ভাল। ১ ডাইনে = ০·৯৮ মিঃগ্রাঃ।

এই ভরকে পৃথিবীর ভর দিয়ে ভাগ করলে অর্থাৎ, $\frac{২ \times ১০^{২৭}}{৬ \times ১০^{২১}}$ আমরা পাব ১০ লক্ষের $\frac{১}{৩}$ ভাগ।

আরেকভাবেও সূর্যের ভর নির্ধারণ করা যায়। এই পদ্ধতি কেপলারের তৃতীয় নিয়মের উপর স্থাপিত। বিশ্বজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী এই তৃতীয় নিয়মটিকে নিম্নলিখিত সূত্রে ফেলা যায়:

$$\frac{(m_{\odot} + m_১)T_১^{২}}{(m_{\odot} + m_২)T_২^{২}} = \frac{a_১^{৩}}{a_২^{৩}},$$

$m_{\odot}$ অর্থাৎ সূর্যের ভর, T অর্থাৎ গ্রহটির কক্ষাবর্তনের নাক্ষত্র কাল, a অর্থাৎ গ্রহ থেকে সূর্যের মধ্য দূরত্ব, আর m হল গ্রহের ভর। পৃথিবী এবং চাঁদের বেলায় এ নিয়ম খাটালে আমরা পাব:

$$\frac{(m_{\odot} + m_{♁})T^{২}_{♁}}{(m_{♁} + m_{☾})T^{২}_{☾}} = \frac{a^{৩}_{♁}}{a^{৩}_{☾}}।$$

পর্যবেক্ষণের ফলে পাওয়া সংখ্যা দ্বারা $a_{♁}$, $a_{☾}$ আর $T_{♁}$, $T_{☾}$র মূল্যায়ন করে এবং প্রথম স্থূলায়নে লবে পৃথিবীর ভর না ধরলে (কারণ সূর্যের ভরের তুলনায় তা খুবই সামান্য) এবং পৃথিবীর ভরের তুলনায় খুবই সামান্য বলে চাঁদের ভরকে হর থেকে বাদ দিলে আমরা পাব:

$$\frac{m_{\odot}}{m_{♁}} = ৩,৩০,০০০।$$

পৃথিবীর ভর জানা থাকায় আমরা সূর্যের ভরও নির্ধারণ করতে পারি।

অতএব দেখা যাচ্ছে সূর্য হল পৃথিবীর চেয়ে দশ লক্ষের তিনভাগের একভাগ গুণ ভারি।

আমরা সহজেই সৌরগোলকের মধ্য ঘনত্ব পেতে পারি। তার জন্য এর ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করতে হবে। আমরা জেনেছি যে সূর্যের ঘনত্ব মোটামুটি পৃথিবীর ঘনত্বের চারভাগের একভাগ।

চাঁদের কথায় এসে একজন জ্যোতির্বিদ বলেছেন, 'যদিও সব জ্যোতিষ্কের চেয়ে চাঁদ আমাদের সবচেয়ে কাছে, তবু চাঁদকে ওজন করা (তখনকার) সবচেয়ে দূরের গ্রহ নেপচুনের চেয়েও কঠিন।' চাঁদের কোন উপগ্রহ নেই, তাই আমরা এক্ষুণি যে ভাবে সূর্যের ভর নির্ধারণ করলাম সে ভাবে চাঁদের ভর পাওয়া অসম্ভব। কাজেই জ্যোতির্বিদদের আরও জটিল পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। তাদের মধ্যে একটির কথা আমি বলব। এই পদ্ধতি হল সূর্য-সৃষ্ট জোয়ার এবং চাঁদ-সৃষ্ট জোয়ারের তুলনা।

জোয়ারের উচ্চতা নির্ভর করে সংঘটক জ্যোতিষ্কের ভর ও দূরত্বের উপর। আমরা সূর্যের ভর ও দূরত্ব আর চাঁদের দূরত্ব জানি বলে জোয়ারের উচ্চতার তুলনার সাহায্যে আমরা চাঁদের ভর নির্ধারণ করতে পারি। জোয়ারের কথা বলার সময় আমরা সে অংকটা কষব। আপাতত বলি চরম ফলাফলের কথা। চাঁদের ভর হল পৃথিবীর ভরের ১/৮১ (৯৩ নং
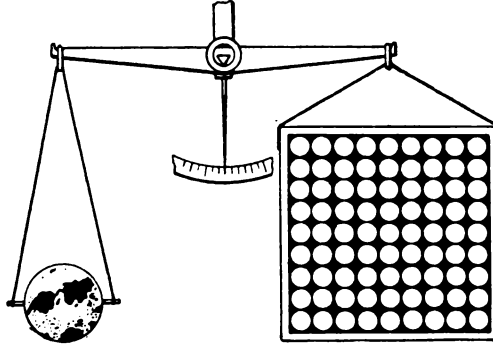
৯৩ নং ছবি: পৃথিবী চাঁদের চেয়ে ৮১ গুণ ভারী।

ছবি)। চাঁদের ব্যাস জানা আছে বলে আমরা এর আয়তন হিসাব করে দেখেছি পৃথিবীর আয়তনের ১/৪৯। অতএব আমাদের উপগ্রহটির মধ্য ঘনত্ব ৪৯/৮১ অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্বের ০·৬ ভাগ।

কাজেই চাঁদে পৃথিবীর চেয়ে বেশি ভঙ্গুর বস্তু আছে, যার ঘনত্ব সূর্যের চেয়ে বেশি। পরে দেখব (১৮২ পৃষ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য) চাঁদের মধ্য ঘনত্ব বেশির ভাগ গ্রহের মধ্য ঘনত্বের চেয়ে বেশি।

গ্রহ এবং নক্ষত্রের ওজন ও ঘনত্ব

যে সব গ্রহের অন্তত একটি উপগ্রহ আছে, তাদের প্রত্যেকেরই ওজন নেওয়া যায় সূর্যকে ওজন করার পদ্ধতি দিয়ে।

উপগ্রহের কক্ষাবর্তনের মধ্য গতিবেগ v এবং গ্রহ থেকে তার মধ্য দূরত্ব D জানা থাকলে আমরা উপগ্রহটিকে তার কক্ষপথে যে কেন্দ্রাভিগ শক্তি ধরে রেখেছে সেই $\frac{mv^{2}}{D}$, আর গ্রহ ও উপগ্রহের পারস্পরিক আকর্ষণের শক্তি অর্থাৎ $\frac{kmM}{D^{2}}$ কে সমান মনে করতে পারি। এখানে k হল আকর্ষণের শক্তি যা এক সেঃমিঃ দূরে ১ গ্রামের উপর এক গ্রাম

খাটায়। m হল উপগ্রহের ভর, আর M হল গ্রহের ভর:

$$\frac{mv^2}{D} = \frac{kmM}{D^2}$$

কাজেই

$$M = \frac{Dv^2}{k}$$

এই সূত্র থেকে আমরা অনায়াসেই গ্রহের ভর নির্ধারণ করতে পারি।

এই বিশেষ ক্ষেত্রেও কেপলারের তৃতীয় নিয়ম খাটে:

$$\frac{(m_{\odot} + m_{\text{গ্রহ}})}{(m_{\text{গ্রহ}} + m_{\text{উপগ্রহ}})} \frac{T^2_{\text{গ্রহ}}}{T^2_{\text{উপগ্রহ}}} = \frac{a^3_{\text{গ্রহ}}}{a^3_{\text{উপগ্রহ}}}।$$

এখানেও আবার বন্ধনীর ভিতরের ক্ষুদ্র সংখ্যাগুলিকে না ধরে আমরা সূর্যের ভর আর গ্রহের ভরের অনুপাত নির্ধারণ করতে পারি। তা হল $\frac{m_{\odot}}{m_{\text{গ্রহ}}}$। সূর্যের ভর জানা থাকায় আমরা খুব সহজেই গ্রহের ভর নির্ধারণ করতে পারি।

জুড়ি নক্ষত্রের বেলাতেও এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। কেবল একটি মাত্র তফাৎ হল, এখানে আমরা **মোট** ভর পাব, প্রত্যেকটি নক্ষত্রের আলাদা ভর নয়।

উপগ্রহের ভর আর উপগ্রহবিহীন গ্রহের ভর নির্ধারণ করা খুবই শক্ত।

বুধ আর শুক্রের ভর নির্ধারিত হয়েছে তাদের পরস্পরের ওপর, পৃথিবীর ওপর তথা কয়েকটি ধূমকেতুর গতির উপর তাদের নাড়া দেওয়ার পরিমাণে নির্ভর করে।

গ্রহাণুপুঞ্জের ভর এতই সামান্য যে তারা পরস্পরকে এমন কিছু একটা নাড়া দেয় না যা চোখে পড়ার মতো। সাধারণত এজাতীয় গ্রহাণুর ভর নির্ধারণ একরকম অসম্ভবই বলা যায়। আমরা কেবল জানি বামন গ্রহগুলির মোট ভরের সীমা — তবে তাও আন্দাজে।

কোন গ্রহের ভর ও আয়তন জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই **মধ্য ঘনত্ব** বের করতে পারি। ফলাফল নীচে দিচ্ছি:

	পৃথিবীর ঘনত্ব = ১		পৃথিবীর ঘনত্ব = ১
বুধ	১·০০	বৃহস্পতি	০·২৪
শুক্র	০·৯২	শনি	০·১৩
পৃথিবী	১·০০	ইউরেনাস	০·২৩
মঙ্গল	০·৭৪	নেপচুন	০·২২

দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রহ পরিবারে বুধ আর পৃথিবীই তাদের ঘনত্বের দিক দিয়ে সারির প্রথমে স্থান পায়। অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহগুলির মধ্য ঘনত্ব কম হওয়ার কারণ হল তাদের শক্ত অন্তঃস্থলকে বেড় দিয়ে বিরাট বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব। এই বায়ুমণ্ডলের ভর কম হলেও আয়তনে তা গ্রহটিকে বিরাট করে তোলে।

চাঁদে আর গ্রহে ওজন

সাধারণ মানুষ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট, প্রায়ই ভাবে, যে বৈজ্ঞানিকরা কোনদিন চাঁদে বা অন্য কোন গ্রহে যাননি, তাঁরা কী করে এত নিশ্চয়তার সঙ্গে চাঁদ বা গ্রহ পৃষ্ঠের অভিকর্ষ সম্বন্ধে বলেন? আসলে কিন্তু অন্য জগতে কোন বস্তু পাঠান
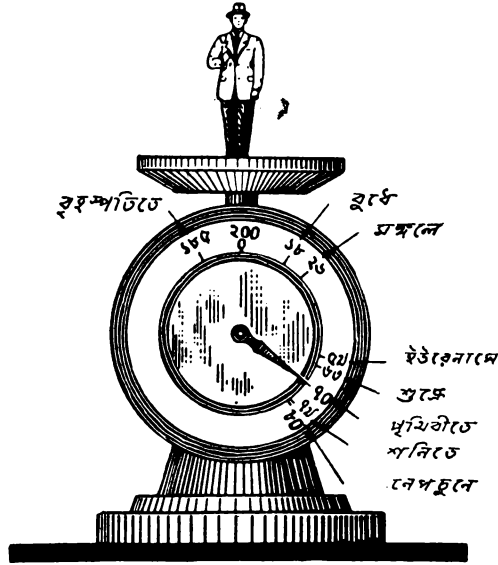
৯৪ নং ছবি: নানা গ্রহে আমাদের ওজন কত হবে।

হলে তার ওজন নির্ণয় করা তেমন কঠিন নয়। আমাদের কেবল দরকার সেই বিশেষ জ্যোতিষ্কের ব্যাসার্ধ ও ভর জানা।

আচ্ছা, এবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষীয় টান নির্ধারণ করা যাক। আমরা জানি যে চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের ১/৮১ ভাগ। পৃথিবীর ভর যদি এত কম হত, তাহলে তার বুকের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও হত এখনকার ১/৮১ ভাগ। কিন্তু নিউটনের নিয়ম অনুযায়ী একটা

গোলকের টান তার সমস্ত ভর কেন্দ্রে এসে জমা হলে যা হত তার সমান। পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে পৃষ্ঠতলের ব্যবধানই হল তার ব্যাসার্ধ। কাজেই চাঁদের কেন্দ্রের সঙ্গে তার পৃষ্ঠতলের ব্যবধানই হল তার ব্যাসার্ধ। যাই হোক, চাঁদের ব্যাসার্ধ হল পৃথিবীর ২৭/১০০; আর দূরত্ব যখন ১০০/২৭ গুণ কম তখন আকর্ষণ শক্তি (১০০/২৭)২ গুণ বাড়বে। সুতরাং

চাঁদের বুকের মাধ্যাকর্ষণ হবে পৃথিবীর $\frac{১০০^{২}}{২৭^{২} \times ৮১} \approx \frac{১}{৬}$।

কাজেই ১ কিলোঃ ওজন চাঁদের বুকে হবে ১/৬ কিলোঃ। তবে স্বভাবতই এই ওজনের কমতি ধরা পড়বে দাঁড়িপাল্লায় নয়, কেবল স্প্রিংয়ের মাপযন্ত্রে (৯৪ নং ছবি)।

মজার কথা হল চাঁদে যদি জল থাকত, তবে পৃথিবীতে সাঁতার কাটার সময় যে অনুভূতি হয় চাঁদেও ঠিক তাই হবে। সাঁতারুর ওজন অবশ্য ছ'গুণ কম হবে। কিন্তু সে যে পরিমাণ জল অপসারণ করবে তার ওজনও ছ'গুণ কমবে। কাজেই জলের সঙ্গে সাঁতারুর সম্পর্ক থেকে যাবে ঠিক পৃথিবীর মতোই।

কিন্তু জল থেকে উঠতে হলে চাঁদে অনেক কম শক্তি ক্ষয় হবে, কারণ সাঁতারুর দেহের ওজন কম; কাজেই তার মাংসপেশীর পরিশ্রমও হবে কম।

নীচে পৃথিবীর অভিকর্ষের তুলনায় অন্যান্য গ্রহে অভিকর্ষের মান দেওয়া গেল।

বুধে	০·২৬	শনিতে	১·১৩
শুক্রে	০·৯০	ইউরেনাসে	০·৮৪
পৃথিবীতে	১·০০	নেপচুনে	১·১৪
মঙ্গলে	০·৩৭	প্লুটোতে	?
বৃহস্পতিতে	২·৬৪		

সৌরমণ্ডলীতে অভিকর্ষের দিক দিয়ে পৃথিবী তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকে, বৃহস্পতি, নেপচুন, শনির পর।

রেকর্ড ওজন

চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে লুব্ধক B'র কথা বলেছি, সেইরকম 'শ্বেত বামনদের' বুকে অভিকর্ষ চরমে পেঁছয়। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি এই জ্যোতিষ্কগুলির প্রচণ্ড ভর, তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাসার্ধ দরুন এই জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠতলে যথেষ্ট অভিকর্ষ সঞ্চার করে। আমরা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি তারা নিয়ে এই হিসাবটা করে দেখব। এই তারাটির ভর সূর্যের চেয়ে ২·৮ গুণ বেশি অথচ এর ব্যাসার্ধ হল পৃথিবীর অর্ধেক। এখানে মনে রাখতে হবে যে সূর্যের ভর পৃথিবীর চেয়ে ৩,৩০,০০০

গুণ বেশি। কাজেই পূর্বোক্ত তারাটির বুকের অভিকর্ষ হবে পৃথিবীর চেয়ে ২·৮ × ৩,৩০,০০০ × ২২ = ৩৭,০০,০০০ গুণ বেশি।

১ সেঃমিঃ৩ জলের ওজন আমাদের পৃথিবীতে ১ গ্রাম, এই তারার বুকে তার ওজন হবে প্রায় ৩৪ টন! এই বিস্ময়ের জগৎটি যে 'মুটি' (যার ঘনত্ব জলের চেয়ে ৩,৬০,০০,০০০ গুণ বেশি) দিয়ে তৈরি তার ১ সেঃমিঃ৩র ওজন হবে অত্যন্ত বেশি —

৩৭,০০,০০০ × ৩,৬০,০০,০০০ = ১৩৩২০০০০,০০,০০,০০০ গ্রাম।

কিছুদিন আগেও আমরা অত্যন্ত দুঃসাহসী কল্পনা দিয়েও একথা ভাবতে পারতাম না, সেলাই করার একটা আঙুলটুপির মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু ধরে তার ওজন ১,০০০ লক্ষ টন হতে পারে।

গ্রহের গভীরে ওজন

একটা জিনিসের ওজন তাকে গ্রহের অতি অভ্যন্তরে, ধরুন সাংঘাতিক গভীর একটা খনির ভিতরে রাখলে কতদূর বদলাবে?

অনেকেই ভুল করে ভাবে যে, কোন বস্তু যেহেতু গ্রহের কেন্দ্রের — যা সবকিছুকে আকর্ষণ করে — কাছে আছে, অতএব তার ওজনও বেশি হবে। এ ধরনের যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমরা গ্রহের যত অভ্যন্তরে যাব আকর্ষণ তত বাড়া তো দূরের কথা বরঞ্চ কমতেই থাকবে।
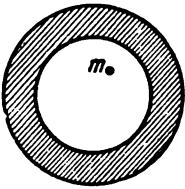
৯৫ নং ছবি: গোলাকার কেসে কোন জিনিসের ওজন থাকে না।
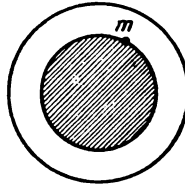
৯৬ নং ছবি: গ্রহের ভিতরের কোন জিনিসের ওজন কীসের ওপর নির্ভর করে?
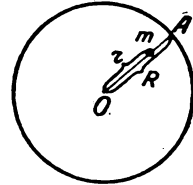
৯৭ নং ছবি: গ্রহের কেন্দ্রের কাছে একটা জিনিস এগলে তার ওজনের বদল দেখান হচ্ছে।

বলবিদ্যায় বলে, কোন জিনিস যদি সমমাত্র গোলাকার কেসের গহ্বরে রাখা হয় তবে তা সম্পূর্ণভাবেই ওজন হারায় (৯৫ নং ছবি)। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমমাত্র ঘন গোলকের ভেতর কোন বস্তু থাকলে তাকে যা আকর্ষণ করবে সেটা হল ক্ষুদ্রতর একটা গোলক যার ব্যাসার্ধ হল কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব (৯৬ নং ছবি)।

এই প্রকল্প থেকে আমরা একটা সূত্র খাড়া করতে পারি। সে সূত্র অনুসারে দেখা যাবে, কোন বস্তু কেন্দ্রের যত কাছে এগোয় তার ওজনও তত বদলে যায়। গ্রহের ব্যাসার্ধকে (৯৭ নং ছবি) R নাম দিলে আর কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্বকে r বলে অভিহিত করলে আমরা দেখব যে কোন এক বিশেষ বিন্দুতে এই বস্তুর উপর অভিকর্ষ বাড়বে $\left(\frac{R}{r}\right)^{২}$ গুণ এবং $\left(\frac{R}{r}\right)^{৩}$ গুণ কমবে (কারণ গ্রহের আকর্ষণকারী অংশটাও উপরোক্ত পরিমাণে কমে গেছে)। শেষ বিশ্লেষণ দেখায় অভিকর্ষের শক্তি কমে:

$$\left(\frac{R}{r}\right)^{৩} : \left(\frac{R}{r}\right)^{২} \text{ অর্থাৎ, } \frac{R}{r} \text{ গুণ।}$$

কাজেই কোন গ্রহের অভ্যন্তরে, কেন্দ্র থেকে কোন বস্তুর দূরত্ব যে অনুপাতে কমবে তার ওজনও সেই অনুপাতে **কমবে**। আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহে — যার ব্যাসার্ধ হল ৬,৪০০ কিঃমিঃ — কোন বস্তুকে ৩,২০০ কিঃমিঃ গভীরে ওজন করলে দেখা যাবে তার ওজন অর্ধেক হয়ে গেছে। ৫,৬০০ কিঃমিঃ গভীরে $\frac{৬,৪০০}{৬,৪০০ — ৫,৬০০} = ৮$ গুণ কম। আর গ্রহের কেন্দ্রে বস্তুটি তার ওজন সম্পূর্ণভাবে হারাবে, কারণ $\frac{৬,৪০০ — ৬,৪০০}{৬,৪০০} = ০$।

আসলে, হিসাব না করেও একথা বলা যেত। কারণ কোন গ্রহের কেন্দ্রে কোন জিনিস থাকলে তার চারপাশের সবকিছু তাকে সমান শক্তিতে সবদিক থেকে আকর্ষণ করবে।

আমরা যা বললাম তা কেবল **সমমাত্র** ঘনত্ব সম্পন্ন গ্রহের বেলাতে খাটে, সত্যিকার গ্রহের বেলাতে তা খাটবে কেবল কয়েকটি সর্তে। বিশেষ করে পৃথিবীর ক্ষেত্রে তার গভীরের ঘনত্ব পৃষ্ঠতলের চেয়ে বেশি, তাই কেন্দ্রের নৈকট্য অনুপাতে মহাকর্ষ কমতির নিয়মটা এখানে একটু বদলে যায়। কিছু দূর (অপেক্ষাকৃত কম) গভীর পর্যন্ত অভিকর্ষ বাড়ে, কিন্তু তারপর কমতে থাকে।

জাহাজের সমস্যা

একটা জাহাজ কখন বেশি হালকা, চাঁদনী রাতে না নিশ্চন্দ্র রাত্রে?

উত্তর

আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ মনে হয় সমস্যাটা তার চেয়ে জটিল। আমরা এককথায় বলে দিতে পারি না, যেহেতু 'চাঁদ সবকিছু আকর্ষণ করছে' তাই চাঁদনী রাতে পৃথিবীর

যে গোলার্ধ চন্দ্রালোকে প্লাবিত সেখানকার জাহাজ তথা সব কিছুরই ওজন অন্ধকার রাত্রির চেয়ে কম, কেননা জাহাজটাকে টানার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ সারা পৃথিবীকেই টানছে। শূন্যে, মহাকর্ষের প্রভাবে, সব বস্তুই সমান গতিবেগে চলে। চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবী এবং জাহাজ দুটিতেই সমান ত্বরায়ন সঞ্চার করে, কাজেই আমরা ওজনে কোন কমতি ধরতে পারি না। কিন্তু তবুও চাঁদের আলোয় ভরা জাহাজ ওজনে নিশ্চন্দ্র অন্ধকার রাত্রে যে জাহাজ পাড়ি জমিয়েছে তার চেয়ে হালকা।

কারণটা হল এই। ৯৮ নং ছবিতে O বোঝায় পৃথিবীর কেন্দ্র. A আর B হল দুটি
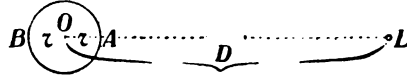
৯৮ নং ছবি: পৃথিবীর কোন বস্তুকণার ওপর চাঁদের আকর্ষণের প্রভাব।

জাহাজ, পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি বিন্দুতে অবস্থিত, r হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, আর D হল চাঁদের কেন্দ্র L থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র O পর্যন্ত দূরত্ব। M হল চাঁদের ভর, m হল জাহাজের ভর। হিসাব সহজ করার জন্য আমরা A আর B বিন্দু চাঁদের কুবিন্দু আর সুবিন্দুর সঙ্গে মিলিয়ে দেব। A বিন্দুতে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি (অর্থাৎ চন্দ্রালোকিত রাত্রে) হল: $\frac{kMm}{(D-r)^২}$

যেখানে $k = \frac{১}{১,৫০,০০,০০০}$। B বিন্দুতে (অন্ধকার রাত্রে) চাঁদ জাহাজটাকে যে শক্তিতে আকর্ষণ করে: $\frac{kMm}{(D+r)^২}$ শক্তিতে।

দুটি আকর্ষণের মধ্যে তফাৎ হল $kMm \times \frac{৪r}{D^৩\left[১-\left(\frac{r}{D}\right)^২\right]^২}$-র সমান।

$\left(\frac{r}{D}\right)^২ = \left(\frac{১}{৬০}\right)^২$ হল নেহাতই তুচ্ছ সংখ্যা, তাই তা হিসাবে ধরা হবে না। এর ফলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা পাই:

$$kMm \times \frac{৪r}{D^৩}।$$

একে বদলে লিখলে দাঁড়ায়:

$$\frac{kMm}{D^২} \times \frac{৪r}{D} = \frac{kMm}{D^২} \times \frac{১}{১৫}।$$

এখন প্রশ্ন হল $\frac{kMm}{D^২}$টা কি? সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তা হল চাঁদের কেন্দ্র থেকে D'র দূরত্বে জাহাজটির ওপর চাঁদের আকর্ষণ শক্তি। চাঁদের বুকে m ভর সম্পন্ন একটা জাহাজের ওজন হবে $\frac{m}{৬}$। চাঁদ থেকে D'র দূরত্বে চাঁদ জাহাজটি $\frac{m}{৬D^২}$ আকর্ষণ শক্তিতে টানে। কাজেই D হল ২২০ চান্দ্র ব্যাসার্ধ। সুতরাং

$$\frac{kMm}{D^২} = \frac{m}{৬ \times ২২০^২} \approx \frac{m}{৩,০০,০০০}।$$

এবার যদি আকর্ষণের কতটা তফাৎ হচ্ছে সে প্রশ্নে ফিরে আসি তবে আমরা পাব

$$\frac{kMm}{D^২} \times \frac{১}{১৫} \approx \frac{m}{৩,০০,০০০} \times \frac{১}{১৫} = \frac{m}{৪৫,০০,০০০}।$$

ধরুন জাহাজটির ওজন ৪৫,০০০ টন, চন্দ্রালোকিত রাত্রের সঙ্গে অন্ধকার রাত্রের ওজনের তফাৎ হবে $\frac{৪,৫০,০০,০০০}{৪৫,০০,০০০} = ১০$ কিঃগ্রাঃ।

সুতরাং পার্থক্যটা তুচ্ছ হলেও জাহাজ চাঁদনী রাত্রে নিশ্চন্দ্র রাত্রের চেয়ে হালকা হবে।

চান্দ্র ও সৌর জোয়ার

আমরা এক্ষুণি যে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করলাম সেটি আমাদের জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করতেও সাহায্য করবে। চাঁদ বা সূর্যের টানের জন্যই কেবল জোয়ার ভাঁটা হয় এটা মনে করা ভুল। আমরা আগেই বলেছি যে চাঁদ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে টানার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীকেই টানে। আসল কথা হল আকর্ষণের উৎস থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র বেশি দূরে। আর চাঁদের দিকে মুখ করা পৃথিবীর বুকের জলভাগ এই আকর্ষণ উৎসের কাছে। জাহাজের উপর আকর্ষণ শক্তির তফাৎ আমরা যে ভাবে নির্ধারণ করেছি ঠিক সেই ভাবেই এই দুটির তফাৎও নির্ধারণ করা যায়। যে কোন জায়গায় চাঁদ যখন সুবিন্দুতে থাকে, প্রতি কিলোগ্রাম জল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এক কিলোগ্রাম বস্তুর চেয়ে $\frac{২kMr}{D^৩}$ গুণ জোরে আকৃষ্ট হয়। তখনই আবার অপর পৃষ্ঠে ঠিক বিপরীত বিন্দুতে প্রতি কিলোগ্রাম জলের উপর আকর্ষণ সেই অনুপাতেই কম।

এই তফাতের ফলেই দু ক্ষেত্রেই জল পৃথিবীর বুকের উপরে উঠে যায়। প্রথম ক্ষেত্রে জোয়ার ভাঁটা আসে কারণ জল পৃথিবীর কঠিন অংশের চেয়ে চাঁদের দিকে বেশি এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৃথিবীর কঠিন অংশ জলের চেয়ে চাঁদের দিকে বেশি এগিয়ে যায়।*

মহাসমুদ্রের জলের উপরেও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের একই প্রভাব পড়ে। সূর্যের না চাঁদের, কোন আকর্ষণ বেশি শক্তিশালী? যদি **সরাসরি** মাধ্যাকর্ষণের শক্তির তুলনা করি, তবে দেখব সূর্যের আকর্ষণের শক্তিই বেশি। আমরা জানি সূর্যের ভর হল পৃথিবীর ৩,৩০,০০০ গুণ বেশি। আর চাঁদের ভর হল পৃথিবীর চেয়ে ৮১ গুণ বা সূর্যের চেয়ে ৩,৩০,০০০×৮১ গুণ কম। সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ২৩,৪০০ গুণ। চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মাত্র ৬০ গুণ। ফলত পৃথিবীর ওপর চাঁদ আর সূর্যের আকর্ষণের অনুপাত হল

$$\frac{৩,৩০,০০০ \times ৮১}{২৩,৪০০^{২}} : \frac{১}{৬০^{২}} \approx ১৭০।$$

অর্থাৎ সূর্য প্রতি পার্থিব জিনিসকে চাঁদের চেয়ে ১৭০ গুণ বেশি শক্তিতে টানে। তাই মনে হতে পারে যে সূর্যের জোয়ার চান্দ্র জোয়ারের চেয়ে উঁচু। কিন্তু আসলে আমরা দেখি ঠিক তার উল্টো, চান্দ্র জোয়ারই বেশি উঁচু। এই তথ্য $\frac{২kmM}{D^{৩}}$ সূত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায়। সূর্যের ভরকে যদি বলি M_s, চাঁদের ভরকে M_m, সূর্যের দূরত্ব যদি হয় D_s আর চাঁদের দূরত্ব D_m তাহলে চাঁদ আর সূর্যের জোয়ার ঘটানোর শক্তির অনুপাত হবে

$$\frac{২kM_s r}{D_s^{৩}} : \frac{২kM_m r}{D_m^{৩}} = \frac{M_s}{M_m} \times \frac{D_m^{৩}}{D_s^{৩}}।$$

আমরা ধরে নিচ্ছি যে চাঁদের ভর জানা এবং তা পৃথিবীর ভরের ১/৮১ সমান।

এখন, চাঁদ সূর্যের থেকে ৪০০ গুণ বেশি দূরে অবস্থিত জানি বলে আমরা দেখব

$$\frac{M_s}{M_m} \times \frac{D_m^{৩}}{D_s^{৩}} = ৩,৩০,০০০ \times ৮১ \times \frac{১}{৪০০^{৩}} = ০\cdot৪২।$$

কাজেই, সূর্য-ঘটিত জোয়ার চন্দ্র-ঘটিত জোয়ারের চেয়ে প্রায় ২½ গুণ নীচু হবে।

আশা করি এখানেই প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা উচিত, কী ভাবে চান্দ্র আর সৌর জোয়ারের উচ্চতার তুলনা করে চাঁদের ভর নির্ধারণ করা যায়। এই দুই জোয়ারের উচ্চতা

---

* এখানে আমরা কেবল জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণটির কথা বলেছি। আসলে ঘটনাটি অনেক বেশি জটিল, এবং এর অন্য কারণও আছে (চাঁদ ও পৃথিবীর যুগ্ম ভর-কেন্দ্র ঘিরে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের কেন্দ্রাতিগ প্রভাব ইত্যাদি)।

কখনো পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, কারণ চাঁদ এবং সূর্য উভয়ের প্রভাবই একই সঙ্গে সক্রিয়। কিন্তু এই দুই জ্যোতিষ্ক যখন সংযোগে (conjunction) কাজ করে (অর্থাৎ সূর্য আর চাঁদ যখন পৃথিবীর সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকে) আর যখন তারা বিপরীতভাবে কাজ করে (অর্থাৎ যখন সূর্য ও পৃথিবীকে যোগ-করা সরল রেখা চাঁদ ও পৃথিবীকে যোগ-করা সরল রেখার উপর লম্ব অবস্থায় থাকে) এ দুই ক্ষেত্রের জোয়ারের উচ্চতা মাপা যায়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে দ্বিতীয় জোয়ারের উচ্চতা হল প্রথম জোয়ারের ০·৪২ ভাগ। চাঁদের জোয়ার-ঘটানোর শক্তিকে x আর সূর্যের জোয়ার-ঘটানো শক্তিকে যদি y বলি, তবে পাব

$$\frac{x+y}{x-y}=\frac{১০০}{৪২}.$$

তাই

$$\frac{x}{y}=\frac{৭১}{২৯}।$$

অতএব আগের সূত্র খাটিয়ে পাই:

$$\frac{M_s}{M_m}\times\frac{{D_m}^{৩}}{{D_s}^{৩}}=\frac{২৯}{৭১},$$

কিম্বা

$$\frac{M_s}{M_m}\times\frac{১}{৬,৪০,০০,০০০}=\frac{২৯}{৭১}।$$

সূর্যের ভর M_s =৩,৩০,০০০ M_e। M_e হল পৃথিবীর ভর। অতএব শেষ সমীকরণ থেকে সহজেই পাব $\frac{M_e}{M_m}$ = ৮০।

অর্থাৎ চাঁদের ভর হল পৃথিবীর ১/৮০ ভাগ। আরও সূক্ষ্ম হিসাব অনুসারে চাঁদের ভর হল পৃথিবীর ভরের ০·০১২৩ ভাগ।

চাঁদ ও আবহাওয়া

আমাদের গ্রহের বায়ুসমুদ্রে চান্দ্র জোয়ার ভাঁটা বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে সে কথা জানতে অনেকেই বেশ আগ্রহী। এই প্রশ্নের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাঁটা আবিষ্কার করেন ১৮শ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী লমোনসভ। তিনি এর নাম দেন বায়ুতরঙ্গ। যদিও অনেকেই বায়ুতরঙ্গ নিয়ে

অনেক গবেষণা করেছেন, তবুও বায়ুতরঙ্গ সম্বন্ধে বহু বিকৃত ধারণা ব্যাপকভাবে বর্তমান। সাধারণ লোকে ভাবে, চাঁদ পৃথিবীর হালকা ভ্রাম্যমাণ বায়ুমণ্ডলে বিপুল জোয়ার-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। কাজেই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু জোয়ারের ফলে বায়ুমণ্ডলের চাপে বিরাট পার্থক্য ঘটে অতএব আবহাওয়া নির্ধারণের ব্যাপারে এটা একটা চূড়ান্ত কথা।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি যে বায়ুমণ্ডলের জোয়ারের উচ্চতা কখনও সমুদ্রের জোয়ারের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কথাটা হয়ত বিস্ময়কর। সবাই ভাববে নিচেকার ঘন স্তরের বাতাসও যখন জলের চেয়ে প্রায় হাজার গুণ হালকা, তখন চাঁদের টান কেন হাজার গুণ উঁচু তরঙ্গ সৃষ্টি করবে না? এ ব্যাপারটা কিন্তু শূন্যে কোন একটা হালকা বা ভারী বস্তু একই দ্রুততায় পড়ার ঘটনার চেয়ে বেশি আপাতবিরোধী নয়।

ইস্কুল জীবনের একটা পরীক্ষা মনে করা যাক। একটা খালি টিউবে সীসার একটা গোলার পড়ার বেগ একটা পালকের চেয়ে দ্রুত নয়। জোয়ার ভাঁটা হল হালকা আবরণ সহ শূন্যে পৃথিবীর পতনের চরম ফলাফল, যার উপর চাঁদ (ও সূর্যের) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বিরাজমান। মাধ্যাকর্ষণের জন্য মহাশূন্যে সব জিনিস, হালকা বা ভারী একই পথ অতিক্রম করে একই গতিতে পড়ে। অবশ্য মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব যদি সমান থাকে।

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে বায়ুমণ্ডলের জোয়ারের উচ্চতা আর তীর থেকে দূরে সমুদ্রের জোয়ারের উচ্চতা সমান। জোয়ারের উচ্চতা নির্ণয় করার সূত্রটা ভাল করে যাচাই করলে দেখব তাতে আছে কেবল পৃথিবী আর চাঁদের ভর, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর পৃথিবী থেকে চাঁদের ব্যবধান। এই সূত্রে উৎক্ষিপ্ত তরল পদার্থের ঘনত্ব, বা সাগরের গভীরতার কোনো কথা নেই। যদি জলের বদলে বাতাস হয় তবুও হিসাবের ফলাফল বদলাবে না। বায়ুমণ্ডলের জোয়ার আর সমুদ্রে জোয়ারের উচ্চতা অতএব একই। সমুদ্রের জোয়ারের গুরুত্ব অবশ্য নেহাতই সামান্য। তত্ত্বীয় ভাবে বিচার করলে দেখব, মহাসমুদ্রের মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু জোয়ার ওঠে আধ মিটারের কাছাকাছি। কেবল পাড় ও তলের আকৃতির ওপর জোয়ার তরঙ্গের ক্রিয়ায় এই উচ্চতাকে ১০ মিঃ বা স্থান বিশেষে তার চেয়েও বেশি বাড়িয়ে তোলে। একটা বিশেষ জায়গায় ও বিশেষ সময়ে সূর্য ও চাঁদের অবস্থানের তথ্যের উপর নির্ভর করে জোয়ারের উচ্চতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো অপূর্ব যন্ত্র আছে।

কিন্তু বাতাসের সীমাহীন মহাসাগরে চাঁদের জোয়ারের তত্ত্বীয় ছবিটার ব্যাঘাত ঘটাবার মতো কোনো কিছু নেই, তার তত্ত্বীয় অর্ধ মিটারের শীর্ষ উচ্চতায় বদল কিছুতেই ঘটে না। এই সামান্য বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের খুব অল্পই হেরফের হয়।

বায়ুর জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার সময় লাপ্লাস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বায়ুমণ্ডলের চাপমাত্রায় এরা যা বদল ঘটায় তাতে পারার রেখায় ০·৬ মিঃমিটারের বেশি বদল হতে পারে না, আর বায়ুর গতিতেও সেকেণ্ডে ৭·৫ সেঃমিঃর বেশি বদল ঘটতে পারে না।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলের জোয়ার ভাঁটা আবহাওয়া সৃষ্টিতে বিশেষ কোন বড়ো ভূমিকা নিতে পারে না।

কাজেই প্রমাণ হচ্ছে আকাশে চাঁদের অবস্থান জেনে আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার 'চন্দ্র-গণকদের' সব চেষ্টাই বৃথা।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union